খসড়া প্রতিবেদন

জাতীয় সংসদ ও সংসদ সদস্যদের ভূমিকা: জনগণের প্রত্যাশা

অক্টোবর ২০০৮

জাতীয় সংসদ ও সংসদ সদস্যদের ভূমিকা: জনগণের প্রত্যাশা

গবেষণা উপদেষ্টা

অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ
চেয়ারম্যান, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
শাহজাদা এম আকরাম, *ঊর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা*
সাধন কুমার দাস, *গবেষণা কর্মকর্তা*
তানভীর মাহমুদ, *গবেষণা কর্মকর্তা*

সহযোগী গবেষক
জুলিয়েট রোজেটী, *সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা*
সোহেল আহমেদ, *সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা*
এ এম শামসুদ্দৌলা, *সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা*
মো. নূরে আলম, *সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা*

গবেষণা সহকারী
শরফুদ্দিন মু. আবু ইউসুফ
মো. আবেদ আলী
সঞ্জয় কুমার ঘোষ
মো. মাহবুবুর রহমান
মো. মাসুদ খান

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
প্রোগ্রেস টাওয়ার, বাসা # ১, রোড # ২৩
গুলশান ১, ঢাকা ১২১২
ফোন: ৮৮-০২-৮৮২৬০৩৬
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯৮৮৪৮১১ এক্স- ১২৯
ই-মেইল: akram@ti-bangladesh.org, shadhan@ti-bangladesh.org, tanvir@ti-bangladesh.org

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ব্রত নিয়ে একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে। টিআইবি এমন একটি বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা -বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত, এবং জনগণের সেবার জন্য কর্মরত সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম হবে স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং কার্যকর। গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং দারিদ্র্য দূর করার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের টেকসই উন্নয়ন সাধনে চাহিদা সৃষ্টিই হচ্ছে টিআইবি'র মূল উদ্দেশ্য।

গত সতের বছর (১৯৯১-২০০৮) ধরে বাংলাদেশে বহুদলীয় সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বিদ্যমান। জাতীয় সততা ব্যবস্থার একটি প্রধান প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় সংসদ একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা পালন করবে এটা জনগণের প্রত্যাশা। কিন্তু অধিবেশনে কোরাম সংকট, বিরোধী দলের লাগাতার সংসদ বর্জন, সরকারি দলের সদস্যদের সংসদে আসার প্রতি অনীহা, কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণে আগ্রহের অভাব, বেশিরভাগ মন্ত্রীদের সংসদে অনুপস্থিতি, সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর অনিয়মিত বৈঠক এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা না হওয়া, ইত্যাদি কারণে জাতীয় সংসদ তার প্রত্যাশিত ভূমিকা পালনে অনেকাংশেই ব্যর্থ হয়েছে। এছাড়াও সংসদ সদস্যদের আইন-বহির্ভূত বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও অনিয়মের সাথে জড়িত হওয়ার অভিযোগ ওঠে। সংসদ সদস্যদের সংসদে অনুপস্থিতি ও দেরিতে আসার প্রবণতা এতই প্রবল ছিল যে অষ্টম সংসদে পাঁচটি বিল প্রয়োজনীয় কোরাম ছাড়াই উত্থাপিত ও অনুমোদিত হয়। এর ফলে সংসদ ও সংসদ সদস্যদের কাছে মানুষের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্যে বিস্তর পার্থক্য তৈরি হয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে টিআইবি নবম সংসদ নির্বাচনে জনগণ কেমন প্রার্থী প্রত্যাশা করে, নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের কাছে সাধারণের জনগণের প্রত্যাশা, আগামী সংসদ কার্যকর করার ক্ষেত্রে সংসদ সদস্য ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা সম্পর্কে জনগণের প্রত্যাশা সম্পর্কিত এই গবেষণাটি পরিচালনা করে এবং জনগণের প্রত্যাশার সনদ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই প্রচেষ্টায় সকল শ্রেণী পেশার মানুষের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে জাতীয় জরিপ, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন, কর্মশালা এবং মুখ্যতথ্যদাতার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে যারা সুচিন্তিত মতামত ও দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন তাদের সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

গবেষণাটি টিআইবি'র গবেষক শাহজাদা এম আকরাম, সাধন কুমার দাস এবং তানভীর মাহমুদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এই গবেষণা দলের সহযোগী হিসেবে ছিলেন জুলিয়েট রোজেটী, সোহেল আহমেদ, এ এম শামসুদ্দৌলা এবং মো. নূরে আলম। টিআইবি বিভিন্ন সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) এর প্রত্যক্ষ সহায়তায় স্থানীয় পর্যায়ে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন ও কর্মশালার সফল আয়োজন করে। প্রতিটি কর্মশালায় স্থানীয় পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি, সাবেক মন্ত্রী, স্পিকার এবং সংসদ সদস্যসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণ এই গবেষণাকে অনেক সমৃদ্ধ করেছে। সনাক এর আহ্বায়ক, সদস্যসহ সকল সংশ্লিষ্টদের প্রতি রইল আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা।

টিআইবি'র ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ এই গবেষণাকর্মটির তত্ত্বাবধান করেছেন এবং দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। এছাড়া টিআইবি'র অন্য সকল বিভাগের সহকর্মীদের সহযোগিতা ব্যতিরেকে এই গবেষণাটি সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না।

এই গবেষণা প্রতিবেদনের পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনে আপনার যে কোনো মূল্যবান পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করে এটি চূড়ান্ত করা হবে। পরবর্তীতে টিআইবি তার কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে এই প্রতিবেদনের সুপারিশ ও নাগরিক প্রত্যাশার সনদ নিয়ে এ্যাডভোকেসি কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

সূচিপত্র

মুখবন্ধ	*iii*
সারণির তালিকা	*vi*
সার-সংক্ষেপ	*vii*
অধ্যায় এক: ভূমিকা	**১**
১.১ গবেষণার পটভূমি ও যৌক্তিকতা	১
১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য	২
১.৩ গবেষণা পদ্ধতি	৩
১.৩.১ গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি	২
১.৩.২ তথ্যের উৎস	২
১.৪ গবেষণায় সংগৃহীত তথ্যের সময়	৪
১.৫ গবেষণার সীমাবদ্ধতা	৪
১.৬ প্রতিবেদনের কাঠামো	৫
অধ্যায় দুই: তথ্য বিশ্লেষণ কাঠামো	**৬**
২.১ সংশ্লিষ্ট গবেষণা তথ্য পর্যালোচনা	৬
২.১.১ আইনসভার গঠন	৬
২.১.২ সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা	৬
২.১.৩ সংসদের গুরুত্বপূর্ণ অফিসসমূহ	৭
২.১.৪ আইনসভার দায়িত্ব ও কার্যক্রম	৭
২.১.৫ সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য	৮
২.২ জবাবদিহিতার ধারণা	১০
২.৩ স্বচ্ছতার ধারণা	১১
২.৩.১ কার্যকর ‘নৈতিক শাসন ব্যবস্থা’	১১
২.৪ নাগরিক সনদের (Citizen’s Charter) ধারণা	১২
২.৪.১ নাগরিক সনদের উৎপত্তি	১৩
২.৫ সংসদ ও সংসদ সদস্য সংক্রান্ত নাগরিক প্রত্যাশার সনদের যৌক্তিকতা	১৪
২.৬ বাংলাদেশের সংসদ সদস্য সংক্রান্ত আইন	১৪
২.৭ গবেষণায় আলোচিত বিষয়বস্তু	১৪
অধ্যায় তিন: সংসদ সদস্যর যোগ্যতা	**১৬**
৩.১ সংসদ সদস্য নির্বাচনে জনগণ কী বিবেচনা করে	১৬
৩.২ সংসদ সদস্যের যোগ্যতা: আলোচনার প্রেক্ষাপট	১৭
৩.৩ সংসদ সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা: সাংবিধানিক ও আইনগত ভিত্তি	১৭
৩.৪ সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা: জনগণের প্রত্যাশা	১৮
৩.৫ উপসংহার	২২
অধ্যায় চার: সংসদ সদস্য সংক্রান্ত তথ্যে জনগণের অধিকার	**২৩**
৪.১ নির্বাচনের প্রচারণায় আইন-বহির্ভূত আচরণ	২৩
৪.১.১ তথ্য অধিকারে হাইকোর্টের রায়	২৩
৪.১.২ নির্বাচনের পূর্বে প্রার্থীর ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ	২৪
৪.২ সংসদ সদস্যর পারিশ্রমিক ও ভাতা: ‘বিশেষ অধিকার’ (Privileges)	২৫
৪.৩ সংসদ সদস্যের সাথে যোগাযোগ: জনগণের চাহিদা	২৮
৪.৪ উপসংহার	৩০

অধ্যায় পাঁচ: সংসদ সদস্যের ভূমিকা **৩১**
৫.১ জনগণের দৃষ্টিতে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা ৩১
৫.১.১ স্থানীয় পর্যায়ে সংসদ সদস্যের ভূমিকা ৩১
৫.১.২ সংসদে সংসদ সদস্যের ভূমিকা ৩২
৫.২ প্রাণবন্ত সংসদ ৩২
৫.২.১ সংসদ সদস্যের সংসদে উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা ৩২
৫.২.২ সংসদ চলাকালীন সংসদে অনুপস্থিত থাকার বিষয়ে সংসদকে অবহিত করার প্রয়োজনীয়তা ৩৩
৫.২.৩ অনুপস্থিতিজনিত কারণে সদস্যপদ বাতিল সংক্রান্ত বিধান বিষয়ে মতামত ৩৩
৫.৩ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সংসদ সদস্যর ভূমিকা ৩৪
৫.৪ সংসদ সদস্যের কার্যক্রমের মূল্যায়ন ও জবাবদিহিতা: সংসদ সদস্য প্রত্যাহার ৩৫
৫.৫ উপসংহার ৩৬

অধ্যায় ছয়: কার্যকর সংসদ **৩৭**
৬.১ সংসদের মেয়াদ ৩৭
৬.২ সংসদ অধিবেশনের কার্যক্রম গণমাধ্যমে প্রচার ৩৭
৬.৩ সংসদের কার্যবিবরণীর সহজলভ্যতা ৩৮
৬.৪ সংসদে সংসদ নেতা ও বিরোধীদলীয় নেতার নিয়মিত উপস্থিতির প্রয়োজনীতা ৩৮
৬.৫ স্পিকারের ভূমিকা ৩৮
৬.৬ স্থায়ী কমিটির ভূমিকা ৩৯
৬.৭ সংসদ সদস্যদের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা:
গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের নেতিবাচক ভূমিকা ৪০
৬.৮ সংসদীয় প্রতিবাদ: ওয়াকআউট ও সংসদ বর্জন ৪০
৬.৯ সংসদীয় বিষয়ে সংসদের বাইরে প্রতিবাদ: হরতাল ও অবরোধ ৪১
৬.১০ আইন প্রণয়ন বা সংস্কার করার আগে জনগণকে সম্পৃক্ত করার প্রয়োজনীয়তা ৪১
৬.১১ সংসদে সংরক্ষিত আসনে নারী সদস্যদের নির্বাচন প্রক্রিয়া ৪২
৬.১২ উপসংহার ৪৩

অধ্যায় সাত: সংসদীয় গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা **৪৪**
৭.১ রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্র ও বাস্তবতা ৪৪
৭.২ রাজনৈতিক দলের কাছে প্রত্যাশিত রাজনৈতিক সংস্কৃতি ৪৫
৭.৩ রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন ৪৬
৭.৪ রাজনীতিতে ‘পরিবারতন্ত্র’: জনগণের প্রত্যাশা ৪৭
৭.৫ রাজনৈতিক দলের স্বচ্ছতা ৪৭
৭.৬ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন প্রাপ্তি ৪৮
৭.৭ রাজনৈতিক দলের প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ ৪৮
৭.৮ নির্বাচনী প্রচারণা ৪৯
৭.৯ উপসংহার ৫১

অধ্যায় আট: সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণ বিধি **৫২**
৮.১ সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণ বিধি: ধারণার উৎপত্তি এবং অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা ৫২
৮.২ সংসদ সদস্যের জন্য আচরণ বিধি’র মূল উপাদানসমূহ ৫৩
৮.৩ সংসদ সদস্যদের আচরণ বিধি: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ৫৪
৮.৪ উপসংহার ৫৬

অধ্যায় নয়: উপসংহার ও সুপারিশমালা **৫৭**

গ্রন্থ সহায়িকা **৬১**

পরিশিষ্ট ***(১-২১)***

সারণির তালিকা

সারণি ১.১: প্রাথমিক তথ্য উৎসের পরিসংখ্যান
সারণি ১.২: মুখ্য তথ্যদাতাদের পেশা
সারণি ১.৩: কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের পরিসংখ্যান
সারণি ৩.১: ভোট দেওয়ার আগে বিবেচ্য বিষয়
সারণি ৩.২: সংসদ সদস্যর ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা
সারণি ৩.৩: সংসদ সদস্যদের মুখ্য পেশা কী হওয়া উচিত
সারণি ৩.৪: সংসদ সদস্য কোন্ এলাকার বাসিন্দা হওয়া উচিত
সারণি ৩.৫: স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতির অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে কিনা
সারণি ৩.৬: সংসদ সদস্য হওয়ার জন্য কত বছরের রাজনীতির অভিজ্ঞতা প্রয়োজন
সারণি ৪.১: প্রার্থী সম্পর্কে জানতে চাওয়ার বিষয়
সারণি ৪.২: আইন অনুযায়ী সংসদ সদস্যদের প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার বৃদ্ধি: তুলনামূলক চিত্র
সারণি ৪.৩: আইন অনুযায়ী বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত সংসদ সদস্যদের বেতন
সারণি ৪.৪: সংসদ সদস্যর সংসদে অনুপস্থিত ও পারিশ্রমিক-ভাতা প্রাপ্তি
সারণি ৪.৫: সংসদ সদস্যের সাথে যোগাযোগ করার প্রয়োজন আছে কিনা
সারণি ৪.৬: জনগণ সংসদ সদস্যের সাথে যেভাবে যোগাযোগ করতে চায়
সারণি ৪.৭: কোথায় দেখা করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবেন
সারণি ৪.৮: মাসে কমপক্ষে কতদিন জনগণ সংসদ সদস্যকে এলাকায় দেখতে চায়
সারণি ৫.১: স্থানীয় পর্যায়ে জনগণ সংসদ সদস্যগণকে যে ভূমিকায় দেখতে চান
সারণি ৫.২: জনগণ সংসদ সদস্যগণকে যে ভূমিকায় সংসদে দেখতে চান
সারণি ৫.৩: সংসদ চলাকালীন সংসদ সদস্যের সংসদে উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা
সারণি ৫.৪: সংসদ চলাকালীন সংসদে অনুপস্থিত থাকার জন্য পূর্বানুমতির প্রয়োজনীয়তা
সারণি ৫.৫: সংসদে অনুপস্থিতির কারণে সদস্যপদ বাতিল সংক্রান্ত বর্তমান বিধানের ওপর মতামত
সারণি ৫.৬: অনুপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমার ওপর জনগণের মতামত
সারণি ৫.৭: নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সংসদ সদস্যের ভূমিকা
সারণি ৫.৮: সংসদ সদস্য প্রত্যাহার ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে কিনা
সারণি ৬.১: পাঁচ বছর মেয়াদী সংসদ সমর্থন করেন কিনা
সারণি ৬.২: সংসদ অধিবেশনের কার্যক্রম প্রচার সমর্থন করেন কিনা
সারণি ৬.৩: সকলের জন্য সংসদের কার্যবিবরণীর সহজলভ্যতা
সারণি ৬.৪: সংসদে সরকারি ও বিরোধী দলীয় নেতার নিয়মিত উপস্থিতি প্রয়োজন কিনা
সারণি ৬.৫: সংসদীয় বিষয়ে সংসদের বাইরে প্রতিবাদ করা উচিত কিনা
সারণি ৬.৬: আইন প্রণয়নের পূর্বে জনগণের সম্পৃক্ততার প্রয়োজনীয়তা
সারণি ৬.৭: নারী সদস্যের কোন নির্বাচন প্রক্রিয়াকে সমর্থন করেন
সারণি ৭.১: রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে প্রত্যাশিত রাজনৈতিক সংস্কৃতি
সারণি ৭.২: রাজনৈতিক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে পরিবারতন্ত্র থাকা যৌক্তিক কিনা
সারণি ৭.৩: রাজনৈতিক দলের যেসব বিষয় নিয়মিত প্রকাশ করা উচিত
সারণি ৭.৪: নির্বাচনে মনোনয়ন দেয়ার ক্ষেত্রে যেসব বিষয় রাজনৈতিক দলের বিবেচনা করা উচিত
সারণি ৭.৫: নির্বাচনী প্রচারণা কিভাবে হওয়া উচিত

সার-সংক্ষেপ

১. গবেষণার পটভূমি ও যৌক্তিকতা

১৯৯১ সালে সংসদীয় গণতন্ত্র পুণ:প্রতিষ্ঠার সতের বছর পরও বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ (এরপর থেকে 'সংসদ' হিসেবে উল্লিখিত) জাতীয় সততা ব্যবস্থার একটি প্রধান প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেনি। গত সংসদগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, যেসব কারণে সংসদ কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়নি, তার মধ্যে সংসদ অধিবেশনে কোরাম সংকট, বিরোধী দলের সংসদ বর্জন, সরকারি দলের সদস্যদের সংসদে আসার প্রতি অনীহা, কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণে আগ্রহের অভাব, বেশিরভাগ মন্ত্রীদের সংসদে অনুপস্থিতি, সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর অনিয়মিত বৈঠক এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা না হওয়া অন্যতম। এছাড়া সংসদ সদস্যদের আইন-বহির্ভূত কর্মকান্ড ও অনিয়ম যেমন, প্রশাসনিক কার্যক্রমে প্রভাব সৃষ্টি, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি হিসেবে দুর্নীতি, স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্প অনুমোদন ও তদারকিতে প্রভাব সৃষ্টি, স্থানীয় পর্যায়ে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজি, স্থানীয় পর্যায়ে ত্রাণ কার্যক্রমে দুর্নীতি, সরকারি ও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমি ও সম্পত্তি দখল, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরোধিতা, স্বজনপ্রীতি, বিল ও ঋণ খেলাপ, অবৈধ কার্যক্রমের মাধ্যমে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধি, সংসদ সদস্য হিসেবে প্রাপ্ত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার অপব্যবহার, এবং ক্ষমতা অপব্যবহারের মাধ্যমে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের সুযোগ দেওয়ার জন্য তাঁদের নিজেদের ভাবমূর্তি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। সংসদ সদস্যদের সংসদে অনুপস্থিতি ও দেরিতে আসার প্রবণতা এতই প্রবল ছিল যে অষ্টম সংসদে পাঁচটি বিল প্রয়োজনীয় কোরাম ছাড়াই উত্থাপিত ও অনুমোদিত হয়। সংসদের স্থায়ী কমিটিগুলো তাঁদের তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা পালন করতেও অনেকাংশে ব্যর্থ হয়। মোট কথা, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিতর্কের একটি ফোরাম হিসেবে, আইন প্রণয়নকারী সংস্থা হিসেবে, এবং স্থায়ী কমিটির কার্যকর ভূমিকা পালনের মাধ্যমে জনগণের কাছে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংসদের কাছে মানুষের প্রত্যাশা ও বাস্তবতার মধ্যে ছিল বিস্তর পার্থক্য।

এই প্রেক্ষিতে ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি-পরবর্তী সরকার দুর্নীতি ও কালো টাকার প্রভাব-মুক্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও নির্বাচনের লক্ষ্যে অভাবনীয় কিছু প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এসব উদ্যোগের মধ্যে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ, নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন ও সরকারি কর্ম কমিশনের সংস্কার ও পুনর্গঠন, জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী সনদ অনুমোদন, এবং সর্বোপরি দুর্নীতিকে শাস্তিযোগ্য অপরাধের পর্যায়ভুক্ত করার সার্বিক প্রচেষ্টা গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য একটি নতুন সুযোগ সৃষ্টি করে। সাধারণভাবে এসব প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতিগত সংস্কারের পেছনে সাধারণ জনগণের ব্যাপক সমর্থন রয়েছে বলে মনে করা হয়। তবে এখন পর্যন্ত সাধারণ জনগণ এই সংস্কার প্রক্রিয়াকে কিভাবে দেখছে, এবং এই প্রক্রিয়ায় কিভাবে তাদের চাহিদাকে সামনে রেখে পরবর্তী নির্বাচনের প্রস্তুতি প্রয়োজন, সংসদ কার্যকর করতে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা এবং সংসদ ও সরকারের কাছ থেকে জনগণের প্রত্যাশা শীর্ষক কোনো ধরনের পর্যালোচনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এই গবেষণার কাজটি হাতে নেয় যার মাধ্যমে সারা দেশের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার জনগণকে সম্পৃক্ত করে প্রথমবারের মতো সংসদ ও সংসদ সদস্যদের ওপর জনগণের পক্ষ থেকে একটি অংশগ্রহণমূলক নাগরিক প্রত্যাশার সনদ তৈরি করা হয়েছে।

১.১ গবেষণার উদ্দেশ্য

১. আগামী সংসদ নির্বাচনে জনগণ কেমন প্রার্থী প্রত্যাশা করে তা অনুধাবন করা;
২. নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের কাছে সাধারণ জনগণের প্রত্যাশা উদ্ঘাটন করা;
৩. আগামী সংসদ কার্যকর করার ক্ষেত্রে সংসদ সদস্য ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা সম্পর্কে জনগণের প্রত্যাশা অনুধাবন করা; এবং
৪. সংসদ ও সংসদ সদস্যদের প্রতি জনগণের অধিকার নির্ধারণে একটি নাগরিক প্রত্যাশার সনদ প্রস্তুত করা।

১.২ গবেষণা পদ্ধতি

তথ্যের উৎস: এই গবেষণা পরিচালনা করতে গিয়ে পরোক্ষ এবং প্রাথমিক উভয় ধরনের উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পরোক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে সংসদ ও সংসদ সদস্য সংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রন্থ, গবেষণা প্রবন্ধ, পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ, ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশিত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে:

ক. জরিপ: জরিপে বহুপর্যায়ী দৈবচয়ন নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। জরিপের এলাকাসমূহ ছয়টি বিভাগের ৩২টি নির্বাচনী এলাকায় বিস্তৃত। এসব এলাকার মধ্যে পল্লী (৫৯%) ও পৌর (৪১%)। হালনাগাদ ভোটার তালিকা না থাকার কারণে ২০০১ সালে সাধারণ নির্বাচনে ব্যবহৃত ভোটার তালিকাকে ভিত্তি ধরে আনুপাতিক হারে বিভাগ ভিত্তিক নমুনায়ন করা হয়েছে। প্রথমে মোট নির্বাচনী আসন থেকে ৩২টি আসন নির্বাচন করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে, নির্বাচিত প্রতিটি আসন থেকে দৈবচয়ন ভিত্তিতে একটি উপজেলা নির্বাচন করা হয়। তৃতীয় পর্যায়ে নির্বাচিত উপজেলার মধ্য থেকে দুইটি ওয়ার্ড বা ইউনিয়ন নির্বাচন করা হয়। চতুর্থ পর্যায়ে প্রতিটি ওয়ার্ড বা ইউনিয়ন থেকে দৈবচয়ন ভিত্তিতে গ্রাম বা মহল্লা নির্বাচন করা হয়। পঞ্চম পর্যায়ে ৩ খানা অন্তর ৫০টি খানা নির্বাচন করা হয়। ষষ্ঠ পর্যায়ে কিশ-গ্রিড পদ্ধতি অনুসরণ করে নির্বাচিত প্রতিটি খানা থেকে উপযুক্ত

ভোটারদের মধ্য থেকে একজন ভোটারকে তথ্যদাতা হিসেবে নির্বাচন করা হয়। এভাবে নির্বাচিত প্রতিটি আসন থেকে ১০০ জন করে মোট ৩,২০০ জন ভোটারের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

তথ্যদাতাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান: জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সর্বাধিক ২৮.১ শতাংশের বয়স ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। এর পরেই রয়েছে ২৮ থেকে ৩৭ বছর বয়সী (২৫.৩ শতাংশ) ও ৩৮ থেকে ৪৭ বছর বয়সী তথ্যদাতা (২০.৬ শতাংশ)। এদের মধ্যে নারীর ৪৬.৪ শতাংশ। ইসলাম ধর্মাবলম্বী ৮৭.৮ শতাংশ, এর পরেই রয়েছে হিন্দু ধর্মাবলম্বী ১১.৯ শতাংশ। তথ্যদাতাদের মধ্যে বিবাহিতদের সংখ্যাই বেশি (৮০.৩ শতাংশ)। এদের মধ্যে দশম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন সর্বাধিক ২৯.১ শতাংশ, এর পরেই রয়েছে সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন (১৯.৯ শতাংশ) ও পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা (১৭.২ শতাংশ)। তথ্যদাতাদের মধ্যে সর্বাধিক ৩৭.৩ শতাংশের পেশা গৃহকর্ম, এর পরেই রয়েছেন কৃষক (১৪.২ শতাংশ), ও ব্যবসায়ী (১১.৫ শতাংশ)। তথ্যদাতাদের মধ্যে ৪৯ শতাংশেরই কোনো ধরনের নিজস্ব আয় নেই। এদের মধ্যে গৃহিণী, ছাত্র, অবসরপ্রাপ্ত ও বেকার জনগোষ্ঠী প্রধান। বাকি ৫১ শতাংশের মাসিক গড় আয় ৫,৯০২ টাকা।

খ. ফোকাস গ্রুপ আলোচনা: স্থানীয় পর্যায়ের সাধারণ জনগণ, নাগরিক সমাজের সদস্য এবং বিভিন্ন পেশাজীবীদের সাথে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বিষয় নিয়ে ১৩টি এলাকায় ৩১২ জন অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে ২৪টি এফজিডির আয়োজন করা হয়। এসব পেশাজীবীদের মধ্যে ছিলেন কৃষক, শ্রমিক, শিক্ষক, ছাত্র, ব্যবসায়ী, আইনজীবী, দরিদ্র জনগোষ্ঠী, ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী এবং গৃহিণী। প্রতিটি এফজিডি'তে গড়ে প্রায় ১৩ জন অংশগ্রহণ করেন। এফজিডিতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ২৯৬ জনের বয়স জানা গেছে, যাদের মধ্যে ১৫-৪৫ বছর বয়সী অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা সবচাইতে বেশি (৭৩ শতাংশ) এবং ২৬৯ জনের শিক্ষাগত যোগ্যতা জানা গেছে যাদের মধ্যে স্নাতক ও মাস্টার্স ডিগ্রীধারী অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি (৫০.৯৩ শতাংশ), এবং নিরক্ষর ও সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা সবচেয়ে কম (১৩ শতাংশ)।

গ. মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার: দেশের প্রথিতযশা ৫২ জন রাজনীতি, সংবিধান, সংসদ ও নির্বাচন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত বা এসব বিষয়ে অভিজ্ঞ, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। ***মুখ্য তথ্যদাতার*** মধ্যে রয়েছেন রাজনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষক ও গবেষক, সাবেক সংসদ সদস্য ও প্রধান দলগুলোর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও উন্নয়ন সহযোগী, সাংবাদিক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, ব্যবসায়ী নেতা, এবং বর্তমান ও সাবেক নির্বাচন কমিশনার।

ঘ. কর্মশালা: গবেষণার জরিপে অন্তর্ভুক্ত এলাকাগুলোর মধ্য থেকে মোট ১৩টি এলাকায় কর্মশালার আয়োজন করা হয় যেখানে স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন পেশাজীবী এবং বিশিষ্ট নাগরিকদের সাথে গবেষণার বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা হয়। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন সাবেক মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যসহ স্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, সাংবাদিক, সরকারি চাকরিজীবী, এনজিও প্রতিনিধি, শিক্ষক, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, সমাজকর্মী, চিকিৎসক, বেসরকারি চাকরিজীবী, মুক্তিযোদ্ধা, ও ছাত্র। এসব কর্মশালায় গবেষণার বিষয়বস্তু উপস্থাপনের পাশাপাশি আমন্ত্রিতদের অংশগ্রহণে বিষয়ভিত্তিক দলীয় আলোচনার মাধ্যমে তাদের মতামত সংগ্রহ করা হয়। এসব কর্মশালায় ৮৬৯ জনের মধ্যে নারী অংশগ্রহণকারী ১২.৯ শতাংশ।

১.৩ গবেষণায় সংগৃহীত তথ্যের সময়
এই গবেষণায় ২০০৮ সালের মে থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে জরিপ ২০০৮ এর মে মাসে, দলগত আলোচনা এপ্রিল থেকে জুন, কর্মশালা জুলাই ও আগস্ট, এবং মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পরিচালিত হয়।

১.৪ গবেষণার সীমাবদ্ধতা
১) জরিপ শুরুর সময়ে হালনাগাদকৃত ভোটার তালিকা না থাকার কারণে নমুনায়ন কাঠামো নির্ধারণ করতে সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। পরবর্তীতে কিশ-গ্রিড পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে এই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করা হয়। ২) জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে (মূলত নিম্ন আয়ের মানুষ এবং গৃহিণীদের একটি বড় অংশের) সংসদ এবং সংসদ সদস্য সংক্রান্ত কোনো কোনো বিষয়ে সর্বোচ্চ ১২ শতাংশের কোনো ধারণাই নেই বলে দেখা গেছে। ৩) অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে নমুনায়ন প্রক্রিয়ায় বাছাইকৃত খানার সংশ্লিষ্ট তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার দিতে অপারগতা প্রকাশ করেছেন। ৪) গবেষণায় মুখ্য তথ্যদাতাদের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট রাজনীতিক মুখোমুখি সাক্ষাৎকার দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

২. গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য

২.১ সংসদ সদস্যর যোগ্যতা
স্বাধীনতার দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বাংলাদেশের মানুষ আটটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দিয়ে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেছে। এই নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এখন পর্যন্ত জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করতে পুরোপুরি সক্ষম হয়নি। তাঁদের অসংসদীয় আচরণ,

জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতার অভাব, দুর্নীতি, কর্মকান্ডে অস্বচ্ছতা, জনগণের সাথে দূরত্ব ইত্যাদি কারণে জনগণের মধ্যে হতাশা বেড়েছে। আর এই হতাশার পেছনে অন্যতম কারণ সংসদ সদস্যদের যোগ্যতার অভাব।

সংসদ সদস্য নির্বাচনে জনগণ কী বিবেচনা করে: আমাদের নির্বাচনী সংস্কৃতিতে জনগণের রায় পাওয়া সহজ কোন সূত্র অনুসরণ করে না। এর জন্য প্রার্থীরা নানান কৌশল ব্যবহার করে, তন্মধ্যে ব্যক্তি ইমেজ, দলীয় ইমেজ, দলের প্রতীক, ধর্মীয় মূল্যবোধ, সাম্প্রদায়িকতা, এলাকার উন্নয়নে অবদানের ইতিহাস, আঞ্চলিকতা, অর্থের প্রাচুর্য ইত্যাদি উল্লেখ করা যায়। জরিপে সাধারণ জনগণের ৯০.১% প্রার্থীর সততা, ৫৭.৫% এলাকার অবকাঠামোগত উন্নয়নে প্রার্থীর অবদান, ৪৫.১% প্রার্থীর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, এবং ২৬.৫% রাজনৈতিক দল বা প্রতীক নির্বাচনে ভোট দেওয়ার পূর্বে বিবেচনা করেন বলে জানান। এছাড়াও প্রার্থীর রাজনৈতিক দল, আঞ্চলিক পরিচয় এবং অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভোট দেওয়া হয়। এর বাইরে প্রার্থীদের কিছু নেতিবাচক দিক ভোটাররা বিবেচনা করে থাকেন। এর মধ্যে প্রার্থী অপরাধী কিনা, বিল ও ঋণ খেলাপি কিনা, সন্ত্রাসী ও কালো টাকার মালিক কিনা, এবং যুদ্ধাপরাধী ও সাম্প্রদায়িক কিনা এই বিষয়গুলো বিবেচ্য।

২.১.১ সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা: আইনগত ভিত্তি

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী সংসদ সদস্য হওয়ার যোগ্যতা হিসেবে একজন ব্যক্তির ন্যূনতম বয়স হতে হবে পঁচিশ (২৫) বছর, এবং বাংলাদেশের নাগরিক। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, শিক্ষা, বংশ, মর্যাদা ইত্যাদি বিষয়ের ঊর্ধ্বে উঠে বাংলাদেশের সকল নাগরিকের জনগণের প্রতিনিধি হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

অন্যদিকে সংবিধান ও অন্যান্য আইন অনুসারে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়া বা সংসদ সদস্য থাকার অযোগ্যতা হচ্ছে কোনো উপযুক্ত আদালত থেকে অপ্রকৃতিস্থ ঘোষণা করা, দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ার পর দায় থেকে অব্যাহতি না পাওয়া, বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করা অথবা কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করা, নৈতিক স্খলনজনিত কোনো ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে ন্যূনতম দুই বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত হওয়া এবং মুক্তিলাভের পর পাঁচ বছর অতিক্রান্ত না হওয়া, প্রজাতন্ত্রের কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকা, কোনো আইনের দ্বারা নির্বাচনের জন্য অযোগ্য ঘোষিত হওয়া, সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সরকারের সাথে কোনো ধরনের লেন-দেনের সম্পর্ক, দেশ বা দেশের বাইরের কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ঘোষিত যুদ্ধাপরাধী, সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে বিলখেলাপি, ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে গৃহীত ঋণের খেলাপি থাকা।

২.১.২ সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা: জনগণের প্রত্যাশা

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা: জরিপে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জনগণ সংসদ সদস্যপদে প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। জরিপে দেখা যায় ৮৫.৪% উত্তরদাতা সংসদে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষকে দেখতে চায়। সংসদ সদস্যদের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে আইন পর্যালোচনা, বিলের খসড়া তৈরি, স্থায়ী কমিটিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন কাজের তদারকি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ইত্যাদি দাপ্তরিক কাজ করতে হয়। আর এ সকল বিষয়ে পারদর্শী হতে গেলে তাঁদের সুশিক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

অন্যদিকে মাত্র ১.৩% উত্তরদাতা সংসদ সদস্য হতে কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রাসঙ্গিক নয় বলে মনে করেন। তাদের মতে বিভিন্ন দেশের সফল জনপ্রতিনিধিদের উল্লেখ করে তাঁদের যোগ্যতা বিবেচনায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্ব অসার প্রমাণিত করা যায়। এক্ষেত্রে একজন সংসদ সদস্যের প্রধান যোগ্যতা হওয়া উচিত দেশ ও জনগণকে উপলব্ধি করা। গণতন্ত্র, সংবিধান, দেশপ্রেম, উন্নয়ন চিন্তা, ধর্মনিরপেক্ষতা, মানুষের সমতা, মানুষের অনুভূতি এসব বিষয় অনুধাবন করতে শিক্ষাগত যোগ্যতার দরকার নেই। এরা যে কোন শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন হতে পারেন। তাই সংসদ সদস্যদের প্রাতিষ্ঠানিক বা পেশাগত শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারিত করে দিলে তা জনগণের সাংবিধানিক অধিকার পরিপন্থী হবে।

সংসদ সদস্যদের পেশা: বাংলাদেশের সংবিধানে, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে বা সংসদীয় কার্যপ্রণালী বিধিতে কোন্ পেশাজীবী সংসদ সদস্য হবেন তা সম্পর্কে কিছু বলা নেই। তবে উল্লেখ্য, সংবিধান অনুযায়ী সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সরকারের সাথে কোনো ধরনের লেন-দেনের সম্পর্ককে অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় সংসদ সদস্য হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কোন পেশার প্রতিনিধির প্রয়োজন নেই। যে কোন পেশাজীবী জাতীয় সংসদে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন।

সংসদে যোগ্য প্রতিনিধিত্বের অভাবের পেছনে রাজনীতির বাণিজ্যিকীকরণকে অনেকে দায়ী করেন। সর্বশেষ সংসদে ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিত্ব বেশী দেখা গেছে। ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা নিজস্ব ব্যবসায়িক প্রয়োজনে সংসদে অনুপস্থিত থেকেছেন বেশি এবং সংসদ সদস্য হিসেবে প্রাপ্ত কর্তৃত্ব খাটিয়ে নিজ নিজ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেছেন বলে অনেক তথ্যদাতা মত দিয়েছেন। এর ফলে প্রকৃত রাজনীতিবিদরা দীর্ঘ সময় জনগণের সাথে থেকেও তাদের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পায় না। জরিপেও সাধারণ

জনগণের কাছে থেকে প্রাপ্ত জরিপের ফলাফলে সংসদ সদস্য হিসেবে ব্যবসায়ীদের বেছে নিতে দেখা গেছে খুব কম (৮.৪%)। অধিকাংশ মুখ্যদাতাদের ন্যায় বেশীর ভাগ উত্তরদাতা (৩৫.৪%) যে কোন পেশীজীবীই সংসদ সদস্য হতে পারেন বলে তাদের মত দেন। এর পরে ২০.৪% উত্তরদাতা সংসদ সদস্যর প্রধান পেশা হিসেবে আইন ব্যবসাকে বেছে নিয়েছেন।

প্রার্থীর আঞ্চলিক পরিচয়: বাংলাদেশে সংসদীয় আসন ব্যবস্থা ভিত্তিক নির্বাচন হয়ে থাকে। একটি সংসদীয় এলাকায় একজন ভোটার একজন প্রার্থীকে একটি ভোট দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। অন্যদিকে একজন প্রার্থী যে কোন নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। সংবিধানে একজন ব্যক্তি একাধিক আসনে এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ (সংশোধিত ২০০৮) মোতাবেক একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ তিনটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। কোন ব্যক্তি একই সময়ে দুই বা ততোধিক নির্বাচনী এলাকার সংসদ-সদস্য হতে পারবেন না। এ কারণে সংসদ নির্বাচনের একজন প্রার্থী একটি অঞ্চলের বাসিন্দা হয়েও নিজ এলাকায় বা বাংলাদেশের যে কোন প্রান্তে নির্বাচন করতে পারেন।

আমাদের নির্বাচনী সংস্কৃতিতে প্রার্থীরা নিজ সংসদীয় এলাকার মানুষের প্রয়োজন অনুধাবন করে এবং তার সমাধান করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচিত হন। কিন্তু জরিপকালে প্রতিটি এলাকা থেকে সংসদ সদস্যদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থতার অভিযোগ এসেছে। আর এর সাথে যুক্ত হয়েছে ভিন্ন এলাকা থেকে এসে নির্বাচিত হয়ে সংসদ সদস্যর এলাকার সমস্যার কথা সংসদে তুলে না ধরা, এলাকায় না আসা বা এলাকার জনসাধারণের সাথে সম্পর্ক না রাখা। তাইতো প্রায় ৮৭% উত্তরদাতা সংসদ সদস্য হিসেবে নিজ এলাকার বাসিন্দাদের দেখতে চান।

স্থানীয় পর্যায়ে রাজনীতির অভিজ্ঞতা: দেশের জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায়, জনগণের সমস্যার সমাধানে, দেশের সংকট মুহূর্তে জনগণের পাশে থেকে রাজনীতি করার মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃত্ব তৈরি হয়। আবার জনগণের সমস্যা সম্পর্কে অবগত না হয়েও, দেশ সম্পর্কে না জেনেও সর্বোপরি রাজনীতির অভিজ্ঞতা না থেকেও অনেক ব্যবসায়ী, অবসরপ্রাপ্ত আমলা বা সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তা রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। জনগণ মনে করে, একজন সংসদ সদস্যের রাজনীতির অভিজ্ঞতা না থাকলে তাঁরা এলাকার মানুষের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন না, দেশের মানুষ সম্পর্কে উপলব্ধি তৈরি হয় না এবং দেশের উন্নয়নে যথার্থই পদক্ষেপ নিতে পারেন না। তাইতো ৯১% উত্তরদাতা সংসদ সদস্যর রাজনীতির অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন। রাজনীতির অভিজ্ঞতা অর্জনের বিষয়টি নির্দিষ্ট মেয়াদে বাধা না গেলেও ৭২% উত্তরদাতা পাঁচ বছরের বেশি অভিজ্ঞ রাজনীতিককে সংসদ সদস্য হিসেবে দেখতে চান।

মোটকথা, জনগণ আশা করে আইনপ্রণেতা হিসেবে সংসদ সদস্যদের আইনসহ বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞান থাকা, দেশে ও বিদেশে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করতে প্রজ্ঞা, কূটনৈতিকতা ও দূরদর্শিতা, জনগণের রোল মডেল হিসেবে সৎ, চরিত্রবান, অসাম্প্রদায়িক, স্বাধীনতার চেতনার ধারক, মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন এবং দেশপ্রেমিক হতে হবে। জনগণ বিল ও ঋণ খেলাপী, সন্ত্রাসী, কালো টাকার মালিক, ভূমিদস্যু, যুদ্ধাপরাধী, জন-বিচ্ছিন্ন, সাম্প্রদায়িক, এবং দুর্নীতিবাজদের সংসদ সদস্য হিসেবে দেখতে চায় না।

৩. সংসদ সদস্য সংক্রান্ত তথ্যে জনগণের অধিকার

জবাবদিহিতার অন্যতম পূর্বশর্ত স্বচ্ছতা আর স্বচ্ছতার পূর্বশর্ত তথ্যে প্রবেশাধিকার। তথ্যের অবাধ প্রবাহ সৃষ্টি করা হলে জনগণ যেমন তাদের অধিকার সম্পর্কে জানবে তেমনি তাদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হবে। সুতরাং রাজনৈতিক দল ও সংসদ সম্পর্কিত তথ্যের উন্মুক্তকরণ হলে তাঁদের সম্পর্কে জনগণ অবগত হবে এবং এর মাধ্যমে তাঁদের জবাবদিহিতার ক্ষেত্র তৈরি হবে।

৩.১ তথ্য অধিকারে হাইকোর্টের রায়

বাংলাদেশে জন প্রতিনিধির স্বচ্ছতা ও যোগ্যতার প্রশ্নে ২০০৫ সালের ২৪ মে একটি জনস্বার্থ মামলার প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট ডিভিশন নির্দেশ প্রদান করেন যে নির্বাচন কমিশন যেন প্রার্থীদের ব্যক্তিগত তথ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করে ভোটারদের সঠিক প্রতিনিধি নির্বাচন করতে নিশ্চিত করেন। এই আদেশের বলে নির্বাচন কমিশনের কাছে যেসব তথ্য প্রকাশ করা প্রয়োজন সেগুলো হচ্ছে: (১) শিক্ষাগত যোগ্যতা, (২) বর্তমানে প্রার্থীর বিরুদ্ধে রুজুকৃত ফৌজদারি অপরাধের তালিকা, (৩) অতীতের ফৌজদারি মামলার তালিকা ও ফলাফল, (৪) প্রার্থীর পেশা, (৫) প্রার্থীর আয়ের উৎস(সমূহ), (৬) অতীতে সংসদ সদস্য হয়ে থাকলে জনগণের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণে তার ভূমিকা, (৭) প্রার্থী ও তার ওপর নির্ভরশীলদের সম্পদ ও দায়-দেনার বর্ণনা, এবং (৮) ব্যাংক বা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যক্তিগত বা যৌথভাবে এবং এমন কোম্পানি থেকে নেওয়া ঋণের পরিমাণ ও বর্ণনা যে কোম্পানির তিনি সভাপতি, বা নির্বাহী পরিচালক বা পরিচালক। জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার তাদের ভোটাধিকারের অন্তর্ভুক্ত। তবে এই রায়ের পরও অভিযোগ ওঠে নির্বাচন কমিশন এসব তথ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে যথাযথ উদ্যোগ নিচ্ছে না, প্রার্থীরা এসব তথ্য দিতে আগ্রহী নয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে ভুল তথ্য দিচ্ছে, পরবর্তীতে নির্বাচন কমিশন সেসব তথ্য প্রচারে উদ্যোগ নিচ্ছে না এবং সেসব তথ্য সরবরাহও করছে না। ফলে প্রার্থীদের সম্পর্কে জনগণের জানার যে অধিকার তা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। তবে নির্বাচন কমিশন ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের ব্যক্তিগত তথ্য-সম্বলিত হলফনামা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে।

৩.২ *নির্বাচনের পূর্বে প্রার্থীর ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ*

এই গবেষণায় জরিপের উত্তরদাতারা নির্বাচনের পূর্বে প্রার্থীদের সম্পর্কে যে সকল তথ্য জানতে চায় বলে জানায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শিক্ষাগত যোগ্যতা (৮৭.১%), আয়ের উৎস (৭০.৯%), পেশা (৪৯.৫%), ফৌজদারী মামলা (৬০.৪%), সম্পদের পরিমাণ (৫১.৯%), নির্বাচনীয় প্রচারণার ব্যয় (৪১.৬%), সংসদ সদস্য হিসেবে এলাকায় অবদান (৬২.২%)। এর বাইরেও জনগণ সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য কর, বিল ও ঋণ খেলাপি কিনা তা জানারও প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। এর মাধ্যম হিসেবে নির্বাচন কমিশন, সংসদ বা অন্য কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান ভূমিকা রাখতে পারে। তথ্যের যথার্থতা যাচাই করতে কর বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ, পুলিশ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর একসাথে কাজ করবে এবং সেসব তথ্য ওয়েবসাইট বা গণ মাধ্যমে (খবরের কাগজ ও রেডিও-টিভি) প্রকাশ করবে। যদি কোনো তথ্য ভুল প্রমাণিত হয় তবে তার জন্য শাস্তির ব্যবস্থাও করতে হবে।

৩.৩ *নির্বাচনের পরে সংসদ সদস্যদের ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ*

এসকল তথ্যের সাথে সাথে জনগণের পক্ষ থেকে দাবি ওঠে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা তাঁদের আয়-ব্যয় সহ ব্যক্তিগত অন্যান্য তথ্যাদি প্রতি বছর হালনাগাদ করবেন এবং জনগণের জন্য তা প্রকাশ করবেন। মাধ্যম হিসেবে নির্বাচন কমিশন বা সংসদ বা অন্য কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান ভূমিকা রাখতে পারে। তথ্যের যথার্থতা যাচাই করতে কর বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ, পুলিশ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় সহ সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর একসাথে কাজ করবে এবং সেই সকল তথ্য ওয়েবসাইটে বা গণ মাধ্যমে (খবরের কাগজ ও রেডিও-টিভি) প্রকাশ করবে। যদি কোন তথ্য ভুল প্রমাণিত হয় তবে তার জন্য শাস্তির ব্যবস্থাও থাকা উচিত বলে জনগণ প্রত্যাশা করে।

৩.৪ *সংসদ সদস্যর পারিশ্রমিক ও ভাতা*

তথ্যের অপ্রতুলতার জন্য সংসদ সদস্যর পারিশ্রমিক বিষয়ে জনগণের মাঝে অনেক ভুল ধারণা রয়েছে। এর পেছনে রয়েছে সংসদ সদস্যর আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন। সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর খুব অল্প সময়ে অনেকের ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণ, গাড়ি ও বাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং জীবন যাত্রায় আমূল পরিবর্তন আসে।

সর্বশেষ হালনাগাদকৃত আইন অনুযায়ী (২০০৫ সাল) সংসদ সদস্যদের প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা হল সম্মানী (মাসিক) ১৫,০০০ টাকা, অধিবেশন চলাকালীন দৈনিক ভাতা ৫০০ টাকা, যাতায়াত ভাতা ৬ (প্রতি কিমি), ভ্রমণ ভাতা (বার্ষিক এককালীন) ৫০,০০০ টাকা, আপ্যায়ন ভাতা (মাসিক) ২,০০০ টাকা, নির্বাচনী এলাকা ভাতা (মাসিক) ৫,০০০ টাকা, চিকিৎসা ভাতা (মাসিক) ২০০ টাকা, টেলিফোন বিল (মাসিক) ৬,০০০ টাকা, নির্বাচনী এলাকায় অফিস খরচ (মাসিক) ৬,০০০ টাকা, নির্বাচনী এলাকার জন্য বার্ষিক থোক বরাদ্দ ১,০০,০০০ টাকা। এর বাইরেও সংসদ সদস্যরা রাজধানীতে আবাসিক সুবিধা পেয়ে থাকেন। জাতীয় সংসদ ভবন সংলগ্ন এমপি হোস্টেলে বা ন্যাম ফ্ল্যাটে নামমাত্র ভাড়ায় কক্ষ বা ফ্ল্যাট সুবিধা পান। সংসদ সদস্যরা সদস্য থাকা অবস্থায় দুর্ঘটনার কারণে মৃত্যু বা শারীরিক ক্ষতির জন্য বীমা সুবিধা পেয়ে থাকেন। এছাড়াও সংসদ সদস্যরা ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট পেয়ে থাকেন। জাতীয় সংসদের সদস্যদের শুল্কমুক্ত গাড়ির সুবিধা ১৯৮৮ সালের ২৪ মে একটি প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে দেওয়া শুরু হয়। শুল্কমুক্ত গাড়ি আমদানির সুবিধার ব্যাপক অপব্যবহারের কারণে ২০০৭ সালের ১৬ এপ্রিল বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টাদের কাউন্সিল এই শুল্কমুক্ত গাড়ির সুবিধা বাতিল করেন। আইন অনুযায়ী সংসদ সদস্যরা মাসিক পারিশ্রমিক-ভাতা ছাড়াও সংসদ অধিবেশন চলাকালীন ভাতা পেয়ে থাকেন।

এই গবেষণার জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় প্রায় ৮৬% উত্তরদাতা বলেন, সংসদ সদস্য লাগাতার অনুপস্থিত বা বয়কট করলে সকল প্রকার পারিশ্রমিক ও ভাতা প্রদান নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থনযোগ্য নয় বলে জানান। যদিও মাত্র ৮.২% উত্তরদাতা সংসদে উপস্থিত না থেকেও সংসদ সদস্যরা তাঁদের প্রাপ্য পারিশ্রমিক ও ভাতা গ্রহণ করতে পারেন বলে মত দেন, কিন্তু মুখ্য তথ্যদাতাদের অনেকে এই মতের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলেন সংসদ সদস্যরা কারো চাকরি করেন না। জনগণের রায় নিয়ে সংসদে তাদের প্রতিনিধিত্ব করেন। তাই একজন সরকারি চাকরিজীবীর ন্যায় তাঁদের মূল্যায়ন করা উচিত নয়।

৩.৫ *সংসদ সদস্যের সাথে যোগাযোগ*

সংসদ সদস্য একটি নির্দিষ্ট এলাকার ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে সংসদে যান। তাঁদের অন্যতম দায়িত্ব হলো আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করা এবং নিজ এলাকার সমস্যা সংসদে তুলে ধরা। তাই তাঁদের নিজ নির্বাচনী এলাকার জনগণের সাথে সম্পর্ক রাখা উচিত বলে অনেকেই মনে করেন। জরিপের ৮৭.৫% উত্তরদাতা মনে করেন সংসদ সদস্যর সাথে তাদের যোগাযোগ করার প্রয়োজন রয়েছে। এদের প্রায় ৮২% সরাসরি দেখা করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন বলে জরিপে মত দেন। যে সকল উত্তরদাতা সংসদ সদস্যর সাথে সরাসরি দেখা করতে চান তাদের প্রায় ৪৯% সংসদ সদস্যের বাড়িতে দেখা করতে চান, এবং প্রায় ৩৩% সংসদ সদস্যের নিজস্ব অফিসে দেখা করতে চান বলে জানান। সংসদ সদস্যদের নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায় এক মাসে কমপক্ষে ৪-৭ দিন উপস্থিত থাকার কথা বলেছেন প্রায় ৩৫%। তবে জনগণের কাছ থেকে সংসদ সদস্যদের জন্য এলাকায় সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত একটি অফিসের প্রত্যাশা জানা যায়, যেখানে জনগণ তাঁর সাথে দেখা করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন।

জনগণ অনেকক্ষেত্রে তাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে, সুপারিশের জন্য সংসদ সদস্যের সাথে যোগাযোগ করতে চান। জনগণের এই ধরনের মানসিকতা তৈরির পেছনে শুধুমাত্র জনগণই দায়ী না, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীরা জনগণকে প্রলোভিত করতে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন, এমনকি নির্বাচনের পূর্বে ও পরে নিজ নির্বাচনী এলাকার জনগণকে অর্থ দিয়ে এবং ব্যক্তিগত বিভিন্ন প্রয়োজনে সুপারিশ করে সহায়তা করে থাকেন।

অন্যদিকে, সংসদ সদস্যদের নিয়মিত সংসদে উপস্থিত হতে হবে, বিভিন্ন কমিটিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে, জাতীয় সমস্যার সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, দেশের স্বার্থ রক্ষার্থে ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কে কূটকৌশলী ও দূরদর্শী হতে হবে এবং নিজ দেশের ভাবমূর্তি রক্ষার্থে যথার্থভাবে দেশকে প্রতিনিধিত্ব করতে হবে বলে অনেক তথ্যদাতা বলেন। এ কারণে নিজ এলাকার জনগণের সাথে ঘনঘন যোগাযোগের প্রয়োজন নেই।

৪. সংসদ সদস্যের ভূমিকা

৪.১ স্থানীয় পর্যায়ে সংসদ সদস্যের ভূমিকা

সংসদ সদস্যগণের নিজ নিজ এলাকার অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত থাকা উচিত নয়। তবে তাঁরা স্থানীয় সরকার এলাকার অবকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তার ওপর প্রতিবেদন তৈরি করে সংসদে তা উপস্থাপন করবেন। কিন্তু স্থানীয় সরকারের কাজে হস্তক্ষেপ কোন অর্থেই কাম্য নয় এবং তা একজন সংসদ সদস্যের এখতিয়ারভুক্ত নয়। স্থানীয় পর্যায়ে অন্যান্য ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সংসদ সদস্যের উপস্থিতি থাকা উচিত নয়।

একজন সংসদ সদস্যের মূল দায়িত্ব আইন প্রণয়ন করা কিন্তু তাঁরা নিজ নির্বাচনী এলাকার অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সরাসরি যুক্ত থাকার ফলে সাধারণ মানুষের কাছে ভিন্নমুখী প্রত্যাশা তৈরি হচ্ছে। জনগণ মনে করেন, সংসদ সদস্যগণ নিবাচিত হয়ে এলাকার রাস্তা-ঘাট, স্কুল-কলেজ, কালভার্ট ইত্যাদি নির্মাণ করে দিবেন। এমনকি তারা মনে করেন, চাকরিক্ষেত্রে বা ব্যবসায়িক প্রয়োজনে সংসদ সদস্য সুপারিশ করবেন। সাধারণ জনগণের এই প্রত্যাশার প্রতিফলন জরিপেও পাওয়া যায়। জরিপের ৯০% উত্তরদাতা অবকাঠামো উন্নয়নে সংসদ সদস্যগণের অংশগ্রহণ আশা করেন, ৮০.৩% ব্যক্তিগত কাজে সংসদ সদস্যগণকে দেখতে চান, ৬৭.৩% স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে তদারকি করার ভূমিকায় তাঁদের দেখতে চান, প্রায় ৭০% প্রকল্প বাস্তবায়নে হস্তক্ষেপ আশা করেন না, ৬৮.৭% স্থানীয় পর্যায়ে আইন-শৃঙ্খলা তদারকির কাজে তাঁদের দেখতে চান, ৪০% স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটিতে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের ভূমিকায় তাঁদের দেখতে চান না বা খুব কম দেখতে চান।

৪.২ সংসদে সংসদ সদস্যের ভূমিকা

গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায় উত্তরদাতাদের ৮৭% সংসদে এলাকার সমস্যা তুলে ধরার কাজে, ৮২.৬% আইন প্রণয়নের কাজে, ৮৯.২% সরকারকে জবাবদিহি করার ভূমিকায় এবং ৭২.৪% স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে সরকারের কাজ তদারকি করার ভূমিকায় সংসদ সদস্যদের দেখতে চান।

৪.৩ সংসদ সদস্যের সংসদে উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা

জাতীয় সংসদে সংসদ সদস্যের নিয়মিত উপস্থিতি একান্ত কাম্য কিন্তু গত সংসদের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, সংসদে যোগদানের ব্যাপারে তাঁদের অনাগ্রহ সংসদীয় কার্যক্রমে অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছিল। জরিপের ফলাফলে দেখা যায়, ৯৬.২% জনগণ সংসদ চলাকালীন সংসদ সদস্যের সংসদে নিয়মিত উপস্থিত থাকা অপরিহার্য বা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মত দিয়েছেন।

৪.৪ সংসদ চলাকালীন সংসদে অনুপস্থিত থাকার বিষয়ে সংসদকে অবহিত করার প্রয়োজনীয়তা

অধিকাংশ উত্তরদাতা সংসদ চলাকালীন সময়ে সংসদ সদস্যদের সংসদে অবশ্যই উপস্থিত থাকা উচিত বলে মত দেন। সংসদে উপস্থিত থেকে এলাকার সমস্যা সংসদে তুলে ধরে নীতি প্রণয়ন করার জন্যই জনগণ তাঁদের নির্বাচিত করেন। যদি কোন কারণে তিনি উপস্থিত থাকতে না পারেন তবে সংসদকে অবহিত করা অবশ্যই উচিত। জরিপে অংশগ্রহণকারী ৯৩.২% জনগণও এই যুক্তির পক্ষে মত দেন।

৪.৫ অনুপস্থিতিজনিত কারণে সদস্যপদ বাতিল সংক্রান্ত বিধি

সংবিধান অনুসারে কোন সংসদ সদস্য সংসদের অনুমতি না নিয়ে একাদিক্রমে ৯০ বৈঠক দিবস অনুপস্থিত থাকলে তাঁর সদস্য পদ শূন্য হয়। অনেক সংসদ সদস্যকেই এই সুযোগের অপব্যবহার করতে দেখা যায়। জনগণ মনে করেন, ৮৯ বৈঠকদিবস পর্যন্ত সংসদে অনুপস্থিত থাকতে পারবেন এবং ৯০ বৈঠকদিবসে সদস্যপদ বাতিল হবে এমন বিধি থাকা উচিত নয়। প্রায় ৮২% জনগণ অনুপস্থিতিজনিত কারণে সদস্যপদ বাতিল সংক্রান্ত বর্তমান সাংবিধানিক আইন সমর্থন করেন না। সংসদে সরকারি দলের স্বেচ্ছাচারিতা, স্পিকারের পক্ষপাতিত্ব, বেসরকারি সংসদ সদস্যদের বিল বা মতামতের প্রতি অবজ্ঞা ইত্যাদি কারণে বিরোধী দলের সংসদ বয়কট করার অধিকার থাকা উচিত বলে মত পাওয়া যায়।

জরিপে অংশগ্রহণকারী প্রায় ৭১% অনুপস্থিতিজনিত কারণে সদস্যপদ বাতিল সংক্রান্ত বর্তমান বিধান পরিবর্তন করে ৯০ বৈঠক দিবসের পরিবর্তে ৩০ বৈঠক দিবসের কম যেকোন সীমা নির্ধারণ করার পক্ষে মত দেন।

৪.৬ বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিতিজনিত কারণে পারিশ্রমিক-ভাতা কর্তন

অসুস্থতা বা রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ ব্যতিরেকে একজন সংসদ সদস্যের সংসদ অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকা উচিত নয়। বিশেষ প্রয়োজনে বাইরে থাকতে হলেও অবশ্যই সংসদীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি নেওয়া উচিত। অনুমতি না নিয়ে একজন সংসদ সদস্য সংসদে অনুপস্থিত থাকলে তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান যেমন, পারিশ্রমিক-ভাতাদি কর্তন, সদস্যপদ বাতিল, শোকজ নোটিশ প্রদান ইত্যাদির বিধান রাখা উচিত বলে অনেকে মত দেন। জরিপে মতামত প্রদানকারী প্রায় ৮৬% মনে করেন, অনুমতি ছাড়া সংসদে অনুপস্থিত থাকলে পারিশ্রমিক ও ভাতা আনুপাতিকহারে কর্তন করা উচিত। তবে জরিপে অংশগ্রহণকারী ৮.২% জনগণের সাথে মুখ্য উত্তরদাতাদের কেউ কেউ মনে করেন আইন করে সংসদ সদস্যদের পারিশ্রমিক-ভাতাদি কর্তন করা ঠিক হবে না।

৪.৭ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সংসদ সদস্যর ভূমিকা

প্রতিটি সংসদীয় গণতান্ত্রিক দেশেই নির্বাচনী প্রচার প্রচারণার একটি অপরিহার্য অংশ হল প্রার্থীর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি প্রদান। প্রতিটি সংসদ সদস্য প্রতিটি নির্বাচনী জনসভায় অসংখ্য প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন, আবার বাড়ি বাড়ি পরিদর্শনে যেয়েও ব্যক্তিগত পর্যায়ে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দেন। এর মাধ্যমে তাঁরা জনগণের কাছাকাছি আসেন, জনগণ সংসদ সদস্যর এই সকল প্রতিশ্রুতির ওপর আস্থা রেখে তাঁদের ভোট দিয়ে বিজয়ী করেন। কিন্তু সকল নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের পক্ষে বিভিন্ন কারণেই সকল প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। এছাড়া নির্বাচনের সময় এমন প্রতিশ্রুতি তাঁরা দিয়ে থাকেন যেগুলো তাঁদের পক্ষে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয় বা স্থানীয় সরকারের এখতিয়ারভুক্ত, তা জেনেও ভোট পাবার আশায় তা করেন। তাইতো জরিপের ফলাফলে দেখা যায়, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে খুবই ভালো ভূমিকা রেখেছে বলে মত দিয়েছেন মাত্র ৪%, অন্যদিকে কোন ভূমিকাই পালন করেননি বলেছেন প্রায় ১৭.৪%। মোটামুটি ভূমিকা রেখেছেন বলে বেশির ভাগ (৩৭.২%) উত্তরদাতা মত দিয়েছেন।

৪.৮ সংসদ সদস্য প্রত্যাহার

জনগণ ভোট দিয়ে পাঁচ বছরের জন্য তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। তাই সংসদ সদস্যদের অসংসদীয় ও দায়িত্বহীন আচরণ সম্পর্কে জনগণ অবগত হয়েও কিছু করতে পারে না। এ প্রেক্ষাপটে উত্তরদাতারা মধ্যবর্তী নির্বাচনের পক্ষে তাদের মত দেন। প্রায় ৭৬% উত্তরদাতা মনে করেন, সংসদ সদস্যরা নির্বাচন পূর্ব প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির সঠিক বাস্তবায়ন না করলে এবং সংসদে জনগণের প্রতিনিধিত্ব না করলে মধ্যবর্তী নির্বাচনের মাধ্যমে তাঁদের জবাবদিহিতার ক্ষেত্র সৃষ্টি করা যেতে পারে।

অন্যদিকে প্রায় ১৬% উত্তরদাতা মধ্যবর্তী নির্বাচনকে সমর্থন করেননি। তাঁদের যুক্তি হল, একটি নির্বাচনে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। মধ্যবর্তী নির্বাচন ঘন ঘন হতে গেলে দরিদ্র দেশ হিসেবে আমাদের অর্থের ব্যাপক অপচয় হবে। তাছাড়া এই ধরনের ব্যবস্থায় বিরোধী দলগুলো সরকারি দলের সংসদ সদস্যদের ব্যর্থ করার নিরন্তর চেষ্টায় লিপ্ত থাকবে বলে। তবে অনেকেই তত্ত্বগতভাবে ধারণাটিকে সমর্থন করলেও মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রক্রিয়াটির অস্পষ্টতার জন্য এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অসহনশীল ও পেশাদারী রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিরাজমান না থাকায় মধ্যবর্তী নির্বাচন প্রক্রিয়া এখনই প্রবর্তনের বিপক্ষে মত দেন।

৫. কার্যকর সংসদ

৫.১ সংসদ অধিবেশনের কার্যক্রম গণমাধ্যমে প্রচার

গত অষ্টম সংসদের কার্যক্রম 'রেডিও বাংলাদেশ' সরাসরি প্রচার করেছিল। বাংলাদেশ টেলিভিশন প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব ও বাজেট অধিবেশনের কিছু অংশ প্রচার করেছিল। গত সংসদে বেসরকারি রেডিও ও টেলিভিশনের সংবাদকর্মীদের প্রশোধিকার ছিল না। সংসদ অধিবেশন চলাকালীন প্রবেশাধিকারের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা থাকা উচিত নয়। এখানে সরকারি, বেসরকারি সবগুলো চ্যানেলের প্রবেশাধিকার থাকা উচিত।

সংসদ অধিবেশন চলার সময় এর সকল কার্যক্রম প্রচার করা উচিত। এজন্য আলাদা টিভি এবং রেডিও চ্যানেল থাকতে পারে বলে জনমত পাওয়া যায়। তবে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকের আলোচনা সরাসরি প্রচার না করে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত গোপন বিষয় ছাড়া বৈঠকের অন্য সকল বিষয়ের ওপর কার্যবিবরণী প্রণয়ন করে তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা উচিত। ৯৬.১% জনগণ সংসদ অধিবেশনের কার্যক্রম প্রচার করা উচিত বলে মনে করেন।

৫.২ সংসদের কার্যবিবরণীর সহজলভ্যতা

সংসদের কার্যবিবরণী বুলেটিন আকারে সকলের জন্য অবশ্যই সহজলভ্য করা উচিত। ৮০.২% উত্তরদাতা সংসদের কার্যবিবরণী সকলের জন্য সহজলভ্য হওয়া উচিত বলে মনে করেন। এছাড়া এটি প্রকাশিত দলিল হিসেবে ওয়েবসাইটে, বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে, ক্যালেন্ডারের এজেন্ডা বা প্রেস রিলিজের মাধ্যমে প্রচার করতে হবে। যেন জনগণ অল্প খরচ ও সময়ে এই সকল তথ্য পেতে পারে।

৫.৩ সংসদ নেতা ও বিরোধী দলীয় নেতার নিয়মিত উপস্থিতির প্রয়োজনীতা

গত অষ্টম সংসদের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, সংসদ নেতা বা বিরোধী দলীয় নেতা সংসদ অধিবেশনে উপস্থিত থাকলে অন্যান্য

সদস্যদের উপস্থিতি বেশি থাকে। কিন্তু গত সংসদে প্রধান বিরোধী দলের লাগাতার সংসদ বর্জন ও সরকারি দলের সদস্যদের সংসদ অধিবেশনে যোগদানে অনাগ্রহ সংসদীয় কার্যক্রমে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছিল। প্রায়ই কোরাম সংকটের কারণে অধিবেশন দেরীতে শুরু হত। এমনকি কোরাম সংকটের কারণে সংসদের অধিবেশন মাঝপথে মুলতবিও হয়ে যেত। সংসদ অধিবেশন চলাকালীন সময়ে সংসদের নেতা ও বিরোধী দলীয় নেতাকে সংসদে অবশ্যই নিয়মিত উপস্থিত থেকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রায় ৯৫% উত্তরদাতা সংসদ অধিবেশন চলাকালীন সময়ে সংসদে উপস্থিতির পক্ষে মত দেন।

৫.৪ স্পিকারের ভূমিকা

সংসদ কার্যকর ও প্রাণবন্ত করতে সংসদের অভিভাবক হিসেবে স্পিকারের ভূমিকা অপরিসীম। সংসদ কার্যকর করার আর একটি পূর্বশর্ত স্পিকারের ওপর বিরোধী দলের আস্থা। অষ্টম সংসদে বিভিন্ন সময় স্পিকারের নিরপেক্ষতা ও যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। অষ্টম সংসদে বিভিন্ন সময় স্পিকারের নিরপেক্ষতা ও যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। দেখা যায়, অষ্টম সংসদের অধিবেশনগুলোতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন এবং মন্ত্রীদের কাছে প্রশ্নোত্তর পর্বে বিরোধী দলের অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল সীমিত। এছাড়াও বিরোধী দলের সদস্যদের মাইক বন্ধ করা এবং তাড়া দেওয়ার ঘটনা তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। জনগণ সংসদকে কার্যকর করতে স্পিকার সরকারি দল থেকে এবং ডেপুটি স্পিকার বিরোধী দল থেকে নির্বাচিত করা এবং বাজেট ও আইন প্রণয়ন কার্যাবলীসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যদিবসে ডেপুটি স্পিকারকে শতকরা অন্তত ৪০ ভাগ সভাপতিত্ব করার বিধান চালু করা উচিত বলে মত দেন।

৫.৫ স্থায়ী কমিটির ভূমিকা

একটি দেশের সুসংগঠিত ও কার্যকর কমিটি ব্যবস্থা গণতন্ত্রকে শক্তিশালী রূপ দিতে অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী প্রত্যেক স্থায়ী কমিটি মাসে অন্ততপক্ষে একটি বৈঠকে মিলিত হবে। স্থায়ী কমিটির কাজ সংসদ কর্তৃক উক্ত কমিটিতে প্রেরিত যে কোন বিল বা বিষয় পরীক্ষা করা, উক্ত কমিটির আওতাধীন মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী পর্যালোচনা করা, মন্ত্রণালয়ের কার্যকলাপ বা অনিয়ম ও গুরুতর অভিযোগ তদন্ত করা এবং কমিটি যথোপযুক্ত মনে করলে উক্ত কমিটির আওতাধীন যে কোন বিষয় সম্পর্কে পরীক্ষা করা ও সুপারিশ করা। বাংলাদেশের কমিটি কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ও হিসাব সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির মধ্যে মাত্র ১৩.২% কার্যপ্রণালী বিধি অনুসরণ করে বৈঠক করতে সমর্থ হয়। এই বৈঠকগুলো পর্যালোচনা করে দেখা যায় খুব কম সংখ্যক বৈঠকেই দুর্নীতি বা অনিয়মের বিষয় আলোচিত হয়। আবার যেগুলো আলোচিত হয় সেগুলোর ব্যাপারেও সরকার কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। অষ্ট সংসদে ছয়টি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি কোনো প্রতিবেদন সংসদে জমা দেয়নি, যেখানে ৩০টি কমিটি মাত্র একটি করে প্রতিবেদন সংসদে জমা দেয়। এছাড়া যেসব কমিটি প্রতিবেদন জমা দেয় তাদের ৭৭% সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার মাসে প্রতিবেদন জমা দেয়। সংসদ কর্তৃক কোনো কমিটিতে প্রেরিত যেকোনো বিল বা বিষয় পরীক্ষা করা, উক্ত কমিটির আওতাধীন মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী পর্যালোচনা করা, মন্ত্রণালয়ের কার্যকলাপ বা অনিয়ম ও গুরুতর অভিযোগ তদন্ত করা এবং কমিটি যথোপযুক্ত মনে করলে উক্ত কমিটির আওতাধীন যেকোনো বিষয় সম্পর্কে পরীক্ষা করা ও সুপারিশ করা এসব স্থায়ী কমিটির কাজ। কার্যকর কোনো পদক্ষেপ না নিতে পারার পেছনে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব, কমিটি গঠনে কালক্ষেপণ, সরকারি দল থেকে কমিটির সভাপতি নির্বাচন, কমিটির প্রতিবেদন যথাসময়ে জমা না দেওয়া ও সংসদে এ নিয়ে আলোচনা না হওয়া, এবং কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের ক্ষমতা না থাকা উল্লেখযোগ্য। তাই সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কমিটির কমপক্ষে ৫০ শতাংশ সভাপতির পদ বিরোধী দল থেকে আসা উচিত বলে অনেক মুখ্য তথ্যদাতা মনে করেন। এতে সরকারের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার ক্ষেত্র তৈরি হবে।

৫.৬ সংসদ সদস্যদের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা

সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংসদীয় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করছে। এ আইনের ফলে একজন সংসদ সদস্য স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারেন না। জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসা একজন জনপ্রতিনিধি জনগণের জন্য সঠিক কথাটি বলার সুযোগ হারাচ্ছেন। তাই এ অনুচ্ছেদের সচেতনভাবে সংশোধনী প্রয়োজন। দলের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব, বাজেট, গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন (সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে), এবং দলের মূল আদর্শের পরিপন্থী অন্যান্য যেকোন বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে সংসদ সদস্যদের কথা বলার অধিকার থাকা উচিত বলে উল্লেখ করেন।

৫.৭ ওয়াকআউট ও সংসদ বর্জন

ওয়াকআউট সংসদীয় গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির একটি অংশ কিন্তু লাগাতার সংসদ বর্জন সংসদীয় গণতান্ত্রিক রীতির অন্তরায়। প্রধান বিরোধী দলের সংসদ বর্জনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় অষ্টম সংসদের অধিবেশন। নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ এনে প্রধান বিরোধী দল সংসদ বর্জন করেন। অষ্টম জাতীয় সংসদের মোট কার্যদিবসের প্রায় ৬০% কার্যদিবস প্রধান বিরোধী দল সংসদ বর্জন করেন। পঞ্চম ও সপ্তম সংসদে যথাক্রমে প্রায় ৩৪% ও ৪৩% কার্যদিবস প্রধান বিরোধী দল সংসদ বর্জন করেন। পঞ্চম, সপ্তম ও অষ্টম জাতীয় সংসদে বিরোধী দলগুলো যথাক্রমে ৬০ বার, ৬২ বার ও ৯৫ বার ওয়াকআউট করেন।

জনগণ মনে করেন সংসদে রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে স্বল্প সময়ের জন্য সাময়িক ওয়াকআউট হতে পারে কিন্তু সংসদ বর্জন

গ্রহণযোগ্য নয়। রাজনৈতিক দলগুলোকে সংসদ বর্জনের সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসতে হবে। সংসদকে বিরোধী দলের কাছের আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। সরকারি দলের উচিত হবে বিরোধী দলের মতের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আলোচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া।

৫.৮ সংসদীয় বিষয়ে সংসদের বাইরে প্রতিবাদ

জরিপে অংশগ্রহণকারী ৭৫% উত্তরদাতা সংসদীয় বিষয়ে সংসদের বাইরে প্রতিবাদ করা উচিত নয় বলে মত দেন। হরতালের রাজনীতি থেকে বের হয়ে আসার পক্ষে মত দেন অধিকাংশ জনগণ। বাংলাদেশের জনগণ মনে করে, হরতাল ও অবরোধ যদি অন্যের জানমালের ক্ষতিসাধন করে তবে সে রকম হরতাল বা অবরোধ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হতে পারে না। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের প্রায় ৮৫% জনগণ আইন করে হরতাল, অবরোধ বন্ধ করার পক্ষে মত দিলেও মুখ্য তথ্যদাতা, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা ও কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী জনগণ মনে করেন আইন করে হরতাল বা অবরোধ বন্ধ করা উচিত নয়। গণতন্ত্রের স্বার্থে এমন কোন আচরণ করা উচিত না যা গণতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর। আমাদের দেশে যে ধরনের হরতাল, অবরোধ পালন করা হয় তা একটি ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়া। এ থেকে বেরিয়ে আসার জোর দাবী আসে। রাজনৈতিক দল বা অন্য যেকোন সংগঠন হরতাল ডাকতে পারেন তবে কাউকে হরতাল মানতে বাধ্য করা যাবে না বা অন্যের সম্পদের ক্ষতি সাধন করা যাবে না। সংসদের বাইরে প্রতিবাদ হিসেবে সংবাদ সম্মেলন, মিটিং ও নির্দিষ্ট স্থানে গণজমায়েত করার পক্ষে মত দেন অধিকাংশ জনগণ।

৫.৯ আইন প্রণয়ন বা সংস্কার করার আগে জনগণকে সম্পৃক্ত করার প্রয়োজনীয়তা

সংসদে একটি আইন পাশ করতে দীর্ঘ সময় এবং প্রক্রিয়া অতিক্রম করতে হয়। জনগণের ভোটে নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণ যখন আইন প্রণয়নে বা সংশোধনে অংশগ্রহণ করেন তখন পরোক্ষভাবে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়। তবে সংবিধানের সংশোধন ও জনগুরুত্বপূর্ণ আইনের জনগণের প্রত্যক্ষ মতামত নেবারও প্রয়োজন রয়েছে। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের প্রায় ৯৫% আইন প্রণয়নের পূর্বে জনগণের অংশগ্রহণ প্রয়োজন বলে মত দেন। খসড়া আইন জনমতামত নেওয়ার জন্য ওয়েবসাইটে, খবরের কাগজে প্রকাশ করা এবং বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের কাছ থেকে পরামর্শের ভিত্তিতে আইন চূড়ান্ত করতে হবে। কিন্তু অষ্টম সংসদে কোন আইন প্রণয়নেই জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ছিল না। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার কয়েকটি আইন প্রণয়নে জনগণের মতামত নেন। উদাহরণস্বরূপ, তথ্য অধিকার আইন ও ক্রয় সংক্রান্ত আইন উল্লেখযোগ্য।

৫.১০ সংসদে নারী সদস্যের নির্বাচন প্রক্রিয়া

বাংলাদেশ সংসদে নারীদের জন্য ৪৫টি আসন সংরক্ষিত আছে যা সংসদে প্রতিনিধিত্বশীল দল আনুপাতিক হারে মনোনয়ন দেয়। কিন্তু এই প্রক্রিয়াটিকে সমর্থন করেন মাত্র ১৮.৩% উত্তরদাতা। তাদের প্রায় ৫৪% বলেন, সংরক্ষিত আসনে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নারী সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়া দরকার। বিশিষ্ট নারী প্রতিনিধি সহ অন্যান্য মুখ্য তথ্যদাতারাও নারীদের সংরক্ষিত আসনে মনোনীত করার প্রক্রিয়াটিকে নারীদের জন্য অবমাননাকর বলে অভিহীত করছেন। রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক দলগুলোকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে মনোনয়ন দেওয়ার সময় শতকরা ২০-৩০% আসনে নারী সদস্য মনোনয়ন দিবেন - যা সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নারীদের আসতে সহযোগিতা করবে। এছাড়া রাজনৈতিক দলগুলো তাদের সব পর্যায়ের কমিটিতে নারীদের জন্য ৩৩ শতাংশ পদ বরাদ্দ রাখবেন।

৫.১১ সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব

আমাদের দেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘূ, আদিবাসী, ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী মোট জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ। তাই সংসদে তাদের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব ও সমস্যার সমাধানে কার্যকর ব্যবস্থা থাকা উচিত বলে মতামত এসেছে। মুখ্য তথ্যদাতারা এই সকল জনগোষ্ঠীর জন্য পৃথক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি বা সংসদীয় ককাস তৈরি করা যেতে পারে বলে মতামত ব্যক্ত করেন। এই ককাস সংসদে আইন প্রণয়ন করার পূর্বে এই সকল জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণ করা হয়েছে কিনা তা বিবেচনা করবে।

৬. সংসদীয় গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে রাজনৈতিক দল। তাই সংসদীয় গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অপরিসীম। রাজনৈতিক দল অবশ্যম্ভাবী এবং সকল স্বাধীন, বৃহৎ রাষ্ট্রেই এর অস্তিত্ব রয়েছে। বাংলাদেশের সংসদে প্রতিনিধিত্ব করার ওপর ভিত্তি করে বৃহৎ কয়েকটি দল বাছাই করলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), জামায়াতে ইসলামী এবং জাতীয় পার্টির নাম আসে।

৬.১ রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্র ও বাস্তবতা

ক. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: বাংলাদেশের প্রধান চারটি রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আওয়ামী লীগ, বিএনপি এবং জাতীয় পার্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে। এ দলগুলো জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও অর্থনৈতিক মুক্তির প্রতি জোর দিয়েছে। তবে জাতীয় পার্টির ইসলামী আদর্শ এবং জামায়াতে ইসলামীর আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল প্রদর্শিত দ্বীন (ইসলামী জীবন বিধান) কায়েমের কথা বলা হয়েছে। জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব উল্লেখ করা হয়নি।

খ. কর্তৃত্ব: বিএনপি এবং জাতীয় পার্টির পরিচালনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ণ কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা রয়েছে দলের প্রধানের ওপর। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলী এবং জামায়াতে ইসলামীর ক্ষেত্রে মজলিসে শূরার ওপর পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। বিএনপি, জাতীয় পার্টি এবং জামায়াতে ইসলামীতে পার্টি প্রধানের অপসারণ ব্যবস্থার উল্লেখ রয়েছে, যা আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রে অনুপস্থিত।

গ. কমিটি ব্যবস্থা: দলগুলোর কমিটি ব্যবস্থা জাতীয় পর্যায় থেকে একেবারে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত।

ঘ. জাতীয় কাউন্সিল: দলগুলোর প্রধান নেতৃত্ব জাতীয় কাউন্সিল এবং জামায়াতে ইসলামীর ক্ষেত্রে *রুকন* সম্মেলনের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হয়। আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির গঠনতন্ত্রে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর পর জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে। জামায়াতে ইসলামীর *রুকন* সম্মেলন প্রয়োজন মোতাবেক আহ্বানের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বিএনপির জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের নির্দিষ্ট কোন সময়সীমা বেঁধে দেওয়া নেই।

ঙ. নির্বাচনে প্রার্থী বাছাই: জামায়াতে ইসলামী জাতীয় পর্যায়ের যে কোন নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ে মজলিসে শূরা কর্তৃক মনোনীত নির্বাচন কমিশন গঠন করে। অন্য তিনটি বৃহৎ দলে সংসদীয় বোর্ড গঠনের কথা বলা হয়েছে, যার সভাপতি হিসেবে দলের প্রধানকে রাখা হয়েছে এবং বোর্ডের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয়েছে।

চ. দলীয় তহবিল: প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের নিজস্ব তহবিল গঠনের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিটি দলের গঠনতন্ত্রে তহবিলের হিসাব অডিট করার মাধ্যমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা রয়েছে।

দলগুলোর গঠনতন্ত্রে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ, নেতৃত্ব সৃষ্টি, কমিটি ব্যবস্থা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সদস্যপদ প্রাপ্তি, তহবিল সংগ্রহ ও নিরীক্ষা প্রতিটি ক্ষেত্রেই গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি ও মূল্যবোধের কথা বলা হলেও বাস্তবে তার প্রতিফলন খুব সামান্য দেখা যায়। তাছাড়া দলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের একক ক্ষমতা দলের প্রধানের হাতে থাকার অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থাও প্রধান তিনটি দলের গঠনতন্ত্রে রয়েছে। অধিকাংশ দল তাদের সদস্যপদের রেকর্ড সংরক্ষণ করে না। এমনকি তারা নিয়মিতভাবে দলীয় সম্মেলন করে না। যদিও বা করে, কোন দলের নির্বাহী কমিটি ঘোষণা করা বিরল ঘটনা। অধিকাংশ দলই তাদের সভাপতি/প্রেসিডেন্টকে পুনরায় নির্বাচিত করে এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের মনোনীত করার কর্তৃত্ব দেয়। অধিকাংশ দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটির সদস্য মনোনীত করার ক্ষমতা নিজেদের হাতেই রাখে। প্রতিটি দলের শীর্ষ পর্যায়ের নেতারা সংসদীয় বোর্ডের সদস্যদের বাছাই করে, এরাই পরবর্তীতে সংসদীয় নির্বাচনের জন্য প্রার্থীদের মনোনয়ন দেয়।

৬.২ রাজনৈতিক দলের নিকট প্রত্যাশিত রাজনৈতিক সংস্কৃতি

দলগুলোর আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রে যে সংকট দেখা দিয়েছে তা প্রতিফলিত হয়েছে জরিপের উত্তরদাতাদের মধ্যেও। দলগুলোর মধ্যে সুস্থ গণতন্ত্রের চর্চা হয় না বলেই উত্তরদাতারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় দলের নেতা-নেত্রী নির্বাচন (৭৮.৯%), দলগুলোর আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ (৬৫.৭%), দলগুলোর গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নিয়মিত সভা করা (৫৯.৬%), অন্য দলের প্রতি সহনশীল আচরণ করা (৫৩%), ব্যক্তিগতভাবে পার্টির কোনো ভুল সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করার স্বাধীনতা থাকা (৫২.৭%), নির্বাচন কমিশনের সাথে দলের নিবন্ধন করা (৪৯.৫%), এবং দলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত করার (৩৯.৩%) পক্ষে মত ব্যক্ত করেন।

৬.২.১ রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ (সংশোধিত ২০০৮) অনুসারে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নির্বাচন কমিশনের সাথে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের সমর্থন নিয়ে জনগণের জন্য কাজ করছে। তাই তারা শুধুমাত্র জনগণের কাছে জবাবদিহি করবে। এই অজুহাতে নির্বাচন কমিশনের সাথে তারা নিবন্ধিত হয়নি। এছাড়া প্রতিটি রাজনৈতিক সরকারের সময় বিরোধী দলগুলো নির্বাচন কমিশনের দলীয় ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং তাদের সাথে নিবন্ধনের বিষয়টি পরিহার করেছেন। সম্প্রতি রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থানে কিছুটা পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের শক্ত অবস্থান এবং বৃহৎ দুটি দলের সাথে সমঝোতামূলক সংলাপের ফলে এই উদ্যোগ কিছুটা এগিয়েছে। জরিপের ফলে দেখা যাচ্ছে, ৪৯.৫% উত্তরদাতা রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচন কমিশনের সাথে নিবন্ধন করা উচিত বলে মত দিয়েছেন।

৬.২.২ রাজনীতিতে 'পরিবারতন্ত্র': বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোতে অনেকেই পারিবারিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় রাজনীতিতে এসেছেন। অনেকেই দলের গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন যাঁরা বর্ষীয়ান নেতার স্ত্রী, ভাই, সন্তান বা কন্যা। রাজনৈতিক পরিবার থেকে আসার বিষয়টিকে ইতিবাচক হিসেবে দেখা হয় যখন প্রকৃত রাজনীতিবিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জনগণের পাশে থেকে কোন নেতৃত্ব উঠে আসে। তবে আমাদের দেশের রাজনীতিতে পরিবারতন্ত্রের প্রভাব দেখিয়ে এবং ক্ষমতার অপপ্রয়োগের মাধ্যমে অনেক প্রতিশ্রুতিশীল কর্মীকে বঞ্চিত করে দলীয় পদ দেওয়া হয়। এ সকল পারিবারিক বন্ধনের ওপর ভিত্তি করে দলীয় সদস্যপদ প্রদানকে জনগণও সমর্থন করেন না। তাইতো জরিপের ফলাফলে দেখা যায় প্রায় ৮২% উত্তরদাতা রাজনৈতিক পদে অধিষ্ঠানের জন্য শীর্ষ নেতৃত্বের সাথে পারিবারিক সম্পর্ক থাকাকে সমর্থন করেননি।

৬.২.৩ রাজনৈতিক দলের স্বচ্ছতা: রাজনৈতিক দলের মধ্যে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেলে তাদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে। আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলো কারো কাছে জবাবদিহি করতে চায় না বলেই তাদের বিভিন্ন কর্মকান্ডে বিশেষ গোপনীয়তা লক্ষ্য করা যায়। জরিপে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, উত্তরদাতাদের প্রায় ৭৬% দলগুলোর তহবিল সংগ্রহের উৎস জানতে চায়, ৭৩.৩% দলীয় আয় ব্যয়ের হিসাব পেতে চায়, ৬৫.৪% দলীয় নির্বাচনী ব্যয় জনগণের সম্মুখে প্রকাশিত হতে দেখতে চায়। এছাড়া সদস্যদের চাঁদার হারের পরিমাণ (৩৬.৪%), দলীয় মনোনয়ন পেতে প্রকৃত চাঁদার পরিমাণ (২৮.৪%) এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন (২২.১%) জনগণ জানতে চায়।

৬.২.৪ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন প্রাপ্তি: প্রতিটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রেই কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত কমিটি ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর মাধ্যমে সকল স্তরের জনগণ রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হতে পারে এবং একজন সাধারণ কর্মীর পর্যায়ক্রমে জাতীয় পর্যায়ের নেতা হওয়ার সুযোগ থাকে। বাস্তবে গত তিনটি সংসদীয় নির্বাচনে অনেকগুলো আসনের মনোনয়ন প্রদানের পেছনে অর্থের প্রভাব বা দৌরাত্ম্য রয়েছে বলে। এ বাস্তবতার প্রেক্ষিতে সাধারণ জনগণ নির্বাচনে মনোনয়ন দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের প্রধান বিবেচ্য বিষয়গুলো তুলে ধরেন। জরিপে দেখা যায়, রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রদত্ত মনোনয়নের সময় প্রার্থীর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা (৭৪.৩%), জনকল্যাণে অবদান (৮৫.৯%), স্থানীয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ততা (৬৪.৮%), সততা (৯৭.৫%), এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা (৯১.০%) অবশ্যই থাকা উচিত বলে মনে করেন। এখান থেকে বোঝা যায়, সাধারণ জনগণ প্রকৃতই একজন রাজনীতিককে সংসদে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে দেখতে চায়।

৬.২.৫ নির্বাচনী প্রচারণা: আইন অনুযায়ী তফসিল ঘোষণার পরে প্রার্থীদের মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পরেই একজন প্রার্থী হিসেবে গণ্য হতে পারেন এবং নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করতে পারেন। কিন্তু দেখা যায় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণারও বহু আগে থেকে প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচারণায় নেমে যান। এই সময়ে প্রার্থীরা প্রচারণার মাধ্যম হিসেবে পোস্টার, দেওয়াল লিখন, ব্যাপক জনসংযোগ, জনসভা, মিছিল, র‍্যালি, মোটর সাইকেল শোভাযাত্রা প্রভৃতির মাধ্যমে দল থেকে মনোনয়ন পাওয়ার জন্যও এ ধরনের কার্যক্রম শুরু করেন। রাজনৈতিক দলগুলো একদিকে যেমন নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করে অন্যদিকে নির্বাচন কমিশন একটি দুর্বল প্রতিষ্ঠান হিসেবে আইন লঙ্ঘন জনিত আচরণের জন্য প্রার্থী বা রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়। রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচারণায় ধারাবাহিকভাবে নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন করে জনগণকে প্রভাবিত করে চলেছে। কালো টাকা ও পেশীশক্তির প্রভাব বৃদ্ধির কারণে নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয় না। এ প্রেক্ষাপটে জরিপের উত্তরদাতাদের অধিকাংশই নির্বাচনী প্রচারণার ধরন পরিবর্তনের পক্ষে মত দেন। প্রায় ৫৬% উত্তরদাতা বলেন নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে নির্বাচনী প্রচারণা হওয়া উচিত।

৭. সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণ বিধি

সংসদ সদস্যগণ দেশের আইন প্রণয়নকারী সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি। তাই জনগণ আশা করে তাঁরা নিজেদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে সর্বোচ্চ পর্যায়ের নৈতিকতা প্রদর্শন করবেন এবং জনগণের কাছে রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত হবেন। বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশে সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণ বিধি থাকলেও বাংলাদেশে তা অনুপস্থিত। এই অবস্থা থেকে উত্তরণে সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণ বিধি প্রণয়নের আবশ্যকতা রয়েছে। আমাদের দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যগণের জন্য আচরণ বিধি একটি নতুন ধারণা হওয়া সত্ত্বেও এ সম্পর্কে জনমত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৭.১ সংসদ সদস্যদের আচরণ বিধি: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

বিগত সংসদগুলোতে সংসদ সদস্য কর্তৃক দলীয় নেতাদের তোষামদী, অগঠনমূলক সমালোচনা, অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা, ওয়াক আউট, বয়কট, বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি ইত্যাদি আচরণ সংসদের কার্যকারিতার পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং সংসদের বাইরে সংসদ সদস্যদের দুর্নীতি, অনিয়ম, চাঁদাবাজি, ভূমি দখল, কর ফাঁকি, বিল ও ঋণ খেলাপী ইত্যাদি আচরণ তাঁদের ভাবমূর্তি নষ্ট করে। তাই জনগণ মনে করেন, সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণ বিধি অবশ্যই থাকা দরকার। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের নাগরিক তথা ভোটারদের কাছে সংসদ সদস্যদের অধিক হারে জবাবদিহি করে তোলা যায়। বাংলাদেশের জনগণ আশা করেন, পরবর্তী নির্বাচিত সরকার সংসদ সদস্যদের জন্য পূর্ণাঙ্গ আচরণ বিধি প্রণয়নে সচেষ্ট হবে এবং তাতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ উল্লেখ থাকতে পারে:

১. সাধারণ বিষয়সমূহ, যেমন স্থানীয় সরকারের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের অযাচিত হস্তক্ষেপ, সরকারি বা সেরকারি প্রশাসনে হস্তক্ষেপ রোধ, নৃত্যশালা কিংবা জুয়ার আড্ডায় গমন না করা সংক্রান্ত ইত্যাদি।
২. সংসদ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ, যেমন সংসদে প্রবেশ এবং ত্যাগকালীন সময়ে করণীয়, পোশাক পরিচ্ছদ, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার ইত্যাদি।
৩. স্বার্থসংশ্লিষ্ট অর্থাৎ অর্থ সম্পদ সংক্রান্ত, যেমন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উৎস থেকে অর্জিত সম্পদ, আয়-ব্যয়ের উৎস, খানার অন্য সদস্যদের যাবতীয় সম্পদ এবং দেনার হিসাব প্রকাশ নিয়মিত প্রকাশ, মিথ্যা তথ্য প্রদানে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ইত্যাদি।
৪. উপহার বা আর্থিক সুবিধা সংক্রান্ত, যেমন দেশের অভ্যন্তরে কিংবা বাইরে অন্য কারও কাছ থেকে উপহার বা আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা বা না করা ইত্যাদি।

৫. সংসদের মর্যাদা ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত, যেমন সংসদের সীমানার মধ্যে অনশন কিংবা অন্য কোন উপায়ে প্রতিবাদ করা, সংসদকে অভয়াশ্রম কিংবা প্রতিরক্ষার স্থান হিসেবে ব্যবহার ইত্যাদি।
৬. আতিথেয়তা বিষয়ক, যেমন দাপ্তরিক উদ্দেশ্য ব্যতীত কোন কূটনৈতিক দূতাবাস বা বিদেশী কোন মিশন কিংবা কোন বিদেশী সংস্থার বা ব্যবসায়ীর আতিথেয়তা গ্রহণ করা বা না করা ইত্যাদি।
৭. বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত, যেমন বিদেশী সরকার কিংবা সংস্থার কিংবা প্রতিষ্ঠানের কিংবা এরূপ কোন এজেন্সি প্রদত্ত আমন্ত্রণে যোগদান ও করণীয় শিষ্টাচার বিষয়ক নিয়ম-কানুন ইত্যাদি।
৮. বিচার কার্য পরিচালনা, যেমন সংসদ সদস্য থাকাকালীন সময়ে দেওয়ানী, ফৌজদারী বা অন্য যেকোন আইনে বিচারকার্য পরিচালনা ইত্যাদি।
৯. নৈতিক বা চারিত্রিক স্খলন জনিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ।
১০. আচরণ বিধির লঙ্ঘন এবং এ প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় আইনী ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কিত।

৮. সুপারিশমালা

বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র খুব বেশি দিন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। স্বাধীনতা অর্জনের পর সুদীর্ঘ সময় সামরিক শাসন ব্যবস্থায় গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়নি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে সংসদীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। সংসদীয় গণতান্ত্রিক ধারাকে সমুন্নত রাখতে চালকের ভূমিকা পালন করেন সংসদ সদস্যগণ। তাই সংসদ সদস্যদের কাছে জনগণের প্রত্যাশা বাস্তবায়ন করতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ কয়েকটি সুপারিশ করছে।

৮.১ তথ্য অধিকার

১. নির্বাচনের পূর্বে প্রার্থীদের ব্যক্তিগত আটটি তথ্য নির্বাচন কমিশনে জমাদান সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায়টি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
২. নির্বাচন কমিশন প্রার্থীদের ব্যক্তিগত তথ্যাদি যাচাই বাছাই করে তা জনগণের মাঝে প্রচার করবে। তবে কোনো ভুল তথ্য পাওয়া গেলে প্রার্থীর মনোনয়ন পত্র বাতিল করার ক্ষমতাও নির্বাচন কমিশনের থাকবে।
৩. সংসদ সদস্যরা প্রতি বছর তাঁদের আর্থিক স্বার্থ সংক্রান্ত ও ব্যক্তিগত তথ্যাদি নির্বাচন কমিশনে জমা দিবে। নির্বাচন কমিশন তা ওয়েব সাইটে বা বুকলেট আকারে জনগণের জন্য উন্মুক্ত করবে।
৪. সংসদ সদস্যদের সংসদে কার্যক্রমের বার্ষিক মূল্যায়ন প্রকাশ করতে হবে। এই কার্যক্রমের মধ্যে থাকবে তাদের উপস্থিতি, সংসদে অংশগ্রহণের ধরন, কমিটিতে অংশগ্রহণ, আইন প্রণয়নে ভূমিকা ইত্যাদি।
৫. সংসদ অধিবেশনে সকল সরকারি ও বেসরকারি গণমাধ্যমের প্রবেশাধিকার দিতে হবে।
৬. সংসদ অধিবেশন ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যবিবরণী লিখিত আকারে থাকতে হবে এবং তা জনগণের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে। তবে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে আলোচিত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাজনিত তথ্যাদি গোপনীয় তথ্য হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে।
৭. রাজনৈতিক দল প্রতি বছর তাদের আয়-ব্যয়ের হিসাব, তহবিলের উৎস এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশ করবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ এ সকল তথ্য যাচাই বাছাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
৮. রাজনৈতিক দল তাদের নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যয়কৃত অর্থের উৎস ও ব্যয়ের খাত জনগণের সামনে প্রকাশ করবে। এ সম্পর্কে ভুল বা অতিরঞ্জিত তথ্য প্রকাশ করলে নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
৯. সংসদ সদস্যদের পারিতোষিক ও ভাতাদি সম্পর্কে জনগণকে বিস্তারিতভাবে অবগত করতে হবে। তাঁদের সামাজিক মর্যাদা ও জীবনযাত্রার মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রেখে পারিতোষিক ও ভাতাদি পাবেন। এক্ষেত্রে এমন কোন সুযোগ তাঁদের দেওয়া হবে না যার মাধ্যমে তার অপব্যবহার বা সরকারি অর্থের অপচয় হয়।

৮.২ সংসদ সদস্যর ভূমিকা

১০. সংসদ সদস্যরা নিজেদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবেন এবং জনগণকেও অবহিত করবেন।
১১. জাতীয় নির্বাচনের প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচারণায় স্থানীয় সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের বিষয়াদি নিয়ে কোন প্রকার প্রতিশ্রুতি দিতে পারবেন না।
১২. সংসদ সদস্যরা আইন প্রণেতা ও নীতি নির্ধারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং স্থানীয় সরকারের উন্নয়নমূলক কাজে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করবেন না।
১৩. উপজেলা পরিষদ নির্বাচন করতে হবে এবং স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
১৪. সংসদ সদস্যদের একটি আচরণ-বিধি (কোড অব কনডাক্ট) প্রণয়ন করতে হবে এবং সঠিক ভাবে পালিত হচ্ছে কিনা তা সংসদীয় নৈতিকতা কমিটি তত্ত্বাবধান করবে।
১৫. সংসদে নৈতিকতার ওপর একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করতে হবে। এর দায়িত্ব হবে আচরণ বিধি লঙ্ঘন সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ করা, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত পরিচালনা করা এবং তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য স্পিকারকে পরামর্শ বা সুপারিশ প্রদান করা।
১৬. সংসদ সদস্যরা রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ বা শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণ ছাড়া সংসদের অনুমতি না নিয়ে অনুপস্থিত থাকা

উচিত নয়। এ ক্ষেত্রে সংবিধানের ৬৭ (১) (খ) অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে, এবং সময়সীমা কমাতে হবে।

১৭. বছরভিত্তিক সর্বোচ্চ উপস্থিতির জন্য সংসদ সদস্যদের পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যদিকে, সংসদের অনুমতি না নিয়ে কোন বৈঠক দিবস অনুপস্থিত থাকলে সেই সকল দিনের জন্য সংসদ সদস্যর পারিশ্রমিক ও ভাতা আনুপাতিকভাবে কর্তন করতে হবে।

১৮. সংসদে গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা, আত্মসমালোচনা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সচেতনভাবে সংশোধন করতে হবে। এক্ষেত্রে দলের বিরুদ্ধে অনাস্থা ভোট প্রদান ও বাজেট সংক্রান্ত বিলের বিরোধিতা না করার বিষয়টি থাকা উচিত।

১৯. প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যর জনগণের সাথে যোগাযোগের জন্য একটি ব্যবস্থা থাকতে হবে। সংসদ অধিবেশন না চললে বা রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ না থাকলে তিনি স্থানীয় জনগণের সাথে যোগাযোগ রাখবেন।

২০. রাজনৈতিক দলের ইশতেহার বাস্তবায়নে সংসদ সদস্যদের সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হবে। তাঁরা বাৎসরিক ভিত্তিতে নিজ নিজ কাজের সাফল্য ও ব্যর্থতা এবং পেছনের কারণ জনসম্মুখে তুলে ধরবেন।

২১. সংসদ সদস্যদের মেয়াদের মাঝামাঝি সময়ে কাজ, দক্ষতা, সংসদে উপস্থিতি, জন-সম্পৃক্ততা, প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে উদ্যোগ ইত্যাদির ভিত্তিতে তাঁদের মূল্যায়ন করতে হবে। কোন সংসদ সদস্য জনগণের রায়ে ব্যর্থ হলে সে সংসদীয় আসনে পুনরায় নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮.৩ কার্যকর সংসদ

২২. সরকারি ও বিরোধী দলের নেতাকে সংসদে নিয়মিত উপস্থিত থাকা নিশ্চিত করতে হবে।

২৩. সংসদের কার্যদিবস ও কার্যসময় বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে সংসদীয় অধিবেশন বিকেলের পরিবর্তে সকালে করতে হবে।

২৪. কোন সংসদ সদস্য স্পিকার হিসেবে নির্বাচিত হবার পর দলীয় পদ থেকে পদত্যাগ করবেন এবং পরবর্তী নির্বাচনে তাঁর সংসদীয় আসনে অন্য কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে না।

২৫. সংসদের ডেপুটি স্পিকারের পদটি বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের মধ্যে থেকে আসতে হবে।

২৬. সরকারি হিসাব সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি সহ গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী কমিটিগুলোর মধ্য থেকে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ কমিটিতে বিরোধী দলের মধ্য থেকে সভাপতি নির্বাচন করতে হবে।

২৭. জনগণ সংসদ বর্জনের রাজনীতি দেখতে চায় না। তাই লাগাতার সংসদ বয়কট বন্ধ করতে হবে।

২৮. সংবিধানের সংশোধন ও জন-গুরুত্বপূর্ণ কোনো আইন প্রণয়নের পূর্বে সেসকল আইনের খসড়ার ওপর সভা, গণভোট, এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনগণের মতামত নিতে হবে।

২৯. সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রতিবাদের ভাষা হল হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ। কিন্তু জান-মালের ক্ষতি করে এগুলো পালন করা যাবে না।

৩০. নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩১. ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠী, আদিবাসী এবং প্রতিবন্ধীদের বিষয়সমূহ যথার্থভাবে মূল্যায়ন করতে সংসদে এ সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি প্যালেন তৈরি করতে হবে। যাঁরা সংসদে প্রণীত আইনে এই সুবিধা-বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষিত হচ্ছে কিনা তা যাচাই করে দেখবেন।

৮.৪ সংসদীয় গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

৩২. প্রতিটি দল তাঁদের কমিটির সদস্য হিসেবে এবং নির্বাচনে মনোনয়ন দেওয়ার সময় ৩৩ শতাংশ নারীকে নির্বাচিত করবেন।

৩৩. রাজনৈতিক দলগুলো ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, আদিবাসী এবং প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংরক্ষণে দলের কমিটি ব্যবস্থায় পদ তৈরি করবে।

৩৪. রাজনৈতিক দল নির্বাচন কমিশনের সাথে নিবন্ধিত হবে এবং নিবন্ধনের শর্তাদি মেনে চলবে।

৩৫. প্রতিটি দল নিজেদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পরিচালিত হবে। এক্ষেত্রে তৃণমূল পর্যায় থেকে রাজনীতির অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নেতৃত্ব তৈরি করতে হবে।

৩৬. দলের মধ্যে মতাদর্শগত বিরোধ থাকলেও জাতীয়, জনগণ ও গণতন্ত্রের স্বার্থে দলগুলোর মধ্যে সহনশীলতা, পারস্পরিক সম্মানবোধ এবং পরমত সহিষ্ণুতা গড়ে তুলতে হবে।

৩৭. স্থানীয় সরকারের নির্বাচনকে দলীয় নির্বাচনের বাইরে রাখতে রাজনৈতিক দলগুলো সক্রিয় উদ্যোগ নিবে।

৩৮. সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি তৈরি করতে রাজনৈতিক দলকে সৎ, জনগণ-সম্পৃক্ত, জনকল্যাণে নিয়োজিত, অসাম্প্রদায়িক, রাজনীতির অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন ব্যক্তিকে জাতীয় নির্বাচনের প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করা উচিত। অন্যদিকে বিল-ঋণখেলাপী, সন্ত্রাসী, কালো টাকার মালিক, যুদ্ধাপরাধীদের নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন দেওয়া হতে তাদের বিরত থাকতে হবে।

৩৯. রাজনৈতিক দলগুলো সংসদকে কার্যকর করতে এবং সংসদ সদস্যদের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে দলীয় ভাবে সক্রিয় ভূমিকা রাখবে। এছাড়া দেশের সাংবিধানিক ও জাতীয় সততা ব্যবস্থার অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানসমূহের যেমন, নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, সরকারি কর্ম কমিশন, বিচার বিভাগ, আইন কমিশন, পুলিশ বিভাগ স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রেখে তাদের শক্তিশালী করণে ভূমিকা রাখবে। এর মাধ্যমে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা পাবে। ফলে সংসদ সদস্যদের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বাড়বে।

অধ্যায় এক

ভূমিকা

১.১ গবেষণার পটভূমি ও যৌক্তিকতা

সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পনের বছরের মধ্যেই বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ (এরপর থেকে 'সংসদ' হিসেবে উল্লিখিত) জাতীয় সততা ব্যবস্থার একটি প্রধান প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর কার্যকারিতা নিয়ে ব্যাপক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। বিভিন্ন কারণে আমাদের জাতীয় সংসদ অকার্যকর হয়ে পড়েছে, যার মধ্যে রয়েছে কোরাম সংকট, বিরোধী দলের সংসদ বর্জন, সরকারি দলের সদস্যদের সংসদে আসার প্রতি অনীহা, কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণে আগ্রহের অভাব, বেশিরভাগ মন্ত্রীদের সংসদে অনুপস্থিতি, এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা না হওয়া। এর পাশাপাশি সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর অনিয়মিত বৈঠকও সর্বশেষ (অষ্টম) সংসদের কার্যকর না হওয়ার অন্যতম কারণ।[১]

গত কয়েকটি সংসদ বিশেষ করে গত সপ্তম ও অষ্টম সংসদের সদস্যদের বিভিন্ন আইন-বহির্ভূত কর্মকান্ড ও অনিয়মের জন্য তাঁদের নিজেদের ভাবমূর্তিই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। এসব অনিয়ম ও আইন-বহির্ভূত কর্মকান্ডের মধ্যে ছিল প্রশাসনিক কার্যক্রমে প্রভাব সৃষ্টি, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি হিসেবে অনিয়ম ও দুর্নীতি, স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্প অনুমোদন ও তদারকিতে প্রভাব সৃষ্টি ও দুর্নীতি, স্থানীয় পর্যায়ে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজি, খুনের হুমকি, স্থানীয় পর্যায়ে ত্রাণ কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতি, সরকারি ও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমি ও সম্পত্তি দখল, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরোধিতা ইত্যাদি। এসবের বাইরে স্বজনপ্রীতি, বিল ও ঋণ খেলাপ, অবৈধ কার্যক্রমের মাধ্যমে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধি, সংসদ সদস্য হিসেবে প্রাপ্ত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার অপব্যবহার, এবং তাঁদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের ক্ষমতার দাপট দেখানোর অভিযোগও ওঠে। এসবের মূলে রয়েছে সংসদ সদস্যদের একচ্ছত্র ক্ষমতার অপব্যবহার।

"বিজয়ীরাই সবকিছু ভোগ করবে" – এই মানসিকতার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত ধ্বংসাত্মক রাজনীতি ধারাবাহিক সংসদ বর্জনের সংস্কৃতিকে একটি নিয়মিত ঘটনায় রূপান্তরিত করেছে। এমনকি যখন সংসদের অধিবেশনগুলো বর্জন করা হয়নি তখনও সংসদ সদস্যরা সংসদে নিয়মিত অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে উদাসীন ছিলেন। সংসদে অনুপস্থিতি ও দেরিতে আসার প্রবণতা এতই প্রবল ছিল যে অষ্টম সংসদে পাঁচটি বিল প্রয়োজনীয় কোরাম ছাড়াই উত্থাপিত ও অনুমোদিত হয়।[২] সংসদের স্থায়ী কমিটিগুলো তাঁদের তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা পালন করতেও ব্যর্থ হয়। মোট কথা, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিতর্কের একটি ফোরাম হিসেবে, আইন প্রণয়নকারী সংস্থা হিসেবে, এবং স্থায়ী কমিটির কার্যকর ভূমিকা পালনের মাধ্যমে জনগণের কাছে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে এই সংসদের কার্যক্রম ও এর কাছে মানুষের প্রত্যাশার মধ্যে ছিল বিস্তর পার্থক্য।

রাজনীতি একটি লাভজনক বিনিয়োগে পরিণত হয়েছে, যা সুশাসনের অবক্ষয় ও ব্যাপক দুর্নীতির পেছনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে অনেকেই চিহ্নিত করেন। জাতীয় সততা ব্যবস্থার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের রাজনীতিকরণ ও অকার্যকর করার পেছনে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দুর্নীতি ও শাস্তি থেকে অব্যাহতির সংস্কৃতি গড়ে তোলা। এমনকি নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলোর অবৈধ রাজনীতিকরণ প্রশ্নের মুখে ফেলে দেয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাকেই। অথচ একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার হস্তান্তর নিশ্চিত করার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর যে দক্ষতা ও নিরপেক্ষতা প্রয়োজন তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রচন্ড আস্থার অভাব থেকে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উদ্ভব হয়।

এই প্রেক্ষিতে ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি-পরবর্তী সরকার দুর্নীতি ও কালো টাকার প্রভাব থেকে মুক্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও নির্বাচনের লক্ষ্যে অভাবনীয় কিছু প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এসব উদ্যোগের মধ্যে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ, নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন ও সরকারি কর্ম কমিশনের সংস্কার ও পুনর্গঠন, জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী সনদ অনুমোদন, এবং সর্বোপরি দুর্নীতিকে শাস্তিযোগ্য অপরাধের পর্যায়ভুক্ত করার সার্বিক প্রচেষ্টা গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য একটি নতুন সুযোগ সৃষ্টি করে।

সাধারণভাবে এসব প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতিগত সংস্কারের পেছনে সাধারণ জনগণের ব্যাপক সমর্থন রয়েছে বলে মনে করা হয়। তবে এখন পর্যন্ত সাধারণ জনগণ এই সংস্কার প্রক্রিয়াকে কিভাবে দেখছে, এবং এই প্রক্রিয়ায় কিভাবে তাদের চাহিদাকে সামনে রেখে পরবর্তী নির্বাচনের প্রস্তুতি প্রয়োজন, নির্বাচনের পরে সংসদ ও সরকারের কাছ থেকে তাদের প্রত্যাশা কী, সংসদ কার্যকর

[১] তানভীর মাহমুদ, *গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে অষ্টম জাতীয় সংসদ (২০০১-২০০৬)*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০০৭।

[২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯-২০।

করতে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা কী হবে এসব বিষয়ে কোনো ধরনের পর্যালোচনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এই গবেষণার কাজটি হাতে নেয় যার মাধ্যমে সারা দেশের সকল শ্রেণী পেশার জনগণকে সম্পৃক্ত করে প্রথমবারের মতো সংসদ ও সংসদ সদস্যদের ওপর জনগণের পক্ষ থেকে একটি অংশগ্রহণমূলক নাগরিক প্রত্যাশার সনদ তৈরি করা হয়েছে।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য:

১. আগামী সংসদ নির্বাচনে জনগণ কেমন প্রার্থী প্রত্যাশা করে তা অনুধাবন করা;
২. নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের কাছে সাধারণ জনগণের প্রত্যাশা উদ্ঘাটন করা;
৩. আগামী সংসদ কার্যকর করার ক্ষেত্রে সংসদ সদস্য ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা সম্পর্কে জনগণের প্রত্যাশা অনুধাবন করা; এবং
৪. সংসদ ও সংসদ সদস্যদের প্রতি জনগণের অধিকার নির্ধারণে একটি নাগরিক প্রত্যাশার সনদ প্রস্তুত করা।

১.৩ গবেষণা পদ্ধতি

১.৩.১ গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি

এই গবেষণায় গুণবাচক ও পরিমাণবাচক উভয় ধরনের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গুণবাচক তথ্য সংগ্রহের জন্য নানা ধরনের কৌশল যেমন, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি), কর্মশালা, এবং মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার অবলম্বন করা হয়েছে। অন্যদিকে পরিমাণবাচক তথ্য সংগ্রহের জন্য জরিপ করা হয়েছে।

১.৩.২ তথ্যের উৎস

এই গবেষণা পরিচালনা করতে গিয়ে পরোক্ষ এবং প্রাথমিক উভয় ধরনের উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

পরোক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে সংসদ ও সংসদ সদস্য সংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রন্থ, গবেষণা প্রবন্ধ, পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ, ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশিত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রাথমিক তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে জরিপ, এফজিডি, মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, এবং কর্মশালা। এই গবেষণায় প্রাথমিক তথ্যের জন্য যেসব উৎস ব্যবহার করা হয়েছে তার সারাংশ সারণি ১.১ এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হল।

সারণি ১.১: প্রাথমিক তথ্য উৎসের পরিসংখ্যান

তথ্যের উৎসের ধরন	*এলাকা এবং সংখ্যা*	*অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা*
জরিপ	৩০টি জেলায় ৩২টি সংসদীয় এলাকা	৩,২০০
এফজিডি	১৩টি জেলায় ২৪টি	৩১২
কর্মশালা	১৩টি জেলায় ১৩টি	৮৬৯
মুখ্য তথ্যদাতা		৫২

নিচে প্রতিটি তথ্য সংগ্রহ কৌশলের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো।

ক. জরিপ:

জরিপে বহুপর্যায়ী দৈবচয়ন নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। জরিপের এলাকাসমূহ ছয়টি বিভাগের ৩২টি নির্বাচনী এলাকায় বিস্তৃত। এসব এলাকার মধ্যে পল্লী (৫৯%) ও পৌর (৪১%)।[৩] হালনাগাদ ভোটার তালিকা না থাকার কারণে ২০০১ সালে সাধারণ নির্বাচনে ব্যবহৃত ভোটার তালিকাকে ভিত্তি ধরে আনুপাতিক হারে বিভাগ ভিত্তিক নমুনায়ন করা হয়েছে। প্রথমে মোট নির্বাচনী আসন থেকে ৩২টি আসন নির্বাচন করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে, নির্বাচিত প্রতিটি আসন থেকে দৈবচয়ন ভিত্তিতে[৪] একটি উপজেলা নির্বাচন করা হয়। তৃতীয় পর্যায়ে নির্বাচিত উপজেলার মধ্য থেকে দুইটি ওয়ার্ড বা ইউনিয়ন নির্বাচন করা হয়।[৫] চতুর্থ পর্যায়ে প্রতিটি ওয়ার্ড বা ইউনিয়ন থেকে দৈবচয়ন ভিত্তিতে গ্রাম বা মহল্লা নির্বাচন করা হয়। পঞ্চম পর্যঅয়ে ৩ খানা অন্তর

[৩] বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার (১২ কোটি ৩৮ লক্ষ) ২৩.১% শহরাঞ্চলে এবং বাকি ৭৬.৯% পল্লী অঞ্চলে বসবাস করে। ***সূত্র:*** http://www.bbs.gov.bd/dataindex/stat_bangladesh.pdf

[৪] একটি আসনে যতগুলো মহল্লা ও ওয়ার্ড রয়েছে তার তালিকা করে গ্রাম ও শহর ভিত্তিক পর্যায়ক্রমিকভাবে নমুনা এলাকা বাছাই করা হয়।

[৫] জরিপকৃত সংসদীয় আসন এবং ওয়ার্ড / মহল্লার তালিকার জন্য দেখুন পরিশিষ্ট ১ ক ও খ।

৫০টি খানা নির্বাচন করা হয়।[৬] ষষ্ঠ পর্যায়ে, কিশ-গ্রিড পদ্ধতি অনুসরণ করে নির্বাচিত প্রতিটি খানা থেকে উপযুক্ত ভোটারদের মধ্য থেকে একজন ভোটারকে তথ্যদাতা হিসেবে নির্বাচন করা হয়। এভাবে নির্বাচিত প্রতিটি আসন থেকে ১০০ জন করে মোট ৩,২০০ জন ভোটারের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

চিত্র ১.১: জরিপে পল্লী ও পৌর এলাকা বিন্যাস

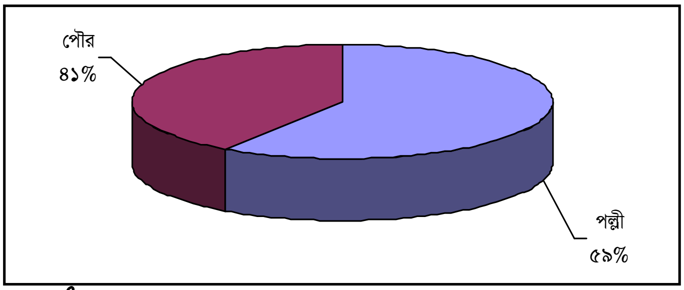

তথ্যদাতার আর্থ-সামাজিক অবস্থান[৭]:

এই জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সর্বাধিক ২৮.১ শতাংশের বয়স ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। এর পরেই রয়েছে ২৮ থেকে ৩৭ বছর বয়সী (২৫.৩ শতাংশ) ও ৩৮ থেকে ৪৭ বছর বয়সী তথ্যদাতা (২০.৬ শতাংশ)। এদের মধ্যে নারীর ৪৬.৪ শতাংশ। ইসলাম ধর্মাবলম্বী ৮৭.৮ শতাংশ, এর পরেই রয়েছে হিন্দু ধর্মাবলম্বী ১১.৯ শতাংশ। তথ্যদাতাদের মধ্যে বিবাহিতদের সংখ্যাই বেশি (৮০.৩ শতাংশ)। এদের মধ্যে দশম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন সর্বাধিক ২৯.১ শতাংশ, এর পরেই রয়েছে সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন (১৯.৯ শতাংশ) ও পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা (১৭.২ শতাংশ)।

চিত্র ১.২: জরিপে অংশগ্রহণকারীদের লিঙ্গ বিন্যাস

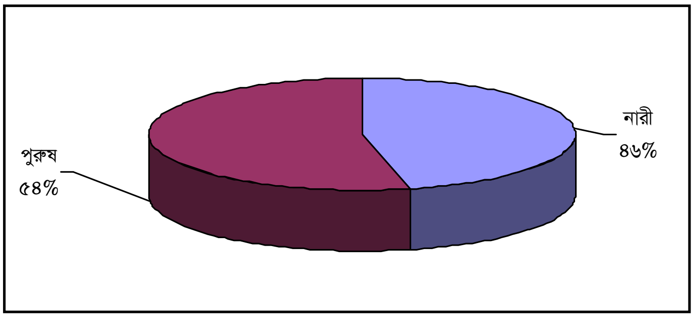

তথ্যদাতাদের মধ্যে সর্বাধিক ৩৭.৩ শতাংশের পেশা গৃহকর্ম, এর পরেই রয়েছেন কৃষক (১৪.২ শতাংশ), ও ব্যবসায়ী (১১.৫ শতাংশ)। অন্যান্য পেশার মধ্যে রয়েছেন শ্রমিক, বেসরকারি চাকরিজীবী, ছাত্র, সরকারি চাকরিজীবী, আত্মকর্মজীবী, অবসরপ্রাপ্ত, দিনমজুর, বেকার, শিক্ষক, চিকিৎসক, তাঁতি, জেলে, ও আইনজীবী। তথ্যদাতাদের মধ্যে ৪৯ শতাংশেরই কোনো ধরনের নিজস্ব আয় নেই। এদের মধ্যে গৃহিণী, ছাত্র, অবসরপ্রাপ্ত ও বেকার জনগোষ্ঠী প্রধান। তবে সরকারি ও বেসরকারি কয়েকজন চাকরিজীবী ও ব্যবসায়ী তাদের আয় বলতে চাননি এবং কয়েকজন কৃষক-শ্রমিক ও দিনমজুর তাদের আয় বলতে পারেননি। বাকি ৫১ শতাংশের মাসিক গড় আয় ৫,৯০২ টাকা, যার মধ্যে একজনের মাসিক আয় সর্বোচ্চ দুই লাখ টাকা, এবং সর্বনিম্ন আয় ১০০ টাকা। যাদের আয় রয়েছে তাদের ৭৫.৫ শতাংশের মাসিক আয় ৬,০০০ টাকার মধ্যে; মাত্র ৯.৭ শতাংশের মাসিক আয় ১০,০০০ টাকার ওপরে।

খ. ফোকাস গ্রুপ আলোচনা: স্থানীয় পর্যায়ের সাধারণ জনগণ, নাগরিক সমাজের সদস্য এবং বিভিন্ন পেশাজীবীদের ১২টি দলের সাথে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বিষয় নিয়ে ১৩টি এলাকায় ৩১২ জন অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে ২৪টি এফজিডির আয়োজন করা হয়।[৮] এসব পেশাজীবীদের মধ্যে ছিলেন কৃষক, শ্রমিক, শিক্ষক, ছাত্র, ব্যবসায়ী, আইনজীবী, দরিদ্র জনগোষ্ঠী, ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী,

---

[৬] প্রতিটি ওয়ার্ড বা মহল্লা হতে ৫০টি খানা নির্বাচনের জন্য সে এলাকার উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে শুরু করে প্রতি তিনটি খানা অন্তর সাক্ষাৎকারের জন্য খানা নির্বাচিত করা হয়। এভাবে পঞ্চাশটি খানা নির্বাচন করতে গিয়ে ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে একটি গ্রাম বা মহল্লায় আর কোনো খানা পাওয়া না গেলে পার্শ্ববর্তী গ্রাম বা ওয়ার্ড হতে খানা নির্বাচন করা হয়।

[৭] জরিপে অংশগ্রহণকারীদের আর্থ-সামাজিক তথ্য যেমন বয়স, লিঙ্গ, শিক্ষা, পেশা, ধর্ম ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে দেখুন পরিশিষ্ট ২।

[৮] যেসব এলাকায় ফোকাস গ্রুপ আলোচনার আয়োজন করা হয় সেগুলো হচ্ছে রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, পিরোজপুর, সিলেট, শ্রীমঙ্গল, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বান্দরবান ও ঢাকা।

প্রতিবন্ধী এবং গৃহিণী। এর মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক অংশগ্রহণকারী ব্যবসায়ী ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গ এবং সবচেয়ে কম সংখ্যক অংশগ্রহণকারী প্রতিবন্ধী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। প্রতিটি এফজিডি'তে গড়ে প্রায় ১৩ জন অংশগ্রহণ করেন। এই এফজিডিতে অংশগ্রহণকারী ৩০৭ জনের মধ্যে ২৯৬ জনের বয়স জানা গেছে, যাদের মধ্যে ১৫-৪৫ বছর বয়সী অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা সবচাইতে বেশি (৭৩ শতাংশ) এবং ২৬৯ জনের শিক্ষাগত যোগ্যতা জানা গেছে যাদের মধ্যে স্নাতক ও মাস্টার্স ডিগ্রীধারী অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি (৫০.৯৩ শতাংশ), এবং নিরক্ষর ও সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা সবচেয়ে কম (১৩ শতাংশ)।[৯]

গ. মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার: দেশের প্রথিতযশা ৫২ জন রাজনীতি, সংবিধান, সংসদ ও নির্বাচন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত বা এসব বিষয়ে অভিজ্ঞ, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এসব ব্যক্তিত্বের মধ্যে রয়েছেন রাজনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষক ও গবেষক, সাবেক সংসদ সদস্য ও প্রধান দলগুলোর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও উন্নয়ন সহযোগী, সাংবাদিক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, ব্যবসায়ী নেতা, এবং বর্তমান ও সাবেক নির্বাচন কমিশনার (সারণি ১.২)।[১০]

সারণি ১.২: মুখ্য তথ্যদাতাদের পরিচিতি

পরিচিতি	***সংখ্যা***
শিক্ষক ও গবেষক	৭
সাবেক সংসদ সদস্য / রাজনীতিক	১৩
নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি	১৪
রাজনীতি বিশ্লেষক	৬
সাংবাদিক	৫
ব্যবসায়ী নেতা	৩
উন্নয়ন সহযোগী	২
বর্তমান ও সাবেক নির্বাচন কমিশনার	২
মোট	***৫২***

ঘ. কর্মশালা: গবেষণার জরিপে অন্তর্ভুক্ত এলাকাগুলোর মধ্য থেকে ছয়টি বিভাগ থেকে কমপক্ষে দুইটি শহরসহ মোট ১৩টি জেলায়[১১] কর্মশালার আয়োজন করা হয় যেখানে স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন পেশাজীবী এবং বিশিষ্ট নাগরিকদের সাথে গবেষণার বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা হয়। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন সাবেক মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যসহ স্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, সাংবাদিক, সরকারি চাকরিজীবী, এনজিও প্রতিনিধি, শিক্ষক, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, সমাজকর্মী, চিকিৎসক, বেসরকারি চাকরিজীবী, মুক্তিযোদ্ধা, ও ছাত্র।[১২] এসব কর্মশালায় গবেষণার বিষয়বস্তু উপস্থাপনের পাশাপাশি আমন্ত্রিতদের অংশগ্রহণে বিষয়ভিত্তিক দলীয় আলোচনার মাধ্যমে তাদের মতামত সংগ্রহ করা হয়। এসব কর্মশালায় ৮৬৯ জনের মধ্যে নারী অংশগ্রহণকারী ১২.৯ শতাংশ।

১.৪ গবেষণায় সংগৃহীত তথ্যের সময়

এই গবেষণায় ২০০৮ সালের মে থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে জরিপ ২০০৮ এর মে মাসে, দলগত আলোচনা এপ্রিল থেকে জুন, কর্মশালা জুলাই ও আগস্ট, এবং মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পরিচালিত হয়।

১.৫ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

- জরিপ শুরুর সময়ে হালনাগাদকৃত ভোটার তালিকা না থাকার কারণে নমুনায়ন কাঠামো নির্ধারণ করতে সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। পরবর্তীতে কিশ-গ্রিড পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে এই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার চেষ্টা করা হয়।
- জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে (মূলত নিম্ন আয়ের মানুষ এবং গৃহিণীদের একটি বড় অংশের) সংসদ এবং সংসদ সদস্য সংক্রান্ত কোনো কোনো বিষয়ে সর্বোচ্চ ১২ শতাংশের কোনো ধারণাই নেই বলে দেখা গেছে।

[৯] এফজিডিতে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন পরিশিষ্ট ৩।
[১০] মুখ্য তথ্যদাতাদের পরিচিতির জন্য দেখুন পরিশিষ্ট ৪।
[১১] যেসব জেলা ও উপজেলা শহরে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয় সেগুলো হচ্ছে রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, বরিশাল, পিরোজপুর, সিলেট, শ্রীমঙ্গল, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ও বান্দরবান।
[১২] কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের ওপর বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন পরিশিষ্ট ৫।

- যদিও এটি একটি মতামত জরিপ, তবু অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে গবেষণার বিষয়বস্তুর কারণে নমুনায়ন প্রক্রিয়ায় বাছাইকৃত খানার সংশ্লিষ্ট তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে দৈবচয়ন প্রক্রিয়ায় কোনো খানায় একজন নারী সদস্যকে বাছাই করা হলেও বাড়ির কর্তা তাকে কোনোভাবেই সাক্ষাৎকার দিতে অনুমতি দেননি।
- গবেষণায় মুখ্য তথ্যদাতাদের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট রাজনীতিক মুখোমুখি সাক্ষাৎকার দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন, যাদের মতামত এই গবেষণাটিকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারত।

১.৬ প্রতিবেদনের কাঠামো

এ প্রতিবেদনটি মোট নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট, যৌক্তিকতা, গবেষণা পদ্ধতি এবং উত্তরদাতার মৌলিক তথ্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশের সংসদ ও সংসদ সদস্য বিষয়ক বিভিন্ন তথ্যাদি পর্যালোচনা, ও তথ্য বিশ্লেষণ কাঠামো আলোচিত হয়েছে। সংসদ সদস্যদের যোগ্যতা যেমন শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সম্পর্কে পক্ষ-বিপক্ষ মত আলোচনা করা হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে। চতুর্থ অধ্যায়ে সংসদ সদস্যদের ব্যক্তিগত তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার এবং সংসদ সদস্যদের সাথে সাধারণ জনগণের যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা ও মাধ্যম সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে সংসদে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা কী হওয়া উচিত তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। একটি কার্যকর সংসদ কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে এই বিষয় আলোচনা করা হয়েছে ষষ্ঠ অধ্যায়ে। সপ্তম অধ্যায়ে সংসদীয় গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি আলোচনা করা হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোর স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে জনগণের পক্ষ থেকে সংসদ সদস্যদের প্রত্যাশিত আচরণ এবং তাঁদের জন্য আচরণ বিধি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হয়েছে। সবশেষে নবম অধ্যায়ে উপসংহার ও সুপারিশমালা উপস্থাপিত হয়েছে।

অধ্যায় দুই
তথ্য বিশ্লেষণ কাঠামো

আধুনিক সমাজতান্ত্রিক কিংবা গণতান্ত্রিক, রাষ্ট্রপতি-শাসিত কিংবা সংসদীয় সব ধরনের শাসন ব্যবস্থায়ই সংসদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃত। তবে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংসদের গুরুত্ব অনেক বেশি, কেননা সংসদীয় সরকার এমন একটি সরকার পদ্ধতি, যেখানে সরকারের নির্বাহী বিভাগ সংসদের কাছে দায়বদ্ধ থাকে। বলা হয়ে থাকে, সংসদীয় সরকার এমন এক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যেখানে "নির্বাহী কর্তৃপক্ষ আইন প্রণয়ন কর্তৃপক্ষ থেকে উদ্ভূত এবং তারে কাছেই দায়বদ্ধ" [১৩]।

সংসদ এবং সংসদ সদস্যদের ওপর যে কোনো গবেষণার আগে এ সংক্রান্ত মূল কিছু ধারণার সাথে পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এই অধ্যায়ে সংসদ ও সংসদ সদস্য বিষয়ক তত্ত্ব ও তথ্য পর্যালোচনা করার সাথে সাথে এই গবেষণার জন্য প্রযোজ্য নাগরিক সনদের ওপর মূল কিছু ধারণার সাথেও পরিচয় করানো হয়েছে। একই সাথে বাংলাদেশের সংসদীয় কাঠামো সংক্রান্ত তথ্য, সংসদ সদস্য সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন এবং এর আওতায় সদস্যদের কার্যাবলী ও সুযোগ সুবিধার ওপর একটি প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হয়েছে।

২.১ সংশ্লিষ্ট গবেষণা তথ্য পর্যালোচনা

২.১.১ আইনসভার গঠন

সংসদ ও সংসদ সদস্য বিষয়ক আলোচনায় প্রথমেই আইনসভার গঠন নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। আইনসভার কক্ষের ওপর ভিত্তি করে বিশ্বে দুই ধরনের আইনসভা লক্ষ করা যায়। যে দেশের আইনসভায় একটি মাত্র কক্ষ থাকে তাকে এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা[১৪] (Unicameral Parliament) বলা হয়। সাধারণত একই ইতিহাস-ঐতিহ্যের ক্ষুদ্র আয়তনবিশিষ্ট দেশগুলোতে এককক্ষ বিশিষ্ট সংসদ লক্ষ করা যায় (যেমন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ, ইসরাইলের নেসেট, নিউজিল্যান্ডের পার্লামেন্ট ইত্যাদি)। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষকে রক্ষণশীল, অভিজাত কিংবা বুর্জোয়া মানসিকতার ধারক হিসাবে আখ্যা দিয়ে এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা গঠন করেছে (চীনের ন্যাশনাল কংগ্রেস, কিউবার ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি)। আবার কোনো কোনো দেশে দুইকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা[১৫] (Bicameral Parliament) লক্ষ করা যায় যেখানে আইনসভা উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষে বিভক্ত থাকে। এ ধরনের আইনসভায় সাধারণত নিম্নকক্ষ নির্বাচিত এবং উচ্চকক্ষ মনোনীত সদস্যদের দ্বারা গঠিত হয় (যেমন যুক্তরাজ্যের নিম্নকক্ষ 'হাউস অব কমন্স' নির্বাচিত আর উচ্চকক্ষ 'হাউস অব লর্ডস' মনোনীত)। সাধারণত ফেডারেল সরকার ব্যবস্থায় দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা বেশি লক্ষ করা যায় (যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেট, ভারতের লোকসভা ও রাজ্যসভা ইত্যাদি)। তবে অনেক ইউনিটারি ব্যবস্থায়ও দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা লক্ষণীয় (যেমন যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স বা ইটালির পার্লামেন্ট)।

২.১.২ সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিনিধিত্বশীল পরিষদগুলোর কর্মকান্ডে একটি প্রয়োজনীয় উদ্ভাবন হচ্ছে কমিটি ব্যবস্থা। আধুনিক আইন পরিষদগুলোর কার্যক্রমের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটার ফলে কমিটি ব্যবস্থার মাধ্যমে আইন প্রণয়ন এবং সরকারের কর্মকান্ডের পর্যালোচনা ও পরীক্ষণ সর্বত্রই লক্ষ করা যায়।[১৬] কমিটি ব্যবস্থার সূতিকাগার যুক্তরাজ্যে কমিটি ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হলো এর পক্ষপাতহীনতা এবং কমিটি গঠনে জ্যেষ্ঠতার নীতি অনুসরণ করা। যুক্তরাজ্যে পার্লামেন্টের সকল বিল পূর্ণাঙ্গ পরীক্ষণের জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করা হয় এবং বিল পাশ হওয়ার পর পর এসব কমিটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। যুক্তরাজ্যে পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটি অবিরতভাবে কাজ করে যায়। বিরোধী দলের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতার নেতৃত্বে পাবলিক একাউন্টস কমিটি গঠন করা হয় যা সরকারের দায়িত্বশীলতা অর্জনে পার্লামেন্টের প্রহরী হিসেবে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছে।[১৭] সুদূর অতীতকাল থেকে মার্কিন কংগ্রেসনাল কমিটিগুলোর সবিশেষ গুরুত্ব থাকায় সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন

---

[১৩] Michael Laver, Kenneth A. Shepsle (ed.), *Cabinet Ministers and Parliamentary Government*, Cambridge University Press, New York, 1994.

[১৪] বিস্তারিত জানতে দেখুন <http:/en,wikipedia.org/wiki/unicameralism>

[১৫] বিস্তারিত জানতে দেখুন <http:/en,wikipedia.org/wiki/bicameralism>

[১৬] আল মাসুদ হাসান উজ্জামান, 'বাংলাদেশে কমিটি ব্যবস্থা', মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর (সম্পাদিত), *গণতন্ত্র*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ১৬৫-১৭৩।

[১৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৬।

যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যানদের সরকার হিসাবে আখ্যায়িত করেছিলেন।[১৮] উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রতিনিধিত্বকারী আমাদের উপমহাদেশে ভারত, শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানে সাংবিধানিক কাঠামোর আওতায় সংসদীয় কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতে সংসদীয় কর্মকান্ডের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ কমিটিসমূহের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।[১৯] প্রকৃতি অনুসারে ভারতের লোকসভার কমিটিগুলোকে স্থায়ী কমিটি এবং অ্যাড হক কমিটি - এ দু'ভাগে ভাগ করা যায়।[২০] স্থায়ী কমিটি স্থায়ী এবং সংসদের আইন কিংবা 'রুলস অব প্রসিডিউর' কিংবা 'রুলস অব বিজনেস' অনুযায়ী গঠন করা হয়। সাধারণত তিন ধরনের স্থায়ী কমিটি দেখা যায় - অর্থ সংক্রান্ত কমিটি, মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ও অন্যান্য কমিটি। অস্থায়ী ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুসারে অ্যাড-হক কমিটি গঠন করা হয় এবং রিপোর্ট প্রকাশের পর এসব কমিটি বিলুপ্ত করা হয়। এধরনের কমিটির মধ্যে আছে সিলেক্ট কমিটি, জয়েন্ট কমিটি অন বিলস, পার্লামেন্টের খাদ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জয়েন্ট কমিটি ইত্যাদি।

বাংলাদেশের সংবিধানে আইন সংক্রান্ত কাজের জন্য সংসদীয় কমিটি গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। সংবিধানের ৭৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদকে সংসদের বিধি অনুসারে পাবলিক একাউন্টস কমিটিসহ অন্যান্য স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।[২১] একসময় বলা হয়েছে বাংলাদেশের কমিটি ব্যবস্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পর সবচেয়ে বৃহৎ ও শক্তিশালী। কিন্তু বাস্তবে বাংলাদেশে সংসদীয় কমিটি কতটুকু ফলপ্রসূ ও কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে তা বরাবরই আলোচিত হয়েছে। যেসব কারণে বাংলাদেশের কমিটি ব্যবস্থা বারবার প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে তার মধ্যে দ্রুত ও সময়মত কমিটি গঠন না করা, শক্তিশালী বিরোধী দলের অভাব, সংসদ ও সরকারের নেতৃত্ব একই ব্যক্তির হাতে কুক্ষিগত হওয়া, সংসদীয় ব্যবস্থার ধারাবাহিকতার অভাব, ঠিকমত কমিটির মিটিং না হওয়া, কমিটির প্রয়োজনীয় জনবল ও অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার অভাব, নির্বাহী বিভাগের কর্মকর্তাদের অসহযোগী মনোভাব, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নে আগ্রহের অভাব প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[২২]

২.১.৩ সংসদের গুরুত্বপূর্ণ অফিসসমূহ

সংসদ পরিচালনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যে চারটি অফিস বা ব্যক্তি পালন করেন তারা হলেন সংসদ নেতা, স্পিকার, বিরোধীদলীয় নেতা এবং সরকারি ও বিরোধী দলীয় হুইপগণ।[২৩] সংসদ নেতার সর্বপ্রভাবক ভূমিকার কারণে তাকে সংসদীয় পরিভাষায় 'সবেচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব' বা 'সংসদের অভিভাবক' বলা হয়। স্পিকারের ভূমিকার সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো তার নিরপেক্ষতা। গণতন্ত্র আকর্ষণীয় ও সফল হয় তখনই যখন বিরোধী পক্ষ তাদের মতামত ব্যক্ত করতে পারে এবং সরকার বিরোধিতা সহ্য করে। আর এই বিরোধিতা, যাকে গণতন্ত্রের সবচেয়ে উজ্জ্বল দিক বলা হয়, কতটা অর্থপূর্ণ ও দায়িত্বশীল হবে তা নির্ভর করে সংসদে বিরোধীদলীয় নেতার ভূমিকার ওপর। সরকার ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে যোগাযোগ গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য একটি অপরিহার্য শর্ত। এই যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা ও জোরদার করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন উভয় পক্ষের হুইপগণ।

এই সকল প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে একটা সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও কার্যকর সংসদ গড়ে ওঠার কথা থাকলেও বাংলাদেশে এই প্রতিষ্ঠানগুলো কতটা কার্যকর তা বিগত আটটি সংসদের দিকে তাকালে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। বাংলাদেশে কারা সংসদ নেতার দায়িত্ব পালন করেন, সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা একই ব্যক্তি পালন করলে তা কতটুকু ফলপ্রসূ হয়, বাংলাদেশে স্পিকারের ভূমিকা কতটুকু নিরপেক্ষ, কিভাবে স্পিকারের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা যায়, বিরোধীদলীয় নেতার নেতিবাচক ভূমিকা কিভাবে দূর করা যায়, হুইপদের ভূমিকা কার্যকর হয় না কেন, দুর্বলতাগুলো কিভাবে দূর করা যায় – এই সকল প্রশ্নের সমাধান করে বাংলাদেশে একটা কার্যকর সংসদ গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবি।

২.১.৪ আইনসভার দায়িত্ব ও কার্যক্রম

ওয়াল্টার বেজহটের (১৮২৬-১৮৭৭) মতে আইনসভার পাঁচ ধরনের কাজ রয়েছে।[২৪] আইনসভার প্রথম কাজ পছন্দ করা – আইনসভা নেতা তথা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করে। আইনসভার দ্বিতীয় কাজ প্রকাশ করা। আইনসভা এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা জনগণের মনের ভাব প্রকাশ করবে। বিভিন্ন বিষয়ে জনগগোষ্ঠী কি ভাবছে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে আইনসভার মাধ্যমে। আইনসভার তৃতীয় কাজ শেখানো। আইনসভার সদস্যরা সকলেই নেতৃস্থানীয় ও যোগ্য ব্যক্তি। এই যোগ্য ব্যক্তিরা সমাজ

---

[১৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৬।

[১৯] আল মাসুদ হাসান উজ্জামান, 'বাংলাদেশে কমিটি ব্যবস্থা', মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর (সম্পাদিত), *গণতন্ত্র*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ১৬৫-১৭৩।

[২০] বিস্তারিত জানতে দেখুন http://164.100.47.134/PARLIAMENTARY%20 committees.htm

[২১] বিস্তারিত পড়ুন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৬ অনুচ্ছেদ এবং সংসদীয় কার্যপ্রণালী বিধির ১৮৭-২৬৬ বিধি।

[২২] জালাল ফিরোজ, *পার্লামেন্ট কিভাবে কাজ করে: বাংলদেশের অভিজ্ঞতা*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১০৯-১১১।

[২৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫-৬০, ৬১-৮১, ১৪১-১৪৭।

[২৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪-২৫ (পিটার ম্যাগউইক, *এ নিউ ইন্ট্রোডাকশন টু ব্রিটিশ পলিটিক্স*, স্ট্যানলি থ্রোনস, লন্ডন, ১৯৯৩, পৃ. ১৭৩ থেকে উদ্ধৃত)।

পরিবর্তনের চেষ্টা করবেন। সমাজের জন্য যা ভালো ও কাঙ্ক্ষিত তা করার জন্য তাঁরা জাতিকে শিক্ষা দেবেন। আইনসভার চতুর্থ কাজ তথ্য জ্ঞাপন করা। আইনসভা জনগণকে তাদের সমস্যা, অভাব-অভিযোগ, সমস্যা সমাধানের উপায় সম্পর্কে অবহিত করে। আইনসভার পঞ্চম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ আইন প্রণয়ন করা। পরবর্তীতে বিভিন্ন দেশে এবং পরিবর্তিত সময়ে আইনসভার কাজ পর্যবেক্ষণ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অনেকে এর বহুবিধ কাজকে প্রধানত তিনটি অংশে ভাগ করেছেন – গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রতিনিধিত্ব করা, আইন প্রণয়ন করা এবং তদারকি করা। আবার কেউ কেউ এই তিন ধরনের কাজের সঙ্গে আরও দুটি প্রধান কাজ যুক্ত করেছেন। যেমন জাতীয় বিতর্কের ফোরাম হিসেবে কাজ করা এবং সরকার গঠন ও নির্বাচন করা। এর বাইরেও অনেকে বাজেট প্রণয়নকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[২৫] বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সংসদের মূল কাজ হচ্ছে আইন প্রণয়ন, সরকারের নির্বাহী বিভাগের কাজ পর্যবেক্ষণ বা তদারকি করা, কমিটির শুনানির মাধ্যমে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিতর্ক এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন যুদ্ধ ঘোষণা বা সংবিধান সংশোধনে সিদ্ধান্ত নেওয়া।[২৬]

সংসদ ও সংসদ সদস্য বিষয়ক আলোচনায় গণতন্ত্রের ধরন অনুযায়ী সংসদের সদস্যদের কার্যক্রমের সমালোচনা এবং এর কারণ অনুসন্ধান করা হয়েছে। বাংলাদেশে 'ওয়েস্টমিনিস্টার' ধরনের সংসদীয় গণতন্ত্র বিদ্যমান যা সংসদীয় আসন ব্যবস্থাভিত্তিক নির্বাচনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। অন্যান্য 'ওয়েস্টমিনিস্টার' ধরনের আইনসভাগুলোর মতোই বাংলাদেশেও 'ক্যান্ডিডেট ব্যালট' পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় যেখানে কোনো একটি সংসদীয় এলাকায় একজন ভোটার একজন প্রার্থীকে একটি ভোট দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। এই ধরনের ভোট ব্যবস্থাকে বলা হয় 'First Past the Post (FPTP)' ব্যবস্থা, যা বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে সবচেয়ে সহজ এবং সর্বাধিক প্রচলিত। এই ধরনের ভোট ব্যবস্থায় কোনো একটি নির্দিষ্ট নির্বাচনী আসনে একজন প্রার্থী অন্য প্রার্থীদের যে কারও চাইতে বেশি ভোট পেলেই তাকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। এই ধরনের ভোট ব্যবস্থার নানা ধরনের সুবিধা থাকলেও বিভিন্ন ধরনের অসুবিধাও রয়েছে, যার মধ্যে আইনসভায় নারী, ক্ষুদ্র জাতিসত্বা ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব না থাকা, মোট ভোটের তুলনায় সংসদে কম আসন পাওয়া, এবং একটি নির্বাচনী এলাকায় আনুপাতিক হারে কম ভোট পেয়েও বিজয়ী হওয়া প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।[২৭] বাংলাদেশে প্রায় সব সরকারই জনগণের ভোটে ৪০ শতাংশের কম ভোট পেয়েও সরকার গঠন করেছেন এবং রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। কিন্তু জনগণের অধিকাংশ ভোটপ্রাপ্ত দল বা প্রতিনিধিদের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

এই ধরনের সংসদীয় গণতন্ত্র ব্যবস্থায় মূলত সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে একটি নির্বাচনী এলাকা থেকে একজন নির্বাচিত হন। এই প্রক্রিয়ায় ভোটাররা একজনকে সরাসরি ভোট দিয়ে থাকে তার দলকে সমর্থন করার জন্য। ফলে আরও বেশি স্থানীয় সমর্থন পাওয়ার জন্য প্রার্থীরা নির্দিষ্ট ধরনের সুবিধা দেওয়া এবং স্থানীয় পর্যায়ে সেবামূলক কার্যক্রম হাতে নেওয়ার জন্য প্রচ্ছন্নভাবে উৎসাহিত হয়। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ আসনগুলোতে জয়ী হওয়ার জন্য এই ধরনের কার্যক্রম খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়ে থাকে, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ফলাফল নির্ণায়ক হয়ে থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে অস্ট্রেলিয়ার একটি অংশের সংসদ সদস্যরা নির্বাচনী এলাকার সেবায় উল্লেখযোগ্য সময় ব্যয় করেন। এসব সেবার মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিগত পর্যায়ের সেবা যেমন অভিবাসন, পারিবারিক আইন ও সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত সেবা।[২৮] যুক্তরাজ্যের ক্ষেত্রে এই প্রবণতা ৫০ এর দশকের পরে ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়াসহ অন্যান্য দেশে জনগণের দিক থেকে চাহিদা বৃদ্ধিকে এই প্রবণতার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।[২৯] কিন্তু তারপরও দেখা যায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পরে তার দায়বদ্ধতা জনগণ বা সংসদের প্রতি না থেকে দলের প্রতি বেশি থাকে। তাঁরা জনগণের প্রতিনিধি না হয়ে দলের প্রতিনিধি হিসেবে সংসদে অংশগ্রহণ করেন।

২.১.৫ সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

সংসদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা তেমন ব্যাপক নয়। সংসদ সদস্যদের মূল কাজ প্রধানত তিনটি – সংসদে নিজ নিজ এলাকার জনগণের প্রতিনিধিত্ব করা, সংসদীয় বিতর্কে অংশগ্রহণ করা, এবং ভোটে অংশগ্রহণ করা।[৩০] বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি (Rules of Procedure) অনুযায়ী সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব আইন প্রণয়ন, রাষ্ট্রের জন্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন, স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন, স্পিকার বা ডেপুটি

---

[২৫] 'Parliamentary Performance', <http://www.parlcent.ca/index_e.php> (accessed on 25 September 2005)।

[২৬] Saadat Husain, 'Where do we go from here?', *The Daily Star*, 29 November 2006.

[২৭] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন Andrew Reynolds *et al*, *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Stockholm, Sweden, 2005, pp. 35-44.

[২৮] Gianni Zappala, 'The micro-politics of immigration: service responsiveness in an Australian 'ethnic electorate', *Ethnic and Racial Studies*, 1998, cited in Pippa Norris, *Are Australian MPs in Touch with Constituents?*, Australian Democratic Audit, January 2004.

[২৯] Pippa Norris, *Are Australian MPs in Touch with Constituents?*, Australian Democratic Audit, January 2004.

[৩০] Timothy Besley and Valentino Larcinese, *Working or Shirking? A Closer Look at MPs' Expenses and Parliamentary Attendance*, August 2005.

স্পিকারকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দান, রুলস অব প্রসিডিওর সংশোধন, সংসদে প্রশ্ন করা, জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে বিল উত্থাপন, এবং সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে অংশগ্রহণ করা।[৩১]

তবে সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, ভূমিকা ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণায় ব্যাপক ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। মারে (২০০০) এর একটি গবেষণায় দেখা যায় সাধারণ জনগণের মতে সংসদীয় আসনের স্বার্থ রক্ষা, সরকারের সাথে সমস্যায় জড়িত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত পর্যায়ে সহায়তা, সরকারি নীতি বাস্তবায়নে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা নিশ্চিত করা, সরকার কী করছে সে ব্যাপারে সংসদীয় এলাকার জনগণকে অবহিত করা, সংসদে বিতর্ক এবং আইন প্রণয়ন করা সংসদ সদস্যদের কাজ।[৩২] সাধারণভাবে জনগণের প্রত্যাশা থাকে রাজনীতিবিদরা তাদের জন্য কাজ করবে, এবং তাদের ব্যক্তিগত সাহায্যে কাজে আসবে (ওয়াইল্ডার ১৯৯৯; কৃষ্ণা ২০০২)। ব্যক্তিগত পর্যায়ের সহযোগিতা সব গণতান্ত্রিক দেশেই বিদ্যমান, তবে উন্নয়নশীল বিশ্বে এর প্রবণতা বেশি দেখা যায়। আর এই ধরনের কার্যক্রম রাজনীতিবিদদের ভাবমূর্তি গঠনে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। রাজনীতিকদের ভাবমূর্তি ভোটারদের কাছে নির্বাচন-পূর্ব প্রতিশ্রুতি পালনে সাফল্যের ওপরও নির্ভরশীল। ভাবমূর্তি গঠনের উপায় – একদিকে তাদের প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে ভোটারদের জানানো, সেগুলো পূরণ করা, নির্বাচনের দিন ভোটারদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা, এবং অন্যদিকে যারা এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সফল তাদের সহায়তা গ্রহণ করা। অগ্রহণযোগ্য প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া 'দাতা-গ্রহীতা সম্পর্কের' (Patron-client relationship) মাধ্যমে দুর্নীতিকে উৎসাহিত করে। দীর্ঘ মেয়াদে এটি রাজনৈতিক দল এবং রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।[৩৩]

এই দাতা-গ্রহীতা সম্পর্কের হাত ধরে আসে রাজনৈতিক দুর্নীতি। রাজনৈতিক ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থানকারীদের ব্যক্তিগত বা দলগত সুবিধা লাভের জন্য এবং ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য ক্ষমতা কুক্ষিগত করাই হচ্ছে রাজনৈতিক দুর্নীতি। এই ধরনের দুর্নীতিতে কখনও কখনও একদিকে ক্ষমতা কুক্ষিগত করা, এবং অন্যদিকে কুক্ষিগত সম্পদ বা সরকারি সম্পদকে অবৈধভাবে বিভিন্ন উপায়ে ব্যবহার করা যেমন জোর করে অর্থ আদায়, ভোট কেনা, নির্বাচন কমিশনের পক্ষপাতদুষ্টতা, রাজনৈতিক অর্থায়ন ইত্যাদির মাধ্যমে ক্ষমতা দখলে রাখা – দু'টিই হতে পারে। রাজনৈতিক দুর্নীতিতে জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে নির্বাহী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রীসভা, উচ্চ পর্যায়ের আমলা, এবং আইনসভার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি সংসদ সদস্যরাও থাকতে পারেন।[৩৪]

'ওয়েস্টমিনিস্টার' ধরনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচিত আইন প্রণেতারা নির্বাহী সরকার গঠন করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দল প্রথমে সংসদের নেতা নির্বাচন করে যিনি এই সরকার গঠনে রাষ্ট্রপতি দ্বারা আমন্ত্রিত হন। এরপর প্রধানমন্ত্রী সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে (বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৯০ শতাংশ) মন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত করেন যারা সরকারের মন্ত্রী-পরিষদ (কেবিনেট) গঠন করেন। এই ধরনের সংসদীয় ব্যবস্থার অন্যতম দুর্বলতা হচ্ছে, যারা আইনসভার সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন তাদের মধ্য থেকেই মন্ত্রী নিয়োগ করা হয় যারা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নির্বাহী ক্ষমতা ধারণ করেন। ফলে ক্ষমতার বাইরে যারা থেকে যান তাঁরাও নিজ নিজ সংসদীয় আসনে নির্বাহী ক্ষমতার প্রতিফলন ঘটাতে চান যা স্থানীয় সরকারের কার্যক্রমকে ব্যাহত করে।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখা যায়, সংসদ সদস্যদের ওপর প্রদত্ত নির্বাহী দায়িত্ব তাদের ওপর সাংবিধানিকভাবে অর্পিত দায়িত্বের চাইতে বেশি গুরুত্ব পায়। সংশ্লিষ্ট সংসদীয় আসনে উন্নয়ন কর্মকান্ড ও অনুন্নয়নমূলক কার্যক্রমে সংযুক্ত থাকার ফলে সংসদ সদস্যদের জন্য এই প্রতিনিধিত্ব অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে খুবই লোভনীয়। উপজেলা পরিষদ ১৯৯১ সালে (পঞ্চম সংসদের সময়) বিলুপ্ত করা হয়[৩৫] যার ফলে স্থানীয় সরকারের অনুপস্থিতিতে একটি উপজেলায় সংসদ সদস্যরা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠেন, যদিও সংবিধানে স্থানীয় শাসনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।[৩৬] বর্তমানে একটি উপজেলায় সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য উপজেলা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি এবং অন্যান্য কমিটির উপদেষ্টা হয়ে থাকেন, ফলে স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রম যা স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে হওয়ার কথা সেখানে সংসদ সদস্যদের শক্তিশালী মতামত ও প্রভাব লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশের বর্তমান ব্যবস্থায় সরকার গঠনকারী দল একটি কার্যকর ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থার অভাবের কারণে ঈর্ষণীয় পর্যায়ের ক্ষমতা ভোগ করেন যার

---

[৩১] বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৫ (১) (ক) ধারা অনুযায়ী ১৯৭৪ সালের ২২ জুলাই প্রণীত *সংসদীয় রুলস অব প্রসিডিওর (২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত হালনাগাদকৃত)*।

[৩২] Senator Lowell Murray, 'MPs, Political Parties and Parliamentary Democracy', *isuma*, Volume 1 N 2, Autumn 2000.

[৩৩] Philip Keefer and Razvan Vlaicu, *Democracy, Credibility and Clientelism*, Development Research Group, The World Bank, Policy Research Working Paper 3472.

[৩৪] U4 Anti-Corruption Resource Centre, 'Political Corruption', <http://www.u4.no> (accessed on 28 November 2006).

[৩৫] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, *The Local Government (Upazila Parishad and Upazila Administration) (Repeal) Ordinance, 1991, Ordinance No. 37 of 1991*। এটি *The Local Government (Upazila Parishad and Upazila Administration) Ordinance, 1982, (LIX of 1982)* রহিত করে প্রণয়ন করা হয়।

[৩৬] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৫৯।

ফলে "বিজয়ীরাই সবকিছু ভোগ করবে" — এই ধরনের মানসিকতার উদ্ভব ঘটে। এর ফলে বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের ক্ষমতা একেবারেই সংকুচিত হয়ে পড়ে। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তাদের ভূমিকা খুবই অপর্যাপ্ত থাকে যার প্রমাণ আমরা বিগত সংসদগুলোতে দেখতে পাই। বর্তমান ব্যবস্থায় প্রত্যাহার (recall), গণভোট (referendum), বা বিশেষ উদ্দেশ্যে সাধারণ সভা (extraordinary general meeting) করার সুযোগ নেই। নির্বাচনেও তাই জয়ের কোনো বিকল্প থাকে না। ফলে যেকোনো উপায়ে নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য প্রার্থীরা চেষ্টা চালান।[৩৭] এর অবশ্যম্ভাবী ফলাফল হিসেবে প্রার্থীদের নির্বাচনী সহিংসতা, নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘনসহ বিভিন্ন ধরনের কারচুপির আশ্রয় নিয়ে থাকতে দেখা যায়।

২.২ *জবাবদিহিতার ধারণা*

আভিধানিক সংজ্ঞা অনুসারে জবাবদিহিতা অর্থ জনপ্রতিনিধিদের ওপর অর্পিত ক্ষমতা ও দায়িত্বের ব্যাপারে অন্যান্য জন প্রতিনিধিদের কাছে জবাবদিহি করা, সমালোচনার প্রত্যুত্তরে পদক্ষেপ নেওয়া বা তাদের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করা, এবং ব্যর্থতা, অদক্ষতা বা মিথ্যাচারের জন্য দায় স্বীকার করা।[৩৮] আইনসভার সদস্যদের তাদের কাজের জন্য দলীয় হুইপ, তাদের দল বা তাদের ভোটারদের কাছে জবাবদিহি করতে হতে পারে। অন্যদিকে সরকারি মন্ত্রীরা এর বাইরেও সরকারি সিদ্ধান্তের জন্য বিশেষভাবে আইনসভা ও জনগণের কাছে দায়বদ্ধ। জবাবদিহিতার অর্থ শুধুমাত্র গর্হিত কাজের উন্মোচন নয়, বরং সরকারের সার্বিক কাজে ব্যক্তিগত ও দলগত আচরণ উন্নত করা। অভিযোগ এবং প্রশাসনিক কাজে ভুলের জন্য জবাবদিহি করার প্রথাগত ধারণার বাইরে জবাবদিহিতার একটি ইতিবাচক সংজ্ঞাও কেউ কেউ দিয়ে থাকেন যেখানে 'জবাবদিহিতা' অর্থ বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পর্ক বোঝায়। এখানে শুধুমাত্র ব্যর্থতার পরিণাম নয়, জবাবদিহিতার অর্থ উদ্দেশ্য পূরণ বা কার্যাবলীর মানদন্ডের ওপর একটি ধারণা।[৩৯] মনক্রিয়েফ (২০০১) এর সংজ্ঞা অনুযায়ী দুই ধরনের জবাবদিহিতা রয়েছে — *এক্স পোস্ট ফ্যাকটো* (ex post facto) এবং *এক্স অ্যানটি* (ex ante) (ইতিবাচক)।[৪০] *এক্স পোস্ট ফ্যাকটো* জবাবদিহিতা দ্বারা সরকারি কর্মকর্তাদের তাদের কাজের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা বোঝায়। অন্যদিকে *এক্স অ্যানটি* (ইতিবাচক) জবাবদিহিতা অর্থ শুধুমাত্র কার্যক্রমের ফলাফল নয়, বরং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান যেগুলোর কাজ করার কথা সেগুলোর নীতি নির্ধারণ ও লক্ষ্যের ওপর নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা। এই অর্থে এটি প্রক্রিয়ার সাথে জবাবদিহিতার সংশ্লিষ্টতা বোঝায়। এই কারণে এটি অর্জন করা আরও কঠিন। এটি কার্যকর করার অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে নির্বাচিত জন-প্রতিনিধিদের পক্ষে নাগরিকদের প্রয়োজন সম্পর্কে ধারণা রাখা। উল্লেখ্য, দুই ধরনের জবাবদিহিতাই ব্যাপক পর্যায়ের স্বচ্ছতা দাবি করে।

জবাবদিহিতা একই সাথে সব পর্যায়ে অর্জন করা সম্ভব নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সরকার (majoritarian) ব্যবস্থায় চারটি উপায়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়:[৪১]

১. সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় আইনসভা থেকে আমলাতন্ত্র উদ্ভূত এবং এর কাছে এমনভাবে দায়বদ্ধ যেন সংসদ সদস্যদের কাছে মন্ত্রীসভা (কেবিনেট) সমন্বিতভাবে দৈনিক কার্যক্রমের ভিত্তিতে জবাবদিহি করবে।
২. সাধারণ নির্বাচনে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দল তাদের কার্যক্রমের জন্য যৌথভাবে দায়বদ্ধ এবং তা অনুযায়ী ভোটারদের কাছ থেকে পুরস্কার বা তিরস্কার পেয়ে থাকে।
৩. স্থানীয় পর্যায়ের নেতৃত্ব, দলীয় নেতৃত্ব এবং আইনসভায় নিজ দলীয় হুইপদের কাছে সংসদ সদস্যরা তাদের ব্যক্তিগত কার্যক্রমের জন্য দায়বদ্ধ যেখানে নির্বাচনী এলাকাভিত্তিক সদস্য নির্বাচিত হয়, শক্তিশালী দলীয় শৃঙ্খলা থাকে এবং দলের ব্যাপ্তি বিশাল থাকে।
৪. যেসব সদস্য দলীয় নীতি সমর্থন করেন না বা ব্যক্তিগত পর্যায়ে ব্যর্থ বলে বিবেচিত, তারা পরবর্তীতে দলীয় মনোনয়ন নাও পেতে পারেন।

এর বাইরেও সংসদের প্রশ্নোত্তর, বাজেট আলোচনা, বিশেষ কমিটির প্রতিবেদন, নৈতিকতা কমিটির মাধ্যমে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়। তাছাড়া একজন সংসদ সদস্য তাঁর নির্বাচনী এলাকায় জন-সম্পৃক্ত থেকে, সংসদে বিভিন্ন বিষয় উত্থাপন করে, সরকারের কাছ থেকে বিভিন্ন বরাদ্দ চাওয়ার মাধ্যমে, সরকারের বিভিন্ন ব্যর্থতার ওপর সংসদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সর্বোপরি ব্যাকবেঞ্চার হিসেবে উপরোক্ত ভূমিকা পালন করতে পারেন।

---

[৩৭] Saadat Husain, *op cit*.

[৩৮] Ian McLean and Alistair McMillan (ed), *The Concise Dictionary of Politics*, New Delhi, Oxford University Press, 2006.

[৩৯] The Institute on Governance (undated), *The Exercise of Power: A Round Table Series on Accountability*.

[৪০] Joy Moncrieffe, 'Accountability: Idea, Ideals, Constraints', cited in *Developing Oversight Mechanisms: The Issue of Accountability*, Compendium of Good Practices on Security Sector Reform, <http://www.gfn-ssr.org/good_practice.cfm> (accessed on 4 Jan 2007).

[৪১] Pippa Norris, *Are Australian MPs in Touch with Constituents?*, Australian Democratic Audit, January 2004.

প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হচ্ছে রাষ্ট্র ও জনগণের মধ্যেকার শক্তিশালী যোগাযোগ। এটি নির্ভর করে কী ধরনের নির্বাচন পদ্ধতি ঐ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যবহৃত হয় এবং ঐ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্বর মাত্রা বা গুণ তার ওপর। সংসদ সদস্য ও ভোটারদের মধ্যেকার যোগাযোগের মাত্রা নির্ণয়ের একটি নির্দেশক হচ্ছে কোনো সংসদ সদস্যর সাথে কোনো এক বছরে ভোটারদের কোনো ধরনের যোগাযোগ হয়েছে কি না।[৪২] বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায় কারণ এর ফলে জনগণ ও সরকারের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকে। নির্বাচনের সময় জাতীয় পর্যায়ের চেয়ে স্থানীয় পর্যায়ের ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণ জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। সাধারণ জনগণ স্থানীয় পর্যায়ের আর্থিক দিক তদারকির ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করতে পারে।[৪৩]

২.৩ স্বচ্ছতার ধারণা

জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার অন্যতম প্রধান উপায় স্বচ্ছতা। স্বচ্ছতা বলতে খুব সাধারণভাবে বোঝায় উন্মুক্ততা (glasnost)। সরকারের পক্ষ থেকে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের ব্যাপারে জনগণ এবং বহির্বিশ্বকে তথ্য সরবরাহের আগ্রহ প্রতিফলিত হয়। উন্নত যোগাযোগের মাধ্যমে সরকারের ভেতরে, মন্ত্রণালয়ের মধ্যে এবং সরকার ও জনগণের মধ্যে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা যায়। এর জন্য প্রয়োজন জনগণের সাথে সরকারের যোগাযোগ যেখানে *এক্স পোস্ট ফ্যাকটো* জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে ভোটারদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। জনগণ পর্যাপ্ত তথ্য না পেলে এটি সম্ভব নয়। [৪৪]

২.৩.১ কার্যকর 'নৈতিক শাসন ব্যবস্থা'

নৈতিকতা বা 'Ethics' শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ 'ethos' থেকে। এর অর্থ চরিত্র, আচরণ এবং ব্যবহার। দর্শনগতভাবে নৈতিকতাকে "ভাল ও মন্দ, এবং নৈতিক দায়িত্ব ও আইনগত বাধ্যবাধকতা নিয়ে আলোচনা করে এমন একটি বিষয়" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। সাধারণভাবে বলতে গেলে নৈতিকতা ভুল অথবা সঠিক, ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক, কী হওয়া উচিত এবং কী উচিত নয় তা বোঝায়। নৈতিকতা প্রকৃতপক্ষে নৈতিক আচরণ অথবা মূল্যবোধ এবং মানদন্ডের একটি সমষ্টিগত ধারণা এবং তা অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি বা দলের নৈতিক আচরণের দিক-নির্দেশনা দেয়। সাধারণভাবে কোনো একটি নির্দিষ্ট পেশাজীবী দলের জন্য প্রযোজ্য একটি উচ্চ পর্যায়ের নৈতিকতার মানদন্ড সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রত্যাশা করা হয়, যাদের কাজ সরাসরি তাদের সেবা গ্রহীতাদের জীবনের সাথে জড়িত বলে মনে করা হয়। এই ধরনের পেশাজীবীদের মধ্যে আইনজীবী, চিকিৎসক, হিসাব রক্ষক, শিক্ষক ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

আইনসভা সুশাসন নিশ্চিত করা এবং দুর্নীতি হ্রাস করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জনগণ আশা করে সংসদ সদস্যরা তাদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে উঁচু পর্যায়ের নৈতিকতা প্রদর্শন করবেন,[৪৫] যদিও রাজনীতিবিদদের জন্য কোনো নির্দিষ্ট পেশাগত নৈতিক মানদন্ড নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। ওয়েনস্টকের (২০০২) মতে অন্যান্য পেশার মতো রাজনীতিবিদদের জন্য কোনো প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নেই। রাজনীতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের ধারণায় 'রাজনীতি কোনো পেশা নয়'। ওয়েইনস্টকের মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে নীতি-নৈতিকতা গুরুত্ব পায় না, বরং রাজনৈতিক ব্যবস্থার গঠন ও তুলনা, রাজনীতিবিদ ও ভোটারের আচরণ বিশ্লেষণ করা হয়। অন্যদিকে রাজনৈতিক দার্শনিকেরা মূল্যবোধ নিয়ে কাজ করেন, তবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তা কিভাবে বাস্তবায়িত হবে তা বাদ দিয়ে।[৪৬] তবে সংসদ সদস্য অথবা সরকারি চাকুরেদের নৈতিকতা অথবা মানদন্ড নির্ধারণ করা সহজ কাজ নয়। নৈতিকতা জীবনের কিছু নির্দিষ্ট মূল্যবোধকে তুলে ধরে। তবে শুধুমাত্র নৈতিক বিধিবিধানের মাধ্যমে মানব আচরণকে পরিবর্তনের দিকে চালিত করা যায় না। শুধুমাত্র সততা ও আন্তরিকতাই প্রশাসক এবং রাজনীতিবিদদের জাতির জন্য মঙ্গল করায় প্রভাবিত করতে পারে।

সংসদ সদস্যদের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য তাদের ওপর বিভিন্ন পর্যায়ে নানা ধরনের তথ্য সরবরাহের বিভিন্ন ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে মনোনয়নের পূর্বে তাদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ, নির্বাচনের পরে নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ, আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ, স্বার্থের দ্বন্দ্ব সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ ইত্যাদি।[৪৭] এই ধরনের তথ্য

---

[৪২] *প্রাগুক্ত*।

[৪৩] Stuti Khemani, *Decentralization and Accountability: Are Voters More Vigilant in Local than National Elections?*, Policy Research Working Paper 2557, Development Research Group, The World Bank, 2001.

[৪৪] কিভাবে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা যায় সেজন্য দেখুন Compendium of Good Practices on Security Sector Reform, *The Issue of Transparency*, <http://www.gfn-ssr.org/good_practice.cfm> (accessed on 04 Jan 2007).

[৪৫] 'Parliamentary Ethics and Accountability', <http://www.corisweb.org/article/articlestatic/473/1/320/> (accessed on 4 January 2007).

[৪৬] Daniel Weinstock, 'A Professional Ethics for Politicians', Canadian Federation for the Humanities and Social Sciences, Ottawa, October 2002.

[৪৭] Md. Awal Hossain Mollah, *Good Governance in Bangladesh: Role of Parliament*, Dept of Public Administration, University of Rajshahi (undated).

সংগ্রহ ও প্রকাশের জন্য একটি 'কার্যকর নৈতিক শাসন ব্যবস্থা'র (effective ethics regime) কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[৪৮] এই ধরনের নৈতিক শাসন ব্যবস্থা আইন প্রণেতাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রয়োজন। এই নৈতিক শাসন ব্যবস্থার মধ্যে 'নৈতিকতা বিধি' (Code of Ethics) ও 'আচরণ বিধি' (Codes of Conduct) অন্তর্ভুক্ত। তবে 'নৈতিকতা বিধি' ও 'আচরণ বিধি' এর মধ্যেকার পার্থক্য ও দুর্বোধ্যতার কারণে প্রায়ই একটি অপরটির ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীলভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[৪৯]

সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণ বিধি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি নতুন ধারণা হওয়া সত্ত্বেও এর জনপ্রিয়তা বাড়ছে। যথাযথ রাজনৈতিক আবহের অনুপস্থিতি, সংসদ সদস্যদের ভেতর দুর্বল ব্যক্তিগত সম্পর্ক, দলগুলোর মধ্যে একে অপরের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ ইত্যাদি বাস্তবতা রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ভিন্নভাবে চিন্তা করতে বাধ্য করে, যার ফলাফল এই আচরণ বিধি ধারণার উদ্ভব। সংসদ সদস্যরা একটি দেশের আইন প্রণয়নের সবোর্চ্চ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি। কিন্তু এই ধরনের সর্বোচ্চ ক্ষমতাও তারা যা পছন্দ করে তাই করার বা বা বলার অনুমোদন দেয় না। এই অবস্থা সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণ বিধি প্রণয়ন করতে আবশ্যিক করে তুলেছে। অনেক গণতান্ত্রিক দেশ তাদের সংসদ সদস্যদের জন্য ইতোমধ্যে আচরণ বিধি প্রণয়ন করেছে।

সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণ বিধি প্রণয়নের জন্য যেসব রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রয়োজন তার প্রতিটি বাংলাদেশেও বিদ্যমান। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের নাগরিক তথা ভোটারদের কাছে সংসদ সদস্যদের অধিক জবাবদিহি করে তোলা যায়। সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণ বিধি প্রণয়নের মাধ্যমে গণতন্ত্রের দুটি মৌলিক মূল্যবোধ – স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা – ভালভাবে নিশ্চিত করা যেতে পারে। সংসদ সদস্যদের জন্য প্রণীত এই আচরণ বিধি প্রাত্যহিক কাজে আইনসভার সদস্যদের জন্য উপযুক্ত বা যথার্থ আচরণের একটি দিক-নির্দেশনা দেয় যা ভোটারদের অনিশ্চয়তা দূর করতে সাহায্য করে। এটি সংসদ সদস্যদের কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে নৈতিক ও দায়িত্বপূর্ণ আচরণের ভিত্তি তৈরি করে, যা লঙ্ঘনে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ থাকে। এছাড়াও এটি জনগণকে তাদের দ্বারা নির্বাচিত জন-প্রতিনিধিদের কাছ থেকে কী ধরনের আচরণ আশা করতে পারে সেই ব্যাপারে সচেতন করে, যা পরবর্তীতে জনগণের আস্থা অর্জনে সংসদ সদস্যদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে।[৫০]

জনগণের তথ্যসমৃদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তাদের অধিকার সম্পর্কে জানার জন্য তথ্যের অবাধ প্রবাহ অত্যাবশ্যকীয়। তথ্যের অবাধ প্রবাহ সংসদের মতো কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংসদ সদস্যদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর এই তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে 'নাগরিক সনদ' একটি উল্লেখযোগ্য হাতিয়ার হতে পারে। নিচে নাগরিক সনদ সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হলো।

২.৪ *নাগরিক সনদের* (Citizen's Charter) *ধারণা*

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ"[৫১] এবং "সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য"[৫২]। সংবিধানের এই বাধ্যবাধকতা অনুসরণ করে সরকার জনগণকে নানা রকম সেবা দিয়ে থাকে যার মধ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষার মতো অত্যাবশ্যকীয় সেবা রয়েছে। এসব সেবার পেছনে সরকারের ব্যয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকে আসে। কাজেই একদিকে প্রজাতন্ত্রের মালিক হিসেবে, অন্যদিকে করদাতা হিসেবে এসব সেবার একটি নির্দিষ্ট মান প্রত্যাশা করার অধিকার জনগণের রয়েছে। অপরদিকে সরকারের সামর্থ্যেরও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যা বিবেচনায় রেখে যতদূর সম্ভব জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী তাদেরকে সেবা দেওয়া সরকারি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর অপরিহার্য কর্তব্য। এসব সেবা হওয়া উচিত জনগণের চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল, দক্ষতার সাথে পরিচালিত এবং অবৈধ লেনদেন বিবর্জিত। সেবা প্রদানের সময়সীমা ও ফি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এর পরিমাণ হওয়া উচিত যৌক্তিক।

'নাগরিক সনদ' সেবা প্রদানকারী সংস্থার পক্ষ থেকে উল্লিখিত ধরনের সেবা প্রদানের একটি ঘোষণাপত্র (declaration)। এটি সরকারি সেবার গুণগত ও পরিমাণগত মান সম্পর্কে জনগণ ও সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে এক ধরনের সমঝোতা স্মারক। নাগরিক সনদ একটি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কাদের কী ধরনের সেবা প্রদান করবে, কত সময়ের মধ্যে প্রদান করবে, কী পরিমাণ ফি এর বিনিময়ে প্রদান করবে, সেবার উৎকর্ষ সাধনে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং যথাযথভাবে সেবা না পেলে জনগণ কোথায় ও কী প্রক্রিয়ায় অভিযোগ দাখিল করবে তার বিবরণ সম্বলিত একটি দলিল যা জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়। তবে নাগরিক সনদ কোনো আইনগত দলিল (legal document) নয়। এটি নতুন কোনো অধিকারের জন্মও

---

[৪৮] Rick Stapenhurst and Riccardo Pelizzo, 'Legislative Ethics and Codes of Conduct', in *The Role of Parliament in Curbing Corruption*, Rick Stapenhurst, Niall Johnston and Riccardo Pelizzo (ed.), World Bank Institute, Washington, 2006.

[৪৯] *প্রাগুক্ত*।

[৫০] বাংলাদেশে আচরণ বিধি প্রণয়নের চাহিদা ও গুরুত্বের জন্য বিস্তারিত দেখুন এই প্রতিবেদনের অষ্টম অধ্যায়।

[৫১] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৭(১)।

[৫২] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ২১(২)।

দেয় না, বরং বিদ্যমান অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করে মাত্র। জনগণ কী পাওয়ার অধিকার রাখে অর্থাৎ সেবা প্রদানকারীরা কী দিতে বাধ্য তা-ই নাগরিক সনদের প্রতিপাদ্য বিষয়।[৫৩]

২.৪.১ নাগরিক সনদের উৎপত্তি

নাগরিক সনদের উৎপত্তি ১৯৯১ সালে যুক্তরাজ্যে। সে সময় দেশটিতে বেসরকারি সংস্থাগুলোর মানসম্পন্ন সেবার বিপরীতে সরকারি সংস্থাগুলোর অপেক্ষাকৃত অনুন্নত সেবা নিয়ে জনগণ প্রশ্ন তোলে।[৫৪] সরকারি সেবার মান ভাল না হওয়ার প্রেক্ষিতে সেই সেবার জন্য নাগরিকেরা করের মাধ্যমে যে অর্থ প্রদান করে তা কেন ফেরত পাবে না, যেমনটি কোনো বেসরকারি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান বা সেবা-সংস্থা ফেরত দেয়, এই প্রশ্নও উত্থাপন করে।[৫৫] মূলত এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাজ্যে নাগরিক সনদ কর্মসূচির সূত্রপাত হয়, যার মূল লক্ষ্য ছিল নাগরিকদের জন্য সরকারি সেবার গুণগত মানের অব্যাহত উৎকর্ষ সাধন করা, যেন তা ব্যবহারকারীদের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণে সক্ষম হয়।[৫৬] এই কর্মসূচির ছয়টি মূলনীতি নির্ধারণ করা হয়[৫৭]: (১) গুণগত মান, (২) পছন্দ, (৩) ন্যূনতম মান, (৪) মূল্য, (৫) জবাবদিহিতা, ও (৬) স্বচ্ছতা। ১৯৯৮ সালে একই কর্মসূচি 'সবার আগে সেবা' (Services First) নামে পুনরায় শুরু হয়। এ সময় নাগরিক সনদের নয়টি মূলনীতি নির্ধারণ করা হয়: (১) সেবার মান নির্ধারণ, (২) উন্মুক্ত থাকা ও পরিপূর্ণ তথ্য প্রকাশ, (৩) পরামর্শ ও অন্তর্ভুক্ত করা, (৪) সেবা গ্রহণ এবং পছন্দকে উৎসাহিত করা, (৫) সকলের সাথে ন্যায্য আচরণ করা, (৬) কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দিলে তা সংশোধন করা, (৭) সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা, (৮) নতুনত্ব আনয়ন ও উন্নয়ন সাধন করা, এবং (৯) অন্যান্য সেবা প্রদানকারীদের সাথে কাজ করা।[৫৮] সাধারণভাবে বলা যায়, যুক্তরাজ্যে নাগরিক সনদ প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য ছিল সরকারি সেবায় জনগণের প্রবেশাধিকার বাড়ানো এবং সেবার মানোন্নয়ন করা। পরবর্তীতে যুক্তরাজ্যের অনুসরণে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন নামে একই ধরনের কর্মসূচি চালু করে। এর কোনো কোনোটি পুরোপুরিভাবে যুক্তরাজ্যের আদলে, আবার কোনোটি কিছুটা ভিন্ন আদলে চালু হয়। [৫৯]

খান (২০০৮) বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে নাগরিক সনদের চারটি প্রধান উদ্দেশ্য চিহ্নিত করেন।[৬০]

১. জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের প্রত্যাশার সাথে সঙ্গতি রেখে সেবার মান নির্ধারণ এবং তাদের মতামত নিয়ে নির্দিষ্ট সময় পর পর তা নিয়মিত পুনর্নির্ধারণ, যেন অব্যাহতভাবে সেবার মানোন্নয়ন এবং সেবাকে জনবান্ধব করা সম্ভব হয়।
২. জনগণকে তাদের প্রাপ্য অধিকার সম্পর্কে তথ্য প্রদানের মাধ্যমে ক্ষমতায়িত করা যাতে তারা সেবা প্রদানকারীদের কাছে সেসব অধিকার দাবি করতে পারে এবং বিভিন্ন ব্যবস্থা (যেমন অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সেবা প্রদানকারীদের সামাজিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়।
৩. সেবা প্রদানকরীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন উদ্যোগের (যেমন সহায়তা কাউন্টার প্রতিষ্ঠা) মাধ্যমে তাদের আচরণের উন্নয়ন এবং প্রতিষ্ঠানে এক ধরনের সৌজন্যতার সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানো।
৪. সেবার মনোন্নয়ন, জনগণের অংশগ্রহণ, অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রভৃতি উদ্যোগের মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নাগরিক সনদ সংশ্লিষ্ট সেবা-সংস্থার প্রতি জনগণের আস্থা বৃদ্ধির সাথে সাথে সার্বিকভাবে সরকারের ওপর জনগণের আস্থা বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করে।

খানের (২০০৮) মতে সাধারণভাবে একটি নাগরিক সনদে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকা প্রয়োজন সেগুলো হচ্ছে (১) সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারী সংস্থার ভিশন ও মিশন, (২) সংশ্লিষ্ট আইন বা নীতি, (৩) সেবার বিবরণ ও মান, (৪) সেবা গ্রহীতাদের বিবরণ, (৫)

---

[৫৩] DARPG, *Citizen's Charter – A Handbook*, New Delhi, India, 26 August 2008. <http://goicharters.nic.in/cchandbook.htm>

[৫৪] Elke Loffler *et al, Improving Customer Orientation through Service Charters*, OECD/Ministry of Interior of the Czech Republic/Governance International, 2007, p 16.

[৫৫] Adam Smith Institute, 'Public Administration 53, Citizen's Charter: Consumer rights for public-services users', *Around the world in 80 Ideas*, London, 26 August 2008. <http://www.adamsmith.org/80ideas/idea/53.htm>

[৫৬] DARPG: *op cit.*

[৫৭] *প্রাগুক্ত*।

[৫৮] Cabinet Office of UK: "How to draw up a local charter", 18 Aug. 2008. <http://archive.cabinetoffice.gov.uk/servicefirst>

[৫৯] যেমন ফ্রান্স 'সার্ভিস চার্টার' (১৯৯২), স্পেন 'দি কোয়ালিটি অবজারভেটরি' (১৯৯২), বেলজিয়াম 'পাবলিক সার্ভিস ইউজারস চার্টার' (১৯৯২), মালয়েশিয়া 'ক্লায়েন্ট চার্টার' (১৯৯৩), পর্তুগাল 'দি কোয়ালিটি চার্টার ইন পাবলিক সার্ভিসেস' (১৯৯৩), কানাডা 'সার্ভিস স্ট্যান্ডার্ডস ইনিশিয়েটিভ' (১৯৯৫), অস্ট্রেলিয়া 'সার্ভিস চার্টার' (১৯৯৭) এবং ভারত 'সিটিজেনস চার্টার' (১৯৯৭) কর্মসূচি চালু করে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন আরিফ হোসেন খান, 'নাগরিক সনদ: কি, কেন ও কিভাবে', ১ সেপ্টেম্বর ২০০৮ তারিখে *মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন* এবং *ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ* এর যৌথ উদ্যোগে ব্র্যাক সেন্টার ইন এ আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত মূল প্রবন্ধ।

[৬০] আরিফ হোসেন খান, *প্রাগুক্ত*।

সেবার মানোন্নয়নে গৃহীত পরিকল্পনা, (৬) অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা, (৭) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, (৮) যোগাযোগের ঠিকানা, (৯) সেবা গ্রহীতাদের কাছ থেকে প্রত্যাশা, এবং (১০) সনদ প্রণয়ন/পর্যালোচনার তারিখ।

'নাগরিক সনদ' এর সংজ্ঞার মধ্যেই নিহিত আছে যে, এই সনদ নাগরিকদের জন্য এবং নাগরিকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমেই তৈরি করা হয়। নাগরিকদের সাথে আলাপ-আলোচনা না করে নাগরিক সনদ তৈরি করা হলে তাতে জনগণের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। নাগরিকদের অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ ছাড়া প্রণীত নাগরিক সনদের প্রতি নাগরিকদের মালিকানাবোধ সৃষ্টি হয় না। ফলে সেবা গ্রহীতাদের ক্ষমতায়ন এবং সেবাপ্রদানকারীদের সামাজিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার হাতিয়ার হিসেবে নাগরিক সনদ তেমন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে না। কাজেই নাগরিক সনদকে নিছক একটি কাগুজে বিষয়ে পরিণত না করে একটি চলমান দলিল (living document) হিসেবে দেখতে চাইলে অন্তত তিনটি ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ প্রয়োজন।[৬১] প্রথমত, নাগরিক সনদ প্রণয়নের আগে এতে কি কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত সে ব্যাপারে তাদের মতামত নেওয়া। দ্বিতীয়ত, প্রণয়নের পর এতে তাদের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটেছে কি না তা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে তাদের সাথে আলোচনা করা। তৃতীয়ত, নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিয়মিত (বছরে অন্তত একবার) নাগরিক সনদ পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনের জন্য জনগণের সাথে আলোচনা করা।

২.৫ *সংসদ ও সংসদ সদস্য সংক্রান্ত নাগরিক প্রত্যাশার সনদের যৌক্তিকতা*

জাতীয় সংসদ এবং এর সদস্যগণ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে প্রজাতন্ত্রের আইন-প্রণয়ন এবং রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত। সংসদে সরকারি দলের পরিকল্পনা ও বিরোধী দলের অংশগ্রহণের ওপর গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ নির্ভরশীল। এর জন্য সংসদে তাদের সক্রিয় উপস্থিতি অপরিহার্য। সংসদ সদস্যগণের সংসদে নিয়মিত উপস্থিতি, জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গঠনমূলক আলোচনা-সমালোচনা, আইন প্রণয়ন ও সংশোধন, এবং স্থায়ী কমিটির কার্যকর ভূমিকা পালনের মাধ্যমে তাঁরা জনগণের প্রতিনিধিত্ব, অংশগ্রহণ, সার্বভৌমত্ব, ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। সংসদ জাতীয় সততা ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারের জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সংসদীয় গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র সকল রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে জনগণের অংশগ্রহণ, মতামত ও স্বার্থ প্রতিফলিত করার লক্ষ্যে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মাধ্যমে সরকার প্রতিষ্ঠিত করা। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সদস্যরা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে প্রজাতন্ত্রের আইন-প্রণয়ন এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা পেয়ে থাকেন। সরকারের অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানের ন্যায় সংসদ পরিচালনা ব্যয়, সংসদ সচিবালয়ের বেতন-ভাতাদি এবং সংসদ সদস্যদের পারিশ্রমিক ও অন্যান্য ভাতা জনগণের দেওয়া করের অর্থ থেকে নির্বাহ করা হয়। তাই জনগণের কাছে সংসদের সার্বিক দায়বদ্ধতা রয়েছে।

২.৬ *বাংলাদেশের সংসদ সদস্য সংক্রান্ত আইন*

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি বাংলাদেশের সংবিধান। সংবিধানের পঞ্চম ভাগের প্রথম পরিচ্ছেদে সংসদ প্রতিষ্ঠা, নির্বাচনী এলাকার সংখ্যা, নারী সদস্য, সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা, সদস্যদের আসন শূন্য হওয়া, সংসদ সদস্যদের পারিশ্রমিক, দ্বৈত সদস্যতায় বিধিনিষেধ, সংসদের অধিবেশন, সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণ, সংসদের ওপর মন্ত্রীদের অধিকার, স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন, কার্যপ্রণালী বিধি, কোরাম, সংসদের স্থায়ী কমিটি, ন্যায়পাল, সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তি, এবং সংসদ সচিবালয় সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত।[৬২] সংবিধানের পঞ্চম ভাগের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রয়েছে আইন প্রণয়ন ও অর্থ সংক্রান্ত প্রক্রিয়া, এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা।

এর বাইরে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী, স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারসহ সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার, বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত আইন রয়েছে। সংসদ কিভাবে তার বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং সংসদ সদস্যদের এতে কী ভূমিকা থাকবে সেজন্য রয়েছে সংসদীয় কার্যপ্রণালী বিধি। সংসদ সদস্যদের জন্য প্রণীত বিভিন্ন আইন ও কার্যপ্রণালী বিধির বিভিন্ন ধারার ওপর আলোচনা পরবর্তী বিভিন্ন অধ্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে।

২.৭ *গবেষণায় আলোচিত বিষয়বস্তু*

উপরোক্ত আলোচনার ওপর ভিত্তি করে এই গবেষণায় কয়েকটি বিষয়কে চিহ্নিত করা যায়, যার ওপর ভিত্তি করে গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

---

[৬১] *প্রাগুক্ত*।

[৬২] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, পঞ্চম ভাগ, অনুচ্ছেদ ৬৫ থেকে ৭৯, (১৯৯৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সংশোধিত)।

প্রথমত, গবেষণায় জনগণ সংসদ সদস্যর যোগ্যতা ও জনগণের তথ্যে অধিকার নিয়ে কতটুকু সচেতন তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে একজন সংসদ সদস্যর যোগ্যতা কী হওয়া উচিত, ভোটাররা প্রার্থীর কোন্ যোগ্যতা দেখে ভোট দেন, সংসদ সদস্য সম্পর্কে জনগণের কোন্ কোন্ তথ্য জানার চাহিদা রয়েছে, সংসদ সদস্য প্রত্যাহারের ব্যবস্থা থাকা উচিত কিনা, এবং সংসদ সদস্যের সাথে জনগণ যোগাযোগ করতে চান কিনা এবং চাইলে কিভাবে ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, সংসদ সদস্যর ভূমিকা কী হওয়া উচিত তা এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে জনগণ কী ভূমিকায় সংসদ সদস্যদের দেখতে চান, সংসদ চলাকালীন সংসদ সদস্যদের উপস্থিতি কেমন থাকা উচিত, একনাগাড়ে সর্বোচ্চ ৮৯ কার্যদিবস অনুপস্থিত থাকলেও সংসদ সদস্যপদ অক্ষুণ্ন থাকাকে সমর্থন করেন কিনা, সংসদে অংশগ্রহণ না করে থাকলে পারিশ্রমিক ও ভাতা পাওয়া উচিত কিনা, সংসদ অধিবেশনে কোন্ ধরনের আচরণ বা ঘটনা প্রত্যাশিত নয়, নারী সদস্যদের নির্বাচন প্রক্রিয়া কেমন হওয়া উচিত ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয়ত, একটি কার্যকর সংসদ কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় তার মধ্যে সংসদের অধিবেশন প্রচার করা উচিত কিনা, সংসদের কার্যবিবরণী সকলের জন্য উন্মুক্ত হওয়া উচিত কিনা, আইন প্রণয়ন বা সংস্কার করার আগে জনগণের মতামত নেওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা, সংসদের নেতা ও বিরোধী দলীয় নেতার নিয়মিত উপস্থিত থাকা উচিত কিনা, সংসদের বাইরে এসে প্রতিবাদ করা উচিত কিনা, সংসদের বাইরে প্রতিবাদ করতে হলে তা কিভাবে করা উচিত ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থত, সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকাশে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা কী হতে পারে, তাদের কাছ থেকে কোন্ ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতি আশা করা হয়, রাজনৈতিক দলের কোন্ কোন্ বিষয় নিয়মিত প্রকাশ করা উচিত, রাজনৈতিক উচ্চতর পদে আসীনের ক্ষেত্রে পারিবারিক বন্ধন কতটুকু যৌক্তিক, নির্বাচনে মনোনয়ন দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ যোগ্যতাকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত, এবং নির্বাচনী প্রচারণা কিভাবে হওয়া উচিত ইত্যাদি এই গবেষণায় আলোচিত হয়েছে। সর্বোপরি সংসদ সদস্য ও সংসদ বিষয়ক নাগরিক সনদে জনগণ সংসদ ও সংসদ সদস্যদের কাছে কী প্রত্যাশা করে তাও এই গবেষণায় উঠে এসেছে।

অধ্যায় তিন
সংসদ সদস্যের যোগ্যতা

সংসদীয় গণতন্ত্রের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সংসদ সদস্যরা চালকের ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় এখনও গণতন্ত্রের ভিত দৃঢ় না হওয়ার পেছনে অন্যতম কারণ হিসেবে রাজনীতিক বিশ্লেষকরা যোগ্য প্রার্থী মনোনয়নে রাজনৈতিক দলের এবং উপযুক্ত সংসদ সদস্য নির্বাচনে জনগণের ব্যর্থতাকে দায়ী করেন। গত আটটি সংসদের প্রত্যাশা অনুযায়ী কার্যকর না হওয়া এ দেশের জনগণকে নতুন করে ভাবতে শেখায়। মাঠ-পর্যায় থেকে জরিপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, এফজিডি, কর্মশালা এবং বিশিষ্ট তথ্যদাতাদের বক্তব্যে সংসদ সদস্যদের সম্পর্কে স্পষ্টতই হতাশা ফুঠে উঠেছে এবং সংসদ সদস্যদের যোগ্যতার বিচারে নতুন কিছু মাপকাঠি উঠে এসেছে। জনগণ কেমন যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে সংসদে দেখতে চায় তা সংবিধান ও আইনের ভিত্তিতে জনগণের চাহিদা বিশ্লেষণ করে এ অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৩.১ সংসদ সদস্য নির্বাচনে জনগণ কী বিবেচনা করে

'এক ব্যক্তি এক ভোট' — এই রীতি অনুসারে দেশের সকল গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সংসদীয় ৩০০টি আসনের প্রার্থীরা জনগণের ভোট প্রাপ্তির আশায় নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের নির্বাচনী সংস্কৃতিতে জনগণের রায় পাওয়া সহজ কোনো সূত্র অনুসরণ করে না। নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রার্থীরা নানা কৌশল ব্যবহার করে, যার মধ্যে একদিকে ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি, দলীয় ভাবমূর্তি, দলের প্রতীক, ধর্মীয় মূল্যবোধ, সাম্প্রদায়িকতা, এলাকার উন্নয়নে অবদানের ইতিহাস, আঞ্চলিকতা, অর্থের প্রাচুর্য, এবং অন্যদিকে নির্বাচনে কারচুপি, জাল ভোট, ভোট কেনা, ভয়-ভীতি প্রদর্শন, ভোটকেন্দ্র দখল, সন্ত্রাসী কার্যক্রমের মাধ্যমে ভোট বাতিল ইত্যাদি পদ্ধতি অবলম্বন করার কথা উল্লেখ করা যায়। কিন্তু প্রার্থীর কোন্ যোগ্যতা তাকে নির্বাচনী বৈতরণী পার করতে সহায়তা করবে তা আগে থেকে বোঝা যায় না। তাই রাজনীতিতে অভিজ্ঞ, জ্ঞানী ও যোগ্য প্রার্থীর প্রার্থিতা বাজেয়াপ্ত হয়, অথচ দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত এবং কারাবাসরত প্রার্থী বিপুল ভোটে জয়ী হতে দেখা যায়। আবার অনেক বিদগ্ধ রাজনীতিক ক্ষমতায় থাকার সময় এলাকার ব্যাপক উন্নয়ন করার পরও পরবর্তী নির্বাচনে পরাজয় বরণ করেন।

[৬৩]"স্বামী যাকে ভোট দিবার কয় তাকে ভোট দেই।"
"মার্কা দেখে ভোট দিব, কায় দাঁড়ায় দাঁড়াইক।"

এ গবেষণায় জরিপে সাধারণ জনগণের কাছ থেকে তারা নির্বাচনে কোন্ কোন্ বিষয় বিবেচনা করে তা জনতে চাওয়া হয়। দেখা যায় জরিপে ৯০.১% প্রার্থীর সততা, ৫৭.৫% এলাকার অবকাঠামোগত উন্নয়নে প্রার্থীর অবদান, এবং ৪৫.১% প্রার্থীর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার কথা বিবেচনা করেন বলে জানান। এছাড়াও প্রার্থীর রাজনৈতিক দল, আঞ্চলিক পরিচয় এবং অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভোট দেওয়ার বিষয় সম্পর্কে বেশ কিছু উত্তরদাতা মত ব্যক্ত করেন। অন্যান্য (২%) যে সকল বিষয় বিবেচনা করেন তা হলো প্রার্থীর চরিত্র, শিক্ষাগত যোগ্যতা, ধর্মীয় মূল্যবোধ, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি।

সারণি ৩.১: ভোট দেওয়ার আগে বিবেচ্য বিষয়

ভোট দেওয়ার আগে ভোটার যা বিবেচনা করে	*সংখ্যা*	*শতকরা হার*
প্রার্থীর সততা	২৮৮২	৯০.১
এলাকার অবকাঠামোগত উন্নয়নে অবদান	১৮৪০	৫৭.৫
রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা	১৪৪৪	৪৫.১
রাজনৈতিক দল / দল প্রধান / প্রতীক	৮৪৮	২৬.৫
নিজ এলাকার প্রার্থী	৭১৪	২২.৩
প্রতিশ্রুতি	৬৯২	২১.৬
অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে	৩১	১.০
অন্যান্য	৪২	২.০
জানি না	২৩	০.৭

** একাধিক উত্তর প্রযোজ্য*

সম্প্রতি রাজনীতিতে দুর্নীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। কারণ দুর্নীতির দায়ে বৃহৎ দুটি রাজনৈতিক দলের বেশ কয়েকজন সাবেক মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যকে আটক করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়, যার প্রভাব পড়ে জনগণের মধ্যেও। তারা জানতে পারেন যে তাদের ভোটে নির্বাচিত জন-প্রতিনিধিরা

[৬৩] প্রতিবেদনের প্রতিটি অধ্যায়ে প্রদত্ত বক্সে জরিপকালীন তথ্যদাতাদের মন্তব্য তুলে ধরা হয়েছে।

ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে কতটা ব্যক্তিগত আর্থিক উন্নতি করেছে আর বঞ্চিত করেছে জনগণকে, বাধাগ্রস্ত করেছে উন্নয়নের গতিকে। জনগণের কাছ থেকে জানা যায়, প্রার্থীর সততার বিষয়টি তাদের কাছে চূড়ান্ত বিবেচ্য হওয়ার পেছনে বর্তমানের দুর্নীতি-বিরোধী প্রেক্ষাপট প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। এর বাইরে প্রার্থীদের কিছু নেতিবাচক দিক ভোটাররা বিবেচনা করে থাকেন। এর মধ্যে প্রার্থী অপরাধী কিনা, বিল ও ঋণ খেলাপি কিনা, সন্ত্রাসী ও কালো টাকার মালিক কিনা, এবং যুদ্ধাপরাধী ও সাম্প্রদায়িক কিনা এই বিষয়গুলো বিবেচ্য।

৩.২ সংসদ সদস্যের যোগ্যতা: আলোচনার প্রেক্ষাপট

গণতন্ত্রের প্রবক্তাদের মতে, জনগণের ইচ্ছানুযায়ী দেশ শাসনই গণতন্ত্র। তত্ত্বগতভাবে গণতন্ত্রে জনগণের মতামত ও সংগঠনের অবাধ অধিকারকে স্বীকার করা হয়। আব্রাহাম লিংকনের মতে, "গণতান্ত্রিক সরকার হল জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকার এবং জনগণের জন্য গঠিত সরকার"।[৬৪] সংসদীয় গণতন্ত্রে জনগণ তার নিজের সরকার প্রতিষ্ঠায় ভোট দানের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করে, যাঁরা জাতীয় সংসদের মাধ্যমে জনগণের কথা তুলে ধরবে। তাই সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদের গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ইতিহাস তেমন পুরানো নয়। স্বাধীন বাংলাদেশের যাত্রা একটি সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শুরু হলেও পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি শাসিত সংসদীয় ব্যবস্থা ও সামরিক শাসন সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে অন্তরায় হিসেবে কাজ করেছে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের নবযাত্রা শুরু হয় ১৯৯১ সালে নির্বাচিত পঞ্চম সংসদ থেকে। এর পর পঞ্চম থেকে অষ্টম সংসদে উল্লেখযোগ্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় যা থেকে সংসদে নমনীয় ও সৃষ্টিশীল আচরণ ও মনোভাবের প্রকাশ ঘটে। সংসদীয় নির্বাচনে কারচুপি, বিশেষ দলের প্রতি সরকার বা নির্বাচন কমিশনের আনুগত্য, সরকারি আমলাতন্ত্রকে উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে কাজে লাগানো ইত্যাদি নানা অভিযোগ উঠলেও গণতন্ত্র ও সংসদীয় ব্যবস্থার প্রতি এদেশের মানুষের দৃঢ় আশাবাদ থাকায় দেশে একটি গণতান্ত্রিক আবহ গড়ে উঠেছে, সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সংসদের মতো গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো, ধীর গতিতে হলেও, পরিপক্কতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে কারণ তাদের মনোনীত প্রার্থীরা সংসদে প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ ধীরগতির হওয়ায় তাদের মনোনীত প্রার্থীরা প্রকৃতই জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে কিনা এই প্রশ্নটি প্রায়শ উত্থাপিত হয়। স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি, ব্যক্তি বা দলীয় ভাবমূর্তির ওপর ভর করে জাতীয় নির্বাচনে প্রার্থীরা জনগণের ম্যান্ডেট পায়। অথচ তাঁদের বিভিন্ন অসংসদীয় আচরণ — সংসদে ক্রমাগত অনুপস্থিত থাকা, সংসদে এলাকার সমস্যার কথা তুলে না ধরে দলীয় নেতা-নেত্রীর অতি প্রশংসা করা, সংসদে অগঠনমূলক ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করা, আইন প্রণয়ন বা সংশোধনে অংশগ্রহণ না করা, বিরোধী দলের সমালোচনায় ব্যস্ত থাকা, সংসদে হট্টগোল, কটূক্তি সর্বোপরি রাজনৈতিক অসহনশীলতা — একদিকে যেমন সংসদকে অকার্যকর করছে, অন্যদিকে সংসদে জনগণের রাজস্বের ব্যাপক অপচয় হচ্ছে।[৬৫] এ প্রেক্ষাপটে জনগণ ও দেশের স্বার্থে সংসদ সদস্যদের যোগ্যতা ও দায়বদ্ধতার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

৩.৩ সংসদ সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা: সাংবিধানিক ও আইনগত ভিত্তি

সংবিধানের ৬৬ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদ সদস্য হওয়ার যোগ্যতা হিসেবে একজন ব্যক্তির ন্যূনতম বয়স হতে হবে পঁচিশ (২৫) বছর, এবং বাংলাদেশের নাগরিক। সংবিধানের ৬৬ (১) (২) অনুচ্ছেদে গণতন্ত্রের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের প্রতিফলন ঘটেছে। প্রতিটি নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় জনগণের প্রতিনিধির যোগ্যতা নিরূপণ করা হয়েছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, শিক্ষা, বংশ, মর্যাদা ইত্যাদি বিষয়ের উর্ধ্বে উঠে বাংলাদেশের সকল নাগরিকের জনগণের প্রতিনিধি হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

অন্যদিকে অনুচ্ছেদ ৬৬ (২) অনুযায়ী সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়া বা সংসদ সদস্য থাকার অযোগ্যতা হচ্ছে কোনো উপযুক্ত আদালত থেকে অপ্রকৃতিস্থ ঘোষণা করা, দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ার পর দায় থেকে অব্যাহতি না পাওয়া, বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করা অথবা কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করা, নৈতিক স্খলনজনিত কোনো ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে ন্যূনতম দুই বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত হওয়া এবং মুক্তিলাভের পর পাঁচ বছর অতিক্রান্ত না হওয়া, প্রজাতন্ত্রের কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকা, এবং কোনো আইনের দ্বারা নির্বাচনের জন্য অযোগ্য ঘোষিত হওয়া। এর বাইরেও সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সরকারের সাথে কোনো ধরনের লেন-দেনের

[৬৪] হারুনুর রশীদ, *রাজনীতিকোষ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯।
[৬৫] বিস্তারিত জানতে দেখুন তানভীর মাহমুদ, *গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে অষ্টম জাতীয় সংসদ (২০০১-২০০৬)*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০০৭।

সম্পর্ককে অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[৬৬] এছাড়াও সর্বশেষ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধিত) ২০০৮ অনুযায়ী দেশ বা দেশের বাইরের কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ঘোষিত যুদ্ধাপরাধী, সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে বিলখেলাপি, এবং ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে গৃহীত ঋণের খেলাপিরাও সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবে না।[৬৭] এছাড়া সংসদ সদস্যপদ বিভিন্ন কারণে শূন্য হতে পারে। সংবিধানের ৬৭ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোনো সংসদীয় আসন শূন্য হবে যদি নির্বাচনের পর নব্বই (৯০) দিনের মধ্যে নির্বাচিত ব্যক্তি শপথ গ্রহণ করতে বা শপথনামায় স্বাক্ষর করতে অসমর্থ হন, বা সংসদের অনুমতি না নিয়ে একাধারে নব্বই (৯০) কার্যদিন সংসদে অনুপস্থিত থাকেন, বা সংসদ ভেঙ্গে যায়, বা অনুচ্ছেদ ৬৬ (২) এর অধীনে অযোগ্য হয়ে যান, বা সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে বর্ণিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এছাড়াও কোনো সংসদ সদস্য স্পিকারের কাছে নিজ স্বাক্ষরযুক্ত চিঠির মাধ্যমে পদত্যাগ করতে পারবেন [অনুচ্ছেদ ৬৭ (২)]।

৩.৪ সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা: জনগণের প্রত্যাশা

স্বাধীনতার দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বাংলাদেশের মানুষ আটটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দিয়ে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেছে। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এখন পর্যন্ত জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাঁদের অসংসদীয় আচরণ, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতার অভাব, দুর্নীতি, কর্মকাণ্ডে অস্বচ্ছতা, জনগণের সাথে দূরত্ব ইত্যাদি কারণে জনগণের মধ্যে হতাশা বেড়েছে। আর এই হতাশার পেছনে অন্যতম কারণ সংসদ সদস্যদের যোগ্যতার অভাব।

সংসদ সদস্যদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা: জরিপে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জনগণ সংসদ সদস্যপদে প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। তারা মনে করে জনগণের প্রতিনিধি হতে গেলে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন। জরিপে দেখা যায় ৮৫.৪% উত্তরদাতা সংসদে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষকে দেখতে চায়। অন্যদিকে মাত্র ১.৩% উত্তরদাতা সংসদ সদস্য হতে কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রাসঙ্গিক নয় বলে মনে করেন।[৬৮]

সারণি ৩.২: সংসদ সদস্যর ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা কেমন হওয়া উচিত: জনগণের প্রত্যাশা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	*সংখ্যা*	*শতকরা হার*
প্রাথমিক	১৯	০.৬
মাধ্যমিক	১০০	৩.১
উচ্চ মাধ্যমিক	২৪৮	৭.৮
স্নাতক	১২৫৪	৩৯.২
স্নাতকোত্তর	১৪৭৬	৪৬.২
কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রাসঙ্গিক নয়	৪২	১.৩
জানি না	৫৬	১.৮
মোট	৩১৯৫	১০০.০

সংসদ সদস্যরা আইনপ্রণেতা হিসেবে তাঁদের আইনসহ বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞান থাকা, দেশে ও বিদেশে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করতে প্রজ্ঞা, কূটনৈতিকতা ও দূরদর্শিতা, জনগণের রোল মডেল হিসেবে সৎ, চরিত্র ও আদর্শবান, দেশপ্রেমিক এবং অসাম্প্রদায়িক হতে হবে। সংসদ সদস্যদের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে আইন পর্যালোচনা, বিলের খসড়া তৈরি, স্থায়ী কমিটিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন কাজের তদারকি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ইত্যাদি দাপ্তরিক কাজ করতে হয়। আর এ সকল বিষয়ে পারদর্শী হতে গেলে তাঁদের সুশিক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না।

অন্যদিকে মাওলানা ভাসানী, জন মেজরসহ বিভিন্ন দেশের সফল জন-প্রতিনিধিদের যোগ্যতা বিবেচনা করে জন-প্রতিনিধি হওয়ার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নয় বলে প্রমাণ করা যায়। এক্ষেত্রে একজন সংসদ সদস্যের প্রধান যোগ্যতা হওয়া উচিত দেশ ও জনগণকে বোঝা। গণতন্ত্র, সংবিধান, দেশপ্রেম, উন্নয়ন চিন্তা, ধর্মনিরপেক্ষতা, মানুষের সমতা, মানুষের অনুভূতি এসব বিষয় অনুধাবন করতে শিক্ষাগত যোগ্যতার দরকার নেই। প্রতিটি মানুষ তার সহজাত প্রজ্ঞা দিয়ে বিষয়গুলোতে পারদর্শী হতে পারেন। সুতরাং একজন সংসদ সদস্য হতে গেলে বাংলাদেশের সংবিধান মোতাবেক শর্তাদি অনুসরণ করলেই চলবে, শিক্ষাগত যোগ্যতার মতো বিষয়কে সংযুক্ত করলে দেশের নাগরিকের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হবে। এছাড়াও বাংলাদেশের সংসদ অকার্যকর হওয়ার পেছনে বা সংসদে অনুপস্থিত থেকে কোরাম সংকট তৈরিতে শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীন

---

[৬৬] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ* ১৯৭২, অনুচ্ছেদ ১২ (১) (খ)।

[৬৭] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008*।

[৬৮] উল্লেখ্য, অষ্টম জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্যদের মধ্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ২৬৮ জন (৮৯.৩%), উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা ১৬ জন (৭.৭%), এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীন ২ জন (০.৭%)। ***সূত্র:*** ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, *পার্লামেন্ট ওয়াচ*, ২০০৩, পৃ. ৩৩।

সদস্যদের ভূমিকা ছিল এটা বলা যাবে না। শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন সদস্যরাও বিভিন্ন ধরনের অসংসদীয় আচরণ করেছেন এবং জনগণের রায়ের প্রতি মর্যাদা দেখিয়ে দেশকে এগিয়ে নিতে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি।

সংসদ সদস্যদের পেশা: বাংলাদেশের সংবিধানে, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে বা সংসদীয় কার্যপ্রণালী বিধিতে কোন্ পেশাজীবী সংসদ সদস্য হবেন তা সম্পর্কে কিছু বলা নেই। এ থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় সংসদ সদস্য হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কোন পেশার প্রতিনিধির প্রয়োজন নেই। যে কোন পেশাজীবী জাতীয় সংসদে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন। তবে উল্লেখ্য, সংবিধান ও আইন অনুযায়ী সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সরকারের সাথে কোনো ধরনের লেন-দেনের সম্পর্ককে অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[৬৯]

> "এমপি হতে শিক্ষা কোন ফ্যাক্টর নয়, অশিক্ষিত লোকও ভাল এমপি হতে পারে।"
>
> "এমপি হবে যারা গ্রামের ছেলে লেখাপড়া করে বড় হইছে। কারণ তারা সব পর্যায়ের মানুষের মনোভাব বুঝতে পারবে। আর বড়লোক এমপি হইলে তারা খালি বড় লোকদের মনোভাব বুঝবে।"
>
> "ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। তাই পেশা কোন ব্যপার নয়। ভাল লোক যে কোন পেশার হলেই চলে।"
>
> "এমপি অবশ্যই সুশিক্ষিত হওয়া চাই। আমাদের এমপি নৈশ স্কুলকে ৯০০ স্কুল বলেছিল।"

সংসদে যোগ্য প্রতিনিধিত্বের অভাবের পেছনে রাজনীতির বাণিজ্যকরণকে অনেকে দায়ী করেন। সদ্য অবসরপ্রাপ্ত সরকারি আমলা, বিদেশ থেকে আগত পেশাজীবী বা ব্যবসায়ীরা রাজনীতির অভিজ্ঞতা না নিয়ে বা জনগণের চাহিদা না বুঝে বা দেশের স্বরূপ উদ্ঘাটন না করে দলীয় মনোনয়ন পেয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে যাচ্ছেন। সর্বশেষ সংসদে ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিত্ব বেশি ছিল।[৭০] ব্যবসায়ী সংসদ সদস্যরা নিজস্ব ব্যবসায়িক প্রয়োজনে সংসদে অনুপস্থিত থেকেছেন বেশি এবং সংসদ সদস্য হিসেবে প্রাপ্ত কর্তৃত্ব খাটিয়ে নিজ নিজ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেছেন বলে অনেক তথ্যদাতা মত দেন। এর ফলে একদিকে প্রকৃত রাজনীতিকরা দীর্ঘ সময় জনগণের সাথে থেকেও তাদের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পায় না, অন্যদিকে ব্যবসায়ী সংসদ সদস্যরা সংসদীয় ভূমিকাকে গৌণ হিসেবে বিবেচনা করায় সংসদ অকার্যকর হয়ে পড়ে, কোরাম সংকট হয়, সর্বোপরি জনগণের সাথে তাদের দূরত্ব বেড়ে যায়।

জরিপেও সাধারণ জনগণের কাছে থেকে প্রাপ্ত জরিপের ফলাফলে সংসদ সদস্য হিসেবে ব্যবসায়ীদের বেছে নিতে দেখা গেছে খুব কম (৮.৪%)। অধিকাংশ মুখ্য তথ্যদাতার মতো বেশিরভাগ উত্তরদাতা (৩৫.৪%) যেকোনো সৎ ও বৈধ পেশার অধিকারীই সংসদ সদস্য হতে পারেন বলে তাদের মত দেন। এর পরে ২০.৪% উত্তরদাতা সংসদ সদস্যর প্রধান পেশা হিসেবে আইন ব্যবসাকে বেছে নিয়েছেন। এফজিডি'র মাধ্যমে জানা যায়, সংসদ সদস্যদের প্রধান দায়িত্ব আইন প্রণয়ন হওয়াই আইন ব্যবসার সাথে জড়িত ব্যক্তিরা যথার্থ ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে তারা মনে করেন। এছাড়াও জরিপ ও এফজিডির উত্তরদাতারা অর্থনীতিবিদ, কৃষক, প্রকৌশলী, ডাক্তার পেশাজীবীদের সংসদ সদস্য হিসেবে দেখতে চান। তাদের মতে, সংসদে বিভিন্ন পেশাজীবীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা গেলে অধিক হারে জনগণের কথা সংসদে তুলে ধরা সম্ভব হবে।[৭১]

সারণি ৩.৩: সংসদ সদস্যদের মুখ্য পেশা কী হওয়া উচিত

পেশা	*সংখ্যা*	*শতকরা হার*
যে কোন পেশা	১১২২	৩৫.৪
আইনজীবী	৬৪৮	২০.৪
শিক্ষক	৫৪৮	১৭.৩
অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা	২৮৪	৯.০
ব্যবসায়ী	২৬৮	৮.৪
অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা	১০৭	৩.৪
অন্যান্য	৩৫	১.১
জানি না	১৬১	৫.১
মোট	৩১৭৩	১০০.০

সংসদ সদস্যর নির্বাচনী এলাকা: বাংলাদেশে সংসদীয় আসন ব্যবস্থা ভিত্তিক নির্বাচন হয়ে থাকে। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী একটি সংসদীয় এলাকায় একজন ভোটার একজন প্রার্থীকে একটি ভোট দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। অন্যদিকে একজন

[৬৯] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ* ১৯৭২, অনুচ্ছেদ ১২ (১) (খ)।

[৭০] বিস্তারিত জানতে পড়ুন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত ধারাবাহিক প্রতিবেদন "পার্লামেন্ট ওয়াচ"।

[৭১] অষ্টম সংসদের সদস্যদের মধ্যে ব্যবসায়ীর হার সবচেয়ে বেশি (৫৮%), এর পরেই ছিলেন আইনজীবী (১১.৭%), শিক্ষক (৭%), রাজনীতিক (৭%), এবং কৃষক (৪.৩%)। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন তানভীর মাহমুদ, *পার্লামেন্ট ওয়াচ ২০০৫: অষ্টম জাতীয় সংসদের পঞ্চদশ-ঊনবিংশতিতম অধিবেশন*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০০৫, পৃ. ৪৪।

প্রার্থী যে কোন নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন।[৭২] তারা আইন প্রণেতা হিসেবে দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য অবদান রাখবেন। এই সংবিধানে একজন ব্যক্তির একাধিক আসনে এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ (২০০৮ সালে সয়শোধিত) মোতাবেক একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ তিনটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। তবে কোনো ব্যক্তি একই সময়ে দুই বা ততোধিক নির্বাচনী এলাকার সংসদ-সদস্য হইবেন না।[৭৩] কোনো প্রার্থী একাধিক আসনে নির্বাচিত হলে ত্রিশ দিনের মধ্যে তিনি কোন্ নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব করতে ইচ্ছুক, তা জানিয়ে নির্বাচন কমিশনকে একটি স্বাক্ষরযুক্ত ঘোষণা প্রদান করলে তাঁর অন্য নির্বাচনী এলাকার আসনগুলো শূন্য হয়ে যায়।[৭৪]

বাংলাদেশের রাজনীতিতে ও নির্বাচনী সংস্কৃতিতে সাধারণ জনগণের সাথে সংসদীয় নির্বাচনের প্রার্থীদের সম্পর্ক একেবারে ভিন্ন। নির্বাচনে ব্যক্তিগত বা দলীয় ভাবমূর্তি, দলের প্রতীক, স্থানীয় পর্যায়ের অবকাঠামোগত ও ব্যক্তিগত উন্নয়নে জন-প্রতিনিধির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্ববহ। দেশের আপামর জনসাধারণ সংসদ সদস্যর প্রকৃত দায়িত্ব পালন নিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই উদাসীন, তারা অনেক সময়ই স্থানীয় পর্যায়ে সংসদ সদস্য কতটা ভূমিকা পালন করছেন, কতটা জনসাধারণের কাছাকাছি আসতে পারছেন এ বিষয়গুলি বিবেচনা করে নির্বাচনে ভোট দিয়ে থাকেন। তারা মনে করেন, তারা ভোট দিচ্ছেন তাদের এলাকার উন্নয়নের জন্য। কিন্তু স্থানীয় সরকারের ভূমিকার সাথে সংসদ সদস্যের ভূমিকার পার্থক্য তারা করেন না। অন্যদিকে সংসদ সদস্যরাও নির্বাচনে জয়ী হওয়ার প্রত্যাশায় জনগণের মাঝে এরূপ মানসিকতা বা চাহিদা তৈরি করেছেন যে তিনি নির্বাচিত হলে জনগণের এবং এলাকার সব সমস্যার সমাধান করে দিবেন। বাস্তবে একজন সংসদ সদস্যর পক্ষে সব ধরনের প্রতিশ্রুতি পালন সম্ভব হয় না বা প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের এখতিয়ারও নেই।

জরিপকালে প্রায় প্রতিটি এলাকা থেকে সংসদ সদস্য সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থতার অভিযোগ এসেছে। আর এর সাথে যুক্ত হয়েছে ভিন্ন এলাকা থেকে এসে নির্বাচিত হয়ে সংসদ সদস্যর এলাকার সমস্যার কথা সংসদে তুলে না ধরা, এলাকায় না আসা বা এলাকার জনসাধারণের সাথে সম্পর্ক না রাখা। জরিপে দেখা যায় প্রায় ৮৭% উত্তরদাতা সংসদ সদস্য হিসেবে নিজ এলাকার বাসিন্দাদের দেখতে চান।

সারণি ৩.৪: সংসদ সদস্য কোন্ এলাকার বাসিন্দা হওয়া উচিত

এলাকা	*সংখ্যা*	*শতকরা হার*
নিজ এলাকা	২৭৭৮	৮৬.৯
যে কোন এলাকা	৪১১	১২.৯
জানি না	৯	০.৩
মোট	৩,১৯৮	১০০.০

এ ব্যাপারে কিছু মুখ্য তথ্যদাতা মনে করেন, সংসদ সদস্যরা যেহেতু নির্দিষ্ট একটি এলাকা থেকে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন তাই সেই এলাকায় তার পরিচিতি প্রয়োজন, সেই এলাকার মানুষ সম্পর্কে তার সম্যক ধারণা প্রয়োজন, সেই এলাকার সমস্যা, অভাব, অভিযোগ সংসদে তুলে ধরা প্রয়োজন, এলাকার সমস্যার সমাধানে জোরালো ভূমিকা রাখা প্রয়োজন, নিজ কর্মের জন্য জনগণের কাছে জবাবদিহি করা প্রয়োজন, এলাকার মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখা প্রয়োজন, এলাকার উন্নয়ন কাজ তদারকি করা প্রয়োজন। কিন্তু স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার স্বার্থেই তাদের কাজে হস্তক্ষেপ করার মানসিকতা বর্জন করা প্রয়োজন।

অন্যদিকে সংসদ সদস্যর জাতীয় পর্যায়ের নেতা হওয়ার প্রতি জোর দিয়েছেন বেশ কয়েকজন মুখ্য তথ্যদাতা। তাঁরা মনে করেন, সংসদ নির্বাচন প্রার্থী একটি অঞ্চলের বাসিন্দা হয়েও নিজ এলাকায় বা বাংলাদেশের যেকোনো প্রান্তে নির্বাচন করতে পারেন। নির্বাচনে দলের ইশতেহার বা জাতীয় পর্যায়ের প্রতিশ্রুতি প্রদানের মাধ্যমে জনগণের রায় নিবেন এবং নির্বাচিত হয়ে জাতীয় স্বার্থে বা ইস্যুতে কাজ করবেন। একটি নির্দিষ্ট এলাকার স্বার্থ চরিতার্থ করতে তিনি কোন ভূমিকা রাখবেন না। এ দায়িত্ব ছেড়ে দিতে হবে স্থানীয় সরকারের হাতে। এ প্রসঙ্গে তাঁরা উদাহরণ দিয়ে বলেন, অতীতে কোন কোন মন্ত্রী শুধুমাত্র নিজ এলাকায় উন্নয়নে ব্যাপক তৎপর ছিলেন, এলাকার প্রয়োজন না থাকলেও অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, যেখানে দেশের অন্যান্য প্রান্তে প্রয়োজনীয় কাজ বা সংস্কার সাধন করেননি। একজন জন-প্রতিনিধি একটি নির্দিষ্ট এলাকার জনগণের রায়ে

[৭২] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৬৫ (২) ও (৩)। অনুচ্ছেদ ৬৫ (৩) অনুযায়ী "সংবিধান (দশম সংশোধন) আইন, ১৯৯০ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে শুরু করিয়া দশ বৎসরকাল অতিবাহিত হইবার পরবর্তীকালে সংসদ ভাংগিয়া না যাওয়া পর্যন্ত ত্রিশটি আসন কেবল মহিলা-সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাঁহারা আইনানুযায়ী পূর্বোক্ত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন। তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার কোন কিছুই এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন কোন আসনে কোন মহিলার নির্বাচন নিবৃত্ত করিবে না"।

[৭৩] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৭১ (১) (ক)।

[৭৪] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৭১ (১) (ক)।

সংসদে গেলেও নির্বাচিত হয়ে তিনি জাতি, ধর্ম, দল, বর্ণ, গোত্র ভেদে সমগ্র জাতির উন্নয়নে ভূমিকা রাখবেন। এর মাধ্যমে দেশের গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে তারা যেমন দেশে ও বিদেশে দেন-দরবার করতে পারবেন, অন্যদিকে দেশের দুর্বল স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী হবে।

স্থানীয় পর্যায়ে রাজনীতির অভিজ্ঞতা: প্রতিটি রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রে তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত কমিটি ব্যবস্থা রয়েছে। দলের মধ্যে গণতন্ত্র চর্চার অংশ হিসেবে প্রতিটি পর্যায়ে নির্বাচনের মাধ্যমে নেতা নির্ধারিত হয়। সকল দলের বে শিরভাগ জাতীয় পর্যায়ের নেতাই মাঠ পর্যায় থেকে উঠে এসেছেন। দেশের আপামর জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায়, জনগণের সমস্যার সমাধানে, দেশের সংকট মুহূর্তে এবং স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলনে নিজের জীবনের চিন্তা না করে জনগণের পাশে থেকে রাজনীতি করেছেন। এজন্য তাদের কারারুদ্ধ হতে হয়েছে, এমনকি মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয়েছে। কিন্তু এর ব্যতিক্রমও দেখা গেছে। কোনরূপ রাজনীতির অভিজ্ঞতা না থেকেও জনগণের সমস্যা সম্পর্কে অবগত না হয়েও, দেশ সম্পর্কে না জেনেও অনেক ব্যবসায়ী, অবসরপ্রাপ্ত আমলা, সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তা দলের মনোনয়ন পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। এই বাস্তবতা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় জনগণের মধ্যে এ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। তারা মনে করেন, একজন সংসদ সদস্যর রাজনীতির অভিজ্ঞতা না থাকলে তারা এলাকার মানুষের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না, দেশের মানুষের প্রতি সহমর্মিতা আসতে পারে না, দেশের উন্নয়নে প্রকৃত পদক্ষেপ নিতে পারেন না। জরিপে দেখা যায় ৯১% উত্তরদাতা সংসদ সদস্যর রাজনীতির অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন।

সারণি ৩.৫: স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতির অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে কিনা

অভিজ্ঞতা	*সংখ্যা*	*শতকরা হার*
প্রয়োজন আছে	২৯০৯	৯১.০
প্রয়োজন নেই	১৭৫	৫.৫
জানি না	১১২	৩.৫
মোট	৩১৯৬	১০০.০

রাজনীতিতে অর্থের প্রভাব প্রকট হওয়ায় অনেক রাজনীতিবিদ দলের মনোনয়ন লাভে ব্যর্থ হয়। ভুঁইফোঁড় অনেক ব্যবসায়ী বা শিল্পপতি অর্থের দৌরাত্ম্যে দলের মনোনয়ন পেয়ে নির্বাচিত হয়ে যান। এতে বঞ্চিত হয় জনগণ ও অকার্যকর হয় সংসদ। জরিপ, এফজিডি এবং কর্মশালার প্রায় সকল অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতা সংসদ সদস্যর স্থানীয় পর্যায়ে রাজনীতির অভিজ্ঞতা থাকার প্রতি জোর দিয়েছেন। তাঁরা মনে করেন, রাজনীতিকে রাজনীতির জায়গায় রাখতে হবে, রাজনীতির সাথে অর্থের অনৈতিক আঁতাত হলে গণতন্ত্র বিকশিত হবে না, প্রকৃত নেতৃত্ব তৈরি হবে না।

রাজনীতির অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি: রাজনীতির সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যোগ্য নেতৃত্ব তৈরি হয়। অনেক রাজনীতিবিদ খুব অল্প সময়ে প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, দক্ষতা, সততা, একনিষ্ঠা, অকুতোভয় সাহসিকতা দিয়ে মানুষের মন জয় করে নিয়েছেন, জনগণও তাকে যোগ্য স্থানে অধিষ্ঠিত করেছে। আবার অনেক কর্মী রয়েছেন যাকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়েছে সফলতার দাঁড়ে পদার্পণ করতে। সুতরাং রাজনীতির অভিজ্ঞতা অর্জনের বিষয়টি নির্দিষ্ট সময়ের ফ্রেমে বাঁধা যায় না। সংসদ সদস্য হওয়ার যোগ্যতা হিসেবে কত বছরের রাজনীতির অভিজ্ঞতা দরকার এ ব্যাপারে মতভেদ রয়ে গেলেও প্রায় ৭২% উত্তরদাতা পাঁচ বছরের বেশি অভিজ্ঞ রাজনীতিককে সংসদ সদস্য হিসেবে দেখতে চান।

সারণি ৩.৬: সংসদ সদস্য হওয়ার জন্য কত বছরের রাজনীতির অভিজ্ঞতা প্রয়োজন

অভিজ্ঞতা (বছর)	*সংখ্যা*	*শতকরা হার*
৫ বছরের বেশি	২০৮৫	৭১.৭
৩-৫	৬৪৫	২২.২
১-৩	৮৫	২.৯
জানি না	৯৪	৩.২
মোট	২৯০৯	১০০.০

মুখ্য তথ্যদাতাদের কাছ থেকেও জানা যায় সরকারি চাকরি বা সামরিক বাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করার পর পাঁচ বছর দলের সাথে সংযুক্ত থেকে অতঃপর কোন সংসদীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ থাকা উচিত। এর মাধ্যমে জনগণ ও দলের সাথে একাত্মতা তৈরি হবে। অনেক প্রার্থী সরকারি দায়িত্বে থাকা কালীন সময়ে নিজের প্রভাব খাটিয়ে নির্বাচনে নিজের ক্ষেত্র তৈরি করেন, এবং নির্বাচনের সময় অবসরে যেয়ে দলের মনোনয়ন নিয়ে নির্বাচন করেন। এ সকল ক্ষেত্রে দলও অর্থের বিনিময়ে মনোনয়ন বিক্রি করে বলে তাঁরা মনে করেন। এ সকল অগণতান্ত্রিক, অসাংবিধানিক এবং অসংসদীয় রীতি-নীতি পরিহার করতে দলকে অগ্রগামী হয়ে একমাত্র প্রকৃত রাজনীতিবিদদেরই মনোনয়ন দেওয়া উচিত এবং আইন করে অবসরে যাওয়া সরকারি ও

সামরিক কর্মকর্তাদের পাঁচ বছরের রাজনীতির অভিজ্ঞতার পর নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া দরকার বলে অভিমত দেন।[৭৫]

সংবিধানে লিখিত সংসদ সদস্যর এই সকল যোগ্যতা ও অযোগ্যতা এবং সংসদ পদ শূন্য হওয়ার কারণগুলোর সাথে উত্তরদাতারা একমত হয়ে ভিন্ন কিছু যোগ্যতার মাপকাঠি তুলে ধরেছেন। যে সকল মহান আদর্শের ওপর ভিত্তি করে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দেশের সর্বস্তরের জনগণ তার সামান্যই অর্জিত হয়েছে স্বাধীনতার সুদীর্ঘ ৩৭ বছরে। মানুষের মৌলিক চাহিদা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান পূরণ হয়নি, অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যাপক অসমতা, ধনী-গরিব অনুপাত বৃদ্ধি, সাম্প্রদায়িকতার ছোবল ইত্যাদি রয়ে গেছে। এ থেকে মুক্ত করতে আগামীর সংসদ সদস্যদের অসাম্প্রদায়িক, আদর্শবান, সৎ, দেশপ্রেমিক, জনসম্পৃক্ত, ব্যক্তিগত পরিমন্ডলে স্বচ্ছ, জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ হতে হবে বলে এফজিডি ও কর্মশালায় উঠে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে তারা যুদ্ধাপরাধী, দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত বা সাজাপ্রাপ্ত, ঋণখেলাপী বা বিলখেলাপীদের সংসদীয় নির্বাচনে অযোগ্য করার জন্য আইন প্রণয়ন করতে হবে। সংসদ সদস্যদের দেশের মানুষের কাছে রোল মডেল হতে হবে, যেন প্রতিটি মানুষ তাঁদের অনুসরণ করে, অনুকরণ করে। তাঁদের যোগ্য নেতৃত্বে সকল শ্রেণী পেশার মানুষ একসারিতে এসে উন্নয়নমুখী আন্দোলন গড়ে তুলে। আজকের প্রজম্মের জন্য তাঁদেকে যোগ্য ও প্রতিযোগিতামূলক যুদ্ধ ক্ষেত্র রেখে যেতে হবে। তাঁরা যদি তাঁদের অযোগ্যতা নিয়ে টিকে থাকে তবে নব প্রজম্মের মধ্যে হতাশা বাড়বে, গণতন্ত্রের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হবে, আইনের শাসন সুদূর পরাহত থাকবে।

৩.৫ উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্টত প্রতীয়মান যে সংবিধান এবং আইনে সংসদ সদস্য হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট যোগ্যতা ও অযোগ্যতা নির্ধারণ করা থাকলেও তার বাইরেও সাধারণ জনগণের কিছু প্রত্যাশা রয়েছে। সংসদ সদস্য হওয়ার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগত যোগ্যতা, বা নির্বাচনী এলাকার সাথে প্রত্যক্ষ কোনো সংযোগের বাধ্যবাধকতা না থাকলেও সাধারণ জনগণ প্রত্যাশা করেন তাদের প্রতিনিধি হবেন শিক্ষিত এবং তাদের এলাকার বাসিন্দা। জনগণের মতে সংসদ সদস্যদের প্রধান যোগ্যতা হওয়া উচিত দেশপ্রেম, সততা, স্বচ্ছতা, জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা, দূরদর্শিতা এবং দেশকে ও দেশের মানুষকে নির্মোহভাবে সেবা করার মানসিকতা। এ সকল বৈশিষ্ট্য থাকলে সংসদ সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, নির্দিষ্ট পেশাগত দক্ষতার প্রয়োজন হয় না।

[৭৫] গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ (সংশোধিত) ২০০৮ অনুযায়ী, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা অবসর গ্রহণের পর তিন বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না।

অধ্যায় চার
সংসদ সদস্য সংক্রান্ত তথ্যে জনগণের অধিকার

জবাবদিহিতার অন্যতম পূর্বশর্ত স্বচ্ছতা আর স্বচ্ছতার পূর্বশর্ত তথ্যে প্রবেশাধিকার। তথ্যের অবাধ প্রবাহ সৃষ্টি করা হলে জনগণ যেমন তাদের অধিকার সম্পর্কে জানবে তেমনি তাদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হবে। সুতরাং রাজনৈতিক দল ও সংসদ সম্পর্কিত তথ্যের উন্মুক্তকরণ হলে তাঁদের সম্পর্কে জনগণ অবগত হবে এবং এর মাধ্যমে তাদের জবাবদিহিতার ক্ষেত্র তৈরি হবে। আর এই জবাবদিহিতা না থাকলে রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিকরা স্বৈরাচারী হয়ে ওঠে এবং দুর্নীতির ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়। অন্যদিকে তথ্য উন্মুক্ত করা হলেও নিরক্ষর জনগণের কাছে তার গুরুত্ব থাকে না। গণতন্ত্রের সাথে শিক্ষার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। শিক্ষার বিস্তারের মাধ্যমে গণতন্ত্র বিকশিত হয়। মানুষ শিক্ষিত হলে নিজ অধিকার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবে এবং নিজ ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক হিসেবে প্রকৃত সিদ্ধান্ত নিতে পারবে বলে মনে করা হয়। কিন্তু জনগণ শিক্ষা বঞ্চিত হলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বাইরের বিভিন্ন শক্তি প্রভাবক হিসেবে কাজ করে, তখন তারা অনেক ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। বাংলাদেশে প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা অনেক কম, তাই নির্বাচনে ভোট প্রদানের পূর্বে ভোটারদের বড় একটা অংশ প্রার্থী সম্পর্কে কোনোরূপ ধারণা না নিয়ে, রাজনৈতিক দলের মার্কা দেখে বা অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। তাই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় শিক্ষা এবং জনগণের তথ্য প্রাপ্তি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই অধ্যায়ে সংসদ সম্পর্কিত তথ্যে জনগণের অধিকার এবং সংসদ সদস্যর সাথে যোগাযোগের বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

৪.১ নির্বাচনের প্রচারণায় আইন-বহির্ভূত আচরণ

আমাদের দেশে গত দেড় দশকে এমন একটি নির্বাচনী সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে যেখানে একজন প্রার্থীর গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারিত হয় তার দলের প্রতীক, পূর্ববর্তী সরকারের সাফল্য ও ব্যর্থতা, পূর্ববর্তী সরকারের সময়ে তার দলের কার্যক্রম, এবং প্রার্থীর অর্থ-সম্পদ ও দলীয় কর্মীদের শক্তিমত্তার ওপর। গত কয়েকটি জাতীয় নির্বাচনে ধীরে ধীরে এই ধারায় প্রার্থী মনোনয়ন এবং নির্বাচনে জয়লাভের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলো সংসদীয় ও অন্যান্য নির্বাচনে বিজয় নিশ্চিত করার জন্য কালো টাকার মালিক, সন্ত্রাসী, ব্যবসায়ী, শিল্পপতিদের মনোনয়ন দিচ্ছে। নির্বাচনে জয়লাভের জন্য প্রার্থীরা বিভিন্ন ধরনের আইন-বহির্ভূত উপায়ের আশ্রয় নিয়ে থাকে যার মধ্যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে নির্বাচনী আচরণ বিধি ভঙ্গ করা, নির্বাচনী পরিবেশ নষ্ট করা, ভোট জাল, ভোট গণনায় প্রভাব সৃষ্টি, ভোট জাল করার পরিবেশ সৃষ্টি, এবং দলীয় পর্যায়ে প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধা তৈরি ও তা সদ্ব্যবহার করা প্রধান।[৭৬]

৪.১.১ তথ্য অধিকারে হাইকোর্টের রায়

বাংলাদেশের সমস্ত নির্বাচন পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের একমাত্র সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন।[৭৭] একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনা করতে ভোটার সচেতনতার প্রতি নির্বাচন কমিশন ব্যাপক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে, আর এই কাজে সহায়তা করে থাকে দেশি-বিদেশি বেসরকারি সংস্থা, গণমাধ্যম, ও সুশীল সমাজ। সংসদীয় নির্বাচনে প্রার্থীদের সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার জন্য এরা মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

আইন অনুসারে নির্বাচনের আগে মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় প্রার্থিতা প্রত্যাহারের দিন থেকে শুরু করে পরবর্তী সাত দিনের মধ্যে নির্ধারিত ফরমের মাধ্যমে প্রার্থীর বাড়িসহ অন্যান্য স্থাবর সম্পদের ধরন, অবস্থান ও মূল্য, ব্যাংক ডিপোজিট, বন্ড ইত্যাদির পরিমাণ, দায়ের ধরন ও পরিমাণ, এবং বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ রিটার্নিং অফিসারকে জমা দিতে হয়।[৭৮] বাংলাদেশে জন প্রতিনিধির স্বচ্ছতা ও যোগ্যতার প্রশ্নে ২০০৫ সালের ২৪ মে ড. কামাল হোসেন, আবদুল মোমেন চৌধুরি, কে এম জাবির ও জহিরুল ইসলাম এর একটি জনস্বার্থ মামলার (পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন) প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট ডিভিশন নির্দেশ প্রদান করেন যে নির্বাচন কমিশন যেন প্রার্থীদের ব্যক্তিগত তথ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করে ভোটারদের সঠিক প্রতিনিধি নির্বাচন করতে নিশ্চিত করেন। এই মামলার পেছনে প্রধান যুক্তি ছিল যে, জনপ্রতিনিধির মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে যেন যোগ্য প্রার্থীরা নির্বাচিত হতে পারেন, এবং অসৎ ও দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিক, যারা নিজেরাই আইন ভঙ্গকারী, যেন সংসদ সদস্য না হতে পারেন। এই আদেশের বলে নির্বাচন কমিশনের কাছে যেসব তথ্য প্রকাশ করা প্রয়োজন সেগুলো হচ্ছে: (১) শিক্ষাগত যোগ্যতা, (২)

---

[৭৬] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন শাহজাদা আকরাম ও সাধন কুমার দাস, *বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন: একটি ডায়াগনস্টিক প্রতিবেদন*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০০৬।

[৭৭] বিস্তারিত জানতে দেখুন *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ১১৮-১২৬।

[৭৮] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *The Conduct of Elections Rules, 1972, (as modified up to 15 April 1993), Article 27A*।

বর্তমানে প্রার্থীর বিরুদ্ধে রুজুকৃত ফৌজদারি অপরাধের তালিকা, (৩) অতীতের ফৌজদারি মামলার তালিকা ও ফলাফল, (৪) প্রার্থীর পেশা, (৫) প্রার্থীর আয়ের উৎস(সমূহ), (৬) অতীতে সংসদ সদস্য হয়ে থাকলে জনগণের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণে তার ভূমিকা, (৭) প্রার্থী ও তার ওপর নির্ভরশীলদের সম্পদ ও দায়-দেনার বর্ণনা, এবং (৮) ব্যাংক বা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যক্তিগত বা যৌথভাবে এবং এমন কোম্পানি থেকে নেওয়া ঋণের পরিমাণ ও বর্ণনা যে কোম্পানির তিনি সভাপতি, বা নির্বাহী পরিচালক বা পরিচালক।[৭৯] জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার তাদের ভোটাধিকারের অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তীতে হাইকোর্ট এসব তথ্য জনগণকে জানানোর জন্য বাংলাদেশ সরকার ও নির্বাচন কমিশনের ওপর রুল জারি করে। তবে এই রায়ের পরও অভিযোগ ওঠে নির্বাচন কমিশন এসব তথ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে যথাযথ উদ্যোগ নিচ্ছে না, প্রার্থীরা এসব তথ্য দিতে আগ্রহী নয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে ভুল তথ্য দিচ্ছে, পরবর্তীতে নির্বাচন কমিশন সেসব তথ্য প্রচারে উদ্যোগ নিচ্ছে না এবং সেসব তথ্য সরবরাহও করছে না।[৮০] ফলে প্রার্থীদের সম্পর্কে জনগণের জানার যে অধিকার তা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। তবে নির্বাচন কমিশন ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের ব্যক্তিগত তথ্য-সম্বলিত হলফনামা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে।

তবে উল্লেখ্য, আইনগতভাবে সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পরে কোনো ধরনের ব্যক্তিগত সম্পদের পরিমাণ বা মূল্য উপস্থাপন করার বাধ্যবাধকতা এখনও নেই।

৪.১.২ নির্বাচনের পূর্বে প্রার্থীর ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ

জনগণের তথ্য অধিকারের বিষয়টি সমুন্নত রাখতে নির্বাচনের প্রার্থীদের ব্যক্তিগত আটটি তথ্য প্রকাশের ওপর হাইকোর্টের রায়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর মাধ্যমে ভোটাররা প্রার্থীদের সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা পাবেন, যা তাদের ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করবে বলে এফজিডিতে মত উঠে আসে। প্রার্থীদের অনেকে তাদের ব্যক্তিগত বিভিন্ন অপরাধ, ফৌজদারী মামলা, সম্পদের পরিমাণ, খেলাপী ঋণের পরিমাণ ইত্যাদি গোপন করে জনগণের সম্মুখে একজন সৎ, যোগ্য, আদর্শবান প্রার্থী হিসেবে উপস্থিত হয়। জনগণের নিকট পর্যাপ্ত তথ্য না থাকায় তারা প্রার্থীর প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে পারে না। এই প্রেক্ষাপটে হাইকোর্টের রায়ের দ্রুত বাস্তবায়ন অতি জরুরি মনে করেন সকল উত্তরদাতা। এজন্য নির্বাচন কমিশনকে কার্যকরভাবে প্রার্থীদের জমাকৃত তথ্য যাচাই বাছাই করে জনগণের সম্মুখে তা প্রকাশ করতে হবে, তবেই হাইকোর্টের রায়ের প্রকৃত ফল জনগণ ও দেশ পাবে।

এই গবেষণায় জরিপের উত্তরদাতারা নির্বাচনের পূর্বে প্রার্থীদের সম্পর্কে যে সকল তথ্য জানতে চায় বলে জানায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য শিক্ষাগত যোগ্যতা (৮৭.১%), আয়ের উৎস (৭০.৯%), পেশা (৪৯.৫%), ফৌজদারী মামলা (৬০.৪%), সম্পদের পরিমাণ (৫১.৯%), নির্বাচনীয় প্রচারণার ব্যয় (৪১.৬%), সংসদ সদস্য হিসেবে এলাকায় অবদান (৬২.২%)।

সারণি ৪.১: প্রার্থী সম্পর্কে জানতে চাওয়ার বিষয়

তথ্যের ধরন	*সংখ্যা*	*শতকরা হার*
শিক্ষাগত যোগ্যতা	২৭৮৮	৮৭.১
আয়ের উৎস	২২৬৮	৭০.৯
পেশা	১৫৮৪	৪৯.৫
ফৌজদারী মামলা	১৯৩৪	৬০.৪
সম্পদের পরিমাণ	১৬৬১	৫১.৯
নির্বাচনী প্রচারণার ব্যয়	১৩৩২	৪১.৬
রাজনৈতিক পরিচয়	১১৪১	৩৫.৭
সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে গৃহীত ঋণ	৮৯৪	২৭.৯
সংসদ সদস্য হিসেবে স্থানীয় উন্নয়নে অবদান	১৯৯১	৬২.২
জানি না	১৫৩	৪.৮

** একাধিক উত্তর প্রযোজ্য*

মুখ্য তথ্যদাতারাও হাইকোর্টের রায়টিকে যুগান্তকারী হিসেবে গণ্য করেন। তাঁরা এই রায়ের বাস্তবায়নে নির্বাচন কমিশন ও সরকারকে প্রয়োজনীয় ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে বলেন, নচেৎ জনগণ কোনো সুফল পাবে না। তবে এর সাথে তাঁরা নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের প্রতি বছর আয়-ব্যয়সহ ব্যক্তিগত হালনাগাদকৃত অন্যান্য তথ্য প্রকাশ করার দাবি জানান। এর বাইরেও

[৭৯] শাহজাদা আকরাম ও সাধন দাস, *নির্বাচনী ব্যয় পর্যালোচনা: স্থগিত নবম সংসদ নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের দিন পর্যন্ত প্রার্থীদের নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘনের ওপর একটি বিশ্লেষণ*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০০৭।

[৮০] শাহজাদা আকরাম ও সাধন দাস, *প্রাগুক্ত*; এবং শাহজাদা আকরাম ও সাধন দাস, *বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন: একটি ডায়াগনস্টিক প্রতিবেদন*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০০৬।

জনগণ সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য কর, বিল ও ঋণ খেলাপি কিনা তা জানারও প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। এর মাধ্যম হিসেবে নির্বাচন কমিশন, সংসদ বা অন্য কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান ভূমিকা রাখতে পারে। তথ্যের যথার্থতা যাচাই করতে কর বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ, পুলিশ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর একসাথে কাজ করবে এবং সেসব তথ্য ওয়েবসাইট বা গণ মাধ্যমে (খবরের কাগজ ও রেডিও-টিভি) প্রকাশ করবে। যদি কোনো তথ্য ভুল প্রমাণিত হয় তবে তার জন্য শাস্তির ব্যবস্থাও করতে হবে। এতে সংসদ সদস্যরা ভুল বা অতিরঞ্জিত তথ্য প্রদানে বিরত থাকবেন। মুখ্য তথ্যদাতাদের মতে, এটি নিশ্চিত করা হলে সংসদ সদস্যদের আর্থিক ও অন্যান্য দুর্নীতি হ্রাস পাবে। অন্যদিকে জনগণের তথ্য অধিকার অনেকটা নিশ্চিত হবে।

৪.২ সংসদ সদস্যর পারিশ্রমিক ও ভাতা: 'বিশেষ অধিকার' **(Privileges)**

তথ্যের অপ্রতুলতার জন্য সংসদ সদস্যর পারিশ্রমিক বিষয়ে জনগণের মধ্যে অনেক ভুল ধারণা রয়েছে। এর পেছনে রয়েছে সংসদ সদস্যদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন। সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর খুব অল্প সময়ে অনেকের ব্যক্তিগত সম্পদের পরিমাণ, গাড়ি ও বাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, জীবন যাত্রায় আমূল পরিবর্তন আসে। তাই সাধারণ জনগণের বেশিরভাগ সংসদ সদস্যদের পারিশ্রমিক অনেক বেশি মনে করেন, আবার সংসদ সদস্যরা ক্ষমতার অপপ্রয়োগের আশ্রয় নিয়ে এই সমৃদ্ধি অর্জন করেন বলে অনেকে মনে করেন। অনেকে মনে করেন সংসদ সদস্যরা সরকারের বেতনভুক্ত কর্মচারী। এ কারণে সংসদ সদস্যদের অধিকার, ক্ষমতা, প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা, পারিশ্রমিক ও অন্যান্য ভাতা সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হলো।

সংসদীয় পরিভাষায় 'বিশেষ অধিকার' সংসদ এবং এর বিভিন্ন কমিটির জন্য সামগ্রিকভাবে এবং এর সদস্যদের জন্য ব্যক্তিগতভাবে প্রযোজ্য বিশেষ কিছু অধিকার এবং বিশেষ দায়মুক্তি বোঝায়। এর উদ্দেশ্য সংসদের মর্যাদা, স্বাধীনতা ও ক্ষমতার রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করা। বাংলাদেশের সংবিধানে ও কার্যপ্রণালী বিধিতে সংসদ ও সংসদ সদস্যদের এবং কমিটির কিছু বিশেষ অধিকার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এর বাইরেও কিছু কিছু বিশেষ অধিকার প্রথাগতভাবে পালিত হয়ে এসেছে।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৮ এর ওপর ভিত্তি করে সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার ও পারিশ্রমিক সংক্রান্ত আইন প্রথম প্রণীত হয় ১৯৭৩ সালে, যা পরবর্তীতে ছয় বার সংশোধিত হয়।[৮১] সর্বশেষ ২০০৫ সালে অষ্টম সংসদের অষ্টাদশ অধিবেশনে এই আইনটি সংশোধন হয়।[৮২] দেখা যায়, অষ্টম সংসদের ২০০৩ থেকে ২০০৫ – এই দুই বছরের মধ্যে দুইবার সংসদ সদস্যদের পারিশ্রমিক ও অন্যান্য সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়।[৮৩] তবে সংসদ সদস্যদের পারিশ্রমিকের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সরকারের অংশ হিসেবে এবং সংসদে নেতৃত্ব প্রদানকারী হিসেবে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, বিভিন্ন পর্যায়ের মন্ত্রী, স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের পারিশ্রমিক-ভাতা সাধারণ সংসদ সদস্যদের তুলনায় বেশি (সারণি ৪.৩)। উল্লেখ্য, স্বাধীনতার পর থেকে প্রধানমন্ত্রীর সাতবার এবং মন্ত্রীদের নয়বার পারিশ্রমিক-ভাতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সংসদ সদস্যদের পারিশ্রমিক আয়কর মুক্ত। আইন অনুযায়ী মাসিক পারিশ্রমিক সব সংসদ সদস্যের জন্য সমান, তবে যাঁরা তিনটি কমিটির সদস্য তাঁরা বেশি ভাতা ও সম্মানী পেয়ে থাকেন। নিয়মিত পারিশ্রমিক ও ভাতার বাইরে সংসদ সদস্যরা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও পেয়ে থাকেন। সংসদ সদস্যের নিজের এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের চিকিৎসা সুবিধা একজন প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড সরকারি কর্মকর্তার সম -পর্যায়ের।

সংসদ সদস্যরা রাজধানীতে আবাসিক সুবিধা পেয়ে থাকেন। জাতীয় সংসদ ভবন সংলগ্ন এমপি হোস্টেলে বা ন্যাম ফ্ল্যাটে নামমাত্র ভাড়ায় কক্ষ বা ফ্ল্যাট সুবিধা পান। আবাসিক সুবিধা সব সংসদ সদস্যই পেয়ে থাকেন; তবে যাঁরা সিনিয়র তাঁদের জন্য বড় ফ্ল্যাট আর যারা জুনিয়র তাঁদের জন্য ছোট ফ্ল্যাট বরাদ্দ দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, অষ্টম সংসদের ৩২৪ জন সদস্য ১৩টি বহুতল ন্যাম ভবনে মাসিক ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা ভাড়ায় ফ্ল্যাট বরাদ্দ পান। রাজধানীর শেরেবাংলা নগর ও নাখালপাড়ায় অবস্থিত

---

[৮১] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *The Members of the Constituent Assembly (Salaries and Allowances) Order, 1972, PO No. 24 of 1972*। পরবর্তীতে ১৯৭৩ সালে এই আদেশের পরিবর্তে *The Members of Parliament (Salaries and Allowances) Order, 1973, PO No. 28 of 1973* প্রণীত হয়, যা পরবর্তীতে ১৯৭৪, ১৯৭৫, ১৯৮০, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯২, ১৯৯৩, ২০০০, ২০০৩ ও সর্বশেষ ২০০৫ সালে সংশোধন করা হয়।

[৮২] অষ্টম সংসদের অষ্টাদশতম অধিবেশনে ১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৫ তারিখে একসাথে ছয়টি আইন প্রণীত হয়। এগুলো হচ্ছে *The President's (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2005, The Prime Minister's (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2005, The Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2005, The Speaker and Deputy Speaker (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2005, The Members of Parliament (Remuneration and Allowances) (Amendment) Act, 2005,* এবং *The Supreme Court Judges (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2005* ।

[৮৩] অষ্টম সংসদের অষ্টম অধিবেশনে ৮ জুলাই ২০০৩ তারিখে *The Prime Minister's (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2003, The Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2003, The Speaker and Deputy Speaker (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2003,* এবং *The Members of Parliament (Remuneration and Allowances) (Amendment) Act, 2003* প্রণীত হয়। পরবর্তীতে নবম অধিবেশনে ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৩ তারিখে *The President's (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2003* প্রণীত হয়।

ন্যাম ভবনের ২২৮টি ফ্ল্যাট এখনও সাবেক সংসদ সদস্যদের দখলে রয়েছে, যদিও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ভাষ্য মতে সংসদের সদস্যপদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে এই ফ্ল্যাটে থাকার অধিকার হারিয়েছেন।[৮৪]

সারণি ৪.২: আইন অনুযায়ী সংসদ সদস্যদের প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার বৃদ্ধি: তুলনামূলক চিত্র

প্রাপ্ত সুবিধা	*পরিমাণ (টাকা)*			
	১৯৭৩	**২০০০**	**২০০৩**	**২০০৫**
সম্মানী বা পারিশ্রমিক (মাসিক)	১,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১৫,০০০
অধিবেশন চলাকালীন দৈনিক ভাতা	৬৫	৫০০	৫০০	৫০০
যাতায়াত ভাতা	০.৫০ (প্রতি মাইল)	১ (প্রতি কিমি)	৬ (প্রতি কিমি)	৬ (প্রতি কিমি)
ভ্রমণ ভাতা (বার্ষিক এককালীন)	৩,০০০	৩০,০০০	৫০,০০০	৫০,০০০
আপ্যায়ন ভাতা (মাসিক)	-	-	২,০০০	২,০০০
নির্বাচনী এলাকা ভাতা (মাসিক)	-	৫,০০০	৫,০০০	৫,০০০
চিকিৎসা ভাতা (মাসিক)	১,২০০ (বার্ষিক)	-	২০০	২০০
টেলিফোন বিল (মাসিক)	বার্ষিক ১,২০০	৪,০০০	৬,০০০	৬,০০০
নির্বাচনী এলাকায় অফিস খরচ (মাসিক)	১,৫০০	৬,০০০	৬,০০০	৬,০০০
নির্বাচনী এলাকার জন্য বার্ষিক থোক বরাদ্দ	-	৭৫,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০

সূত্র: সংসদ সদস্যদের পারিশ্রমিক সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন।

আবাসন সুবিধা ছাড়াও সংসদ সদস্যরা সদস্য থাকা অবস্থায় দুর্ঘটনার কারণে মৃত্যু বা শারীরিক ক্ষতির জন্য বীমা সুবিধা পেয়ে থাকেন। প্রথমে এটি বার্ষিক ৩,০০,০০০ টাকা থাকলেও পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে এটি ৫,০০,০০০ টাকায় উন্নীত করা হয়।[৮৫] এছাড়াও সংসদ সদস্যরা কূটনৈতিক পাসপোর্ট পেয়ে থাকেন। আইন অনুযায়ী সংসদ সদস্যরা মাসিক পারিশ্রমিক-ভাতা ছাড়াও সংসদ অধিবেশন চলাকালীন দৈনিক ভাতা পেয়ে থাকেন।

সারণি ৪.৩: আইন অনুযায়ী বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত সংসদ সদস্যদের বেতন

বেতন কাঠামো	*পরিমাণ (টাকা)*
রাষ্ট্রপতি	৩৩,৪০০
প্রধানমন্ত্রী	৩২,০০০
স্পিকার	৩১,২০০
ডেপুটি স্পিকার	২৯,০০০
মন্ত্রী	২৯,০০০
প্রতিমন্ত্রী	২৬,১০০
উপ-মন্ত্রী	২৪,৬৫০
সংসদ সদস্য	১৫,০০০

সূত্র: ২০০৫ সালে প্রণীত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রী, এবং সংসদ সদস্যদের পারিশ্রমিক সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন।

জাতীয় সংসদের সদস্যদের শুল্কমুক্ত গাড়ির সুবিধা ১৯৮৮ সালের ২৪ মে একটি প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে দেওয়া শুরু হয়। এই আইন ২০০২ সালের ২৮ আগস্টে সংশোধন করা হয়। এই সংশোধনী অনুযায়ী একজন সংসদ সদস্য প্রথমবার নির্বাচিত হওয়ার পর শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর বা সম্পূরক শুল্ক ছাড়াই একটি মোটরগাড়ি বা জিপ আমদানি করতে পারবেন। তবে তিনি দ্বিতীয়বার বা অন্য যেকোনো সময়ে আবার নির্বাচিত হলে আট বছরের ব্যবধানে আরেকটি গাড়ি আমদানি করতে পারবেন। একজন সংসদ সদস্য যতবারই নির্বাচিত হন না কেন, তিনি এই সুবিধা দুইবারের বেশি পাবেন না। এমনকি আমদানি করা গাড়ি তিনি তিন বছরের মধ্যে বিক্রি করতে পারবেন না। ২০০৫ সালের ২২ আগস্ট আরেকটি সংশোধনী অনুযায়ী শুল্কমুক্ত গাড়ি পেতে হলে শপথ নেওয়ার পর সংসদের মেয়াদ কমপক্ষে দুই বছর থাকতে হবে। তবে শুল্কমুক্ত গাড়ি আমদানির সুবিধার ব্যাপক অপব্যবহারের কারণে ২০০৭ সালের ১৬ এপ্রিল বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টাদের কাউন্সিল এই শুল্কমুক্ত গাড়ির সুবিধা বাতিল করেন।[৮৬]

বাংলাদেশের সংসদ কার্যকর না হওয়ার পেছনে অন্যতম কারণ বিরোধী দলের লাগাতার সংসদ বর্জন এবং সংসদে সদস্যদের

---

[৮৪] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০ মার্চ ২০০৮।

[৮৫] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *The Members of Parliament (Remuneration and Allowances) (Amendment) Act, 1992*, অনুচ্ছেদ ৬ (এ)।

[৮৬] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৫ এপ্রিল ২০০৬; *দ্য ডেইলি স্টার*, ১৭ এপ্রিল ২০০৭।

অনুপস্থিতি। তবে দেখা যায় সংসদ সদস্যরা লাগাতার ৮৯ বৈঠক-দিবস সংসদ বর্জন করে ৯০তম দিনে সংসদে উপস্থিত হন। এর মাধ্যমে তাঁরা তাদের সংসদ সদস্যপদ ঠিক রাখেন এবং সংসদ অধিবেশন চলাকালীন ভাতা গ্রহণ করেন। সংসদ সদস্যদের এরূপ আচরণকে অনেকে অনৈতিক বলে উল্লেখ করেন এবং সংবিধানের ৬৭ (১) (খ) অনুচেছদের সংশোধনের মাধ্যমে সংসদের অনুমতি না নিয়ে ৮৯ বৈঠক-দিবস অনুপস্থিত থাকার সুযোগ কমানো উচিত বলে মনে করেন। এই গবেষণার জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় ৮৬.১% উত্তরদাতা সংসদ সদস্যরা সংসদে অনুপস্থিত থাকলে বেতন-ভাতা যাওয়া উচিত নয় বলে জানান।

সারণি ৪.৪: সংসদ সদস্যদের সংসদে অনুপস্থিত থাকলেও বেতন-ভাতা পাওয়া উচিত কিনা

পারিশ্রমিক	*সংখ্যা*	*শতকরা হার*
পাওয়া উচিত না	২৭৪৬	৮৬.১
পাওয়া উচিত	২৬৩	৮.২
জানি না	১৮১	৫.৭
মোট	৩১৯০	১০০.০

মুখ্য তথ্যদাতাদেরও অধিকাংশ সাধারণ জনগণের সাথে একমত পোষণ করেন। পারিশ্রমিক না দেওয়ার পেছনে নিচের যুক্তিগুলো উল্লেখ করা যায়:

- জনগণ ভোট প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেন সংসদে যেয়ে তাদের হয়ে কথা বলার জন্য, তাদের এলাকার সমস্যা তুলে ধরার জন্য, সর্বোপরি আইন প্রণয়ন করার জন্য। এই মহান দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁদের পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়। কিন্তু সংসদ সদস্যরা সংসদ বয়কট করলে একদিকে সংসদীয় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়, অন্যদিকে জনগণের দেওয়া ভোট অর্থহীন হয়ে পড়ে। সংসদ সদস্যদের জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকা উচিত। এ কারণে তাদের সংসদে যাওয়া অবশ্য-কর্তব্য। এর ব্যাত্যয় হলে পারিশ্রমিক ও অন্যান্য সুবিধা গ্রহণ করা উচিত নয়।
- সংসদ সদস্যর প্রধান একটি দায়িত্ব স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে সরকারকে জবাবদিহিতার মধ্যে নিয়ে আসা। কিন্তু তাঁরা যদি লাগাতার অনুপস্থিত থাকেন তবে সংসদ অকার্যকর হয়ে পড়ে, এবং সরকার সব ধরনের জবাবদিহিতার উর্ধ্বে অবস্থান করে। এতে সার্বিকভাবে জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ কারণে সংসদ সদস্যদের সংসদে অংশগ্রহণ করা উচিত। আর রাজনৈতিক কারণে সংসদ বর্জন করতে হলে তাদের পারিশ্রমিক ও ভাতাও নেওয়া উচিত না।
- রাজনৈতিক কারণে ও সাংবিধানিক ক্ষমতা বলে লাগাতার ৮৮/৮৯ বৈঠকদিবস সংসদে গেলেন না, তারপর সংসদে উপস্থিত হয়ে তাদের সদস্যপদ ঠিক রেখে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করা অনৈতিক।
- সংসদ সদস্যরা প্রয়োজনে ওয়াক আউট করতে পারেন। কিন্তু সংসদে অংশগ্রহণ করা থেকে একাদিক্রমে দীর্ঘদিন বিরত থাকা বা সংসদ বয়কট করা উচিত না।

তবে বেশ কয়েকজন তথ্যদাতা এর বিপরীত যুক্তিও দিয়েছেন। তাঁদের মতে:

- সংসদ সদস্যরা কারও চাকরি করেন না। তারা জন-প্রতিনিধি। জনগণের রায় নিয়ে তাদের প্রতিনিধিত্ব করেন। তাই একজন সরকারি চাকরিজীবীর ন্যায় তাদের মূল্যায়ন করা উচিত নয়।
- একজন সংসদ সদস্য খুব সামান্য পারিশ্রমিক-ভাতা পেয়ে থাকেন। রাজনৈতিক প্রয়োজনে তাঁরা সংসদ বয়কট বা লাগাতার অনুপস্থিত থাকেন। তাই তাঁদের অনুপস্থিতির জন্য এই সুযোগ সুবিধা কর্তন করা সঙ্গত হবে না।
- সংসদ সদস্যরা পারিবারিক বা শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণেও দীর্ঘদিন সংসদের বাইরে থাকতে পারেন।
- বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যরা জন-প্রতিনিধি হয়ে সংসদে আসেন। তাঁরা সংসদে অংশগ্রহণ করছেন না ঠিকই কিন্তু সংসদের বাইরে দলের বিভিন্ন কর্মকান্ড তত্ত্বাবধান করছেন। তাই তাঁদের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করার অধিকার রয়েছে।
- যেহেতু সংসদ সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করেন না এবং তাঁর পদ সাংবিধানিকভাবে শূন্য হয় না তাই তাঁর সব পারিশ্রমিক-ভাতা পাওয়া উচিত।
- সংসদ সদস্যরা তাঁদের পারিশ্রমিক-ভাতার পরিমাণের দিকে নজর রাখেন না। তাঁরা ক্ষমতার অপপ্রয়োগের মাধ্যমে অনেক অর্থ আয় করেন। সুতরাং সংসদ সদস্যদের পারিশ্রমিক-ভাতা কর্তনের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তাঁদের মধ্যে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করা যেন তাঁরা দেশের জনগণের জন্য কাজ করেন, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে জনগণের সেবা করেন।
- সরকারি দলের সংসদ সদস্যরা এমনকি সংসদের স্পিকার বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের প্রতি অসহনশীল আচরণ করেন। তাঁদের কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয় না, কথা বলার সময় হট্টগোল করা হয়, বিরোধী নেতা-নেত্রী সম্পর্কে অশ্লীল মন্তব্য করা হয়, বিরোধীদের অধিকাংশ বিল আমলে নেওয়া হয় না ইত্যাদি কারণে বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের পক্ষে সংসদে থেকে সময়ক্ষেপণ ছাড়া করার কিছু থাকে না। এ প্রেক্ষাপটে তাঁদের সংসদের বাইরে এসে আন্দোলন করতে হয়।

সংসদ সদস্যদের পারিশ্রমিক ও ভাতার পরিমাণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে মুখ্য তথ্যদাতাদের অনেকেই একে অপর্যাপ্ত বলে উল্লেখ করেন। তাঁরা বলেন বর্তমান সময়ে এই পারিশ্রমিক দিয়ে একজন সংসদ সদস্য ভালোভাবে চলতে পারেন না। বাংলাদেশের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাও অত্যন্ত কম। জীবনযাত্রার ব্যয় অত্যন্ত বেড়ে গেলেও সে অনুপাতে সরকারি কর্মচারী বা সংসদ সদস্যদের পারিশ্রমিক বাড়ানো হয়নি। ভারতের লোকসভার সংসদ সদস্যরা আমাদের সংসদ সদস্যদের চেয়ে অনেক বেশি বেতন-ভাতা পেয়ে থাকেন। এমনকি তাঁরা অবসর ভাতাও পান।[৮৭]

> "তাঁকে বেতন-ভাতা দেওয়ার দরকার নেই। সংসদে এলাকার সমস্যা তুলে ধরার জন্য উপস্থিত থাকেন না এমন জনপ্রতিনিধি আমরা চাই না।"

৪.৩ সংসদ সদস্যের সাথে যোগাযোগ: জনগণের চাহিদা

একজন সংসদ সদস্য তাঁর নির্বাচনী এলাকার ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে সংসদে যান। তাঁর অন্যতম দায়িত্ব আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করা এবং নিজ এলাকার সমস্যা, অভাব-অভিযোগ সংসদে তুলে ধরা। তাই সংসদ সদস্যদের নিজ নির্বাচনী এলাকার জনগণের সাথে সম্পর্ক রাখা উচিত বলে অনেকেই মনে করেন। যুক্তরাজ্যের জনগণও তাদের সংসদ সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করার প্রয়োজন অনুভব করেন বিধায় সংসদ সদস্যরা তাঁদের সাথে কথা বলার জন্য, তাদের সমস্যা শোনার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ করেছেন।[৮৮] আমাদের দেশের জনগণও তাদের নিজ নিজ এলাকার সংসদ সদস্যর সাথে যোগাযোগ করার প্রয়োজন বোধ করেন। জরিপে ৮৭.৫% উত্তরদাতা মনে করেন সংসদ সদস্যর সাথে তাদের যোগাযোগ করার প্রয়োজন রয়েছে। সাধারণ ভোটার বা এলাকাবাসী মনে করেন, তারা ভোট দিয়েছেন তাদের এবং এলাকার সমস্যার সমাধানের জন্য। তাই জনগণ যদি সংসদ সদস্যর সাথে যোগাযোগ করতে না পারেন তবে কিভাবে সংসদ সদস্যরা এলাকার সমস্যা সম্পর্কে জানবেন এবং সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

সারণি ৪.৫: সংসদ সদস্যের সাথে যোগাযোগ করার প্রয়োজন আছে কিনা

যোগাযোগ করা	*সংখ্যা*	*শতকরা হার*
প্রয়োজন আছে	২৭৯৮	৮৭.৫
প্রয়োজন নেই	৩৭১	১১.৬
জানি না	২৭	০.৮
মোট	৩১৯৬	১০০.০

বেশিরভাগ জনসাধারণ সংসদ সদস্যদের প্রকৃত দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত না হওয়ায় নিজ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বা স্থানীয় সরকারের এখতিয়ারাধীন উন্নয়ন উদ্যোগের ব্যাপারে তাঁদের সাথে যোগাযোগ করতে চান বলে কয়েকজন সাবেক মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য জানান। একজন সাবেক মন্ত্রী জানান যে, এলাকার জনগণ অসুস্থ রোগী নিয়ে তাঁর ঢাকায় বাসায় অপেক্ষা করতে থাকে এই আশায় যে মন্ত্রী অসুস্থ রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করে দেবেন। এলাকার জনগণ নানান সমস্যা নিয়ে আসেন, কখনও আসেন অর্থ-সাহায্য বা সুপারিশের জন্য — এই আশা নিয়ে যে সংসদ সদস্য বা মন্ত্রী তাদের সব সমস্যার সমাধান করে দেবেন।

অন্যদিকে একাধিক মুখ্য তথ্যদাতা বলেন, জনগণের এই ধরনের মানসিকতা তৈরির পেছনে শুধুমাত্র জনগণই দায়ী না, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীরা জনগণকে প্রলোভিত করতে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে, এমনকি নির্বাচনের পূর্বে অর্থ ও ক্ষমতা দিয়েও সাহায্য করে থাকেন। পরবর্তীতেও অনেক ব্যক্তিকে সাহায্য সহযোগিতা করতে দেখেন। এর ফলেই জনগণ স্থানীয় সরকার ও সংসদ সদস্যর কাজের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন না।

> "এলাকায় সরকার অফিস করে দিলে আমাদের খুব সুবিধা হয়। দরকার হলে আমরা এমপি'র সংগে দেখা করতে পারব।"
>
> "আরে বাবু অরা কি হামাগোরে সাথে দেখা করবে?"
>
> "ভোটের সময় সবাই আত্মীয় হয়, কেউ ডাকে খালা, কেউ মাসি, কেউ পিসি কিন্তু ভোটের পরে কারো দেখা পাওয়া যায় না। সংসদ সদস্য দূরে থাক, ইউনিয়নের মেম্বার পর্যন্ত চেনে না।"

---

[৮৭] উল্লেখ্য, ভারতের রাজ্যসভা ও লোকসভার সদস্যরা পারিশ্রমিক হিসেবে মাসিক ১৬,০০০ রুপি, দৈনিক ভাতা ১,০০০ রুপি, বিনা খরচে থাকার ব্যবস্থা, অফিসের খরচ হিসেবে মাসিক ১৮,০০০ রুপি, সংসদীয় এলাকা ভাতা ১২,০০০ রুপি, বার্ষিক ৫০ হাজার ইউনিট বিদ্যুৎ, ২৫ হাজার ইউনিট ভোল্ট, ৪ হাজার কিলোলিটার পানি, পাঁচ বছর সদস্য থাকলে মাসিক ৮,০০০ রুপি পেনশন এবং পাঁচ বছরের বেশি প্রতি বছরে মাসিক ৮০০ রুপি অতিরিক্ত, বার্ষিক ৫ হাজার স্থানীয় টেলিফোন কল, প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার সমপর্যায়ের চিকিৎসা ভাতা, বিনামূল্যে রেলপথে যাতায়াতের জন্য প্রথম শ্রেণীর কামরা, এবং সংসদ চলাকালীন সংসদীয় এলাকা থেকে সংসদে যোগ দেওয়ার জন্য বিনামূল্যে বিমান টিকিট এবং বিমান ভাড়ার এক চতুর্থাংশ নগদ অর্থ পেয়ে থাকেন। ***সূত্র:*** <http:\\mpa.nic.in./a1 chap8.html>

[৮৮] বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন <www.parliament.uk/about/how/members/mps_contact.cfm>

সংসদ সদস্যদের আইন প্রণয়ন বা দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আরও বেশি মনোযোগী হতে নিজ এলাকার জনগণের সাথে ঘন ঘন যোগাযোগের প্রয়োজন নেই বলেও মুখ্য তথ্যদাতারা জানান। তাঁদের মতে সংসদ সদস্যদের নিয়মিত সংসদে উপস্থিত হতে হবে, বিভিন্ন কমিটিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে, জাতীয় সমস্যার সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, দেশের স্বার্থ রক্ষার্থে ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কে কূটকৌশলী ও দূরদর্শী হতে হবে, এবং নিজ দেশের ভাবমূর্তি রক্ষার্থে যথার্থভাবে দেশকে প্রতিনিধিত্ব করতে হবে। এ কারণে তাঁদের পুরো সময়ের জন্যই আইন-প্রণেতা হতে হবে। এলাকার উন্নয়ন বা মানুষের ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধানে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এটা সফল হলে সংসদ সদস্যের সাথে এলাকার জনগণের যোগাযোগ করার প্রয়োজন আর থাকবে না।

আমাদের দেশে এখনও যেহেতু স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত নয়, স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়নে সংসদ সদস্যর হস্তক্ষেপ থাকে, জনগণের সাথে সংসদ সদস্যর সুসম্পর্ক থাকে, সেহেতু জনগণ সংসদ সদস্যের সাথে যোগাযোগ করতে চান বেশি এবং তাঁদের প্রায় ৮৩% সরাসরি দেখা করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন বলে জরিপে মত দেন।

সারণি ৪.৬: জনগণ সংসদ সদস্যের সাথে যেভাবে যোগাযোগ করতে চায়

দেখা করার উপায়	*সংখ্যা*	*শতকরা হার*
সরাসরি দেখা করে	২৬১৬	৮১.৮
ফোনে কথা বলে	৬১০	১৯.১
অন্য কারোর মাধ্যমে	২৩৬	৭.৪
চিঠি/ইমেইল	৭৪	২.৩
জানি না	৯	০.৩

** একাধিক উত্তর প্রযোজ্য*

যেসব উত্তরদাতা সংসদ সদস্যের সাথে সরাসরি দেখা করতে চান বলে জানান তাদের ৪৯% সংসদ সদস্যের বাড়িতে দেখা করার কথা বলেন। এছাড়াও এলাকায় সংসদ সদস্যর নিজস্ব অফিসে গিয়ে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন ৩৩.৪%। তবে জনগণের কাছ থেকে সংসদ সদস্যদের জন্য এলাকায় সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত একটি অফিসের প্রত্যাশা জানা যায়, যেখানে জনগণ তাঁর সাথে দেখা করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন। একই মতামত বেশ কয়েকজন সাবেক সংসদ সদস্য এবং মুখ্য তথ্যদাতার কাছ থেকেও এসেছে যারা এই ধরনের অফিস পরিচালনায় পর্যাপ্ত কর্মচারীসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বরাদ্দর কথাও উল্লেখ করেন।

অন্যদিকে অনেকে মত দেন যে এটা করা হলে স্থানীয় সরকারের সাথে সংসদ সদস্যর ক্ষমতাগত দ্বন্দ্ব তৈরি হবে। জনগণ ভোট দিয়ে সংসদ সদস্যকে নির্বাচিত করে আইন প্রণয়ন ও জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে, অন্যদিকে অরাজনৈতিক স্থানীয় সরকার নির্বাচন করে স্থানীয় এলাকার উন্নয়নে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য। আমাদের দেশে স্থানীয় সরকার বা তাদের উন্নয়ন কাজে সংসদ সদস্যদের হস্তক্ষেপ থাকায় স্থানীয় সরকার শক্তিশালী হতে পারছে না। কিন্তু জনগণের প্রকৃত উন্নয়ন করতে হলে স্থানীয় সরকারকে অবশ্যই সংসদ সদস্যদের ক্ষমতার বাইরে নিয়ে আসতে হবে। এ প্রেক্ষাপটে স্থানীয় পর্যায়ে সংসদ সদস্যর জন্য সরকারি ভাবে অফিস করা হলে স্থানীয় সরকার আরও দুর্বল হয়ে যাবে বলে তারা মনে করেন।

সারণি ৪.৭: সংসদ সদস্যের সাথে কোথায় দেখা করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে

দেখা করার পছন্দনীয় স্থান	*সংখ্যা*	*শতকরা হার*
সংসদ সদস্যের বাড়িতে	১০৬৫	৪৯.০
এলাকায় সংসদ সদস্যর নিজস্ব অফিসে	৭২৯	৩৩.৪
স্থানীয় পার্টি অফিসে	৩৭৫	১৭.২
জানি না	১২	০.৫

** একাধিক উত্তর প্রযোজ্য*

মাত্র ১৭.২% উত্তরদাতা সংসদ সদস্যর পার্টি অফিসে দেখা করতে চান বলে মত দেন। এর কারণ হিসেবে এফজিডি থেকে জানা যায়, একজন প্রার্থী একটি রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন পেয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলেও সংসদ সদস্যের দায়িত্ব পাওয়ার পর দল-মত নির্বিশেষে এলাকার প্রতিনিধিত্ব করবেন। সকল মানুষ তাঁর কাছে সমান সুযোগ পাবে, সংসদীয় এলাকার প্রতিটি স্থানের সমস্যার সমাধানে সমান নজর দেবেন। তাই সংসদ সদস্য যদি স্থানীয় পার্টি অফিসে বসেন তবে তিনি পার্টির নেতা কর্মী পরিবেষ্টিত হয়ে থাকবেন। এ পরিবেশে বিরোধী দলের বা ভিন্ন মতের কোনো ব্যক্তি তার সমস্যা নিয়ে যেতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন না।

সংসদ সদস্যের সাথে স্থানীয় জনগণের যোগাযোগ করার প্রয়োজন আছে বলেই সাধারণ জনগণ তাঁকে সংসদীয় এলাকায় একটি

নির্দিষ্ট সময়ে দেখতে চায়। এফজিডি থেকে জানা যায়, পূর্বে অনেক সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর আর এলাকায় যাননি, বা হঠাৎ কোনো মন্ত্রীর সাথে নির্বাচনী এলাকায় গেছেন কিন্তু এলাকার মানুষের সাথে যোগাযোগ করেননি। জনগণের অভিযোগ নির্বাচনের আগে তাঁরা ভোটের জন্য মানুষের দ্বারে দ্বারে গেছে, নির্বাচিত হলেও জনগণের সাথে সম্পর্ক থাকবে এবং এলাকার প্রয়োজনে তিনি সর্বদা জনগণের সাথে থাকবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে তার প্রতিফলন ঘটে না। জরিপের ফলাফলে তাই দেখা যায়, সংসদ সদস্যদের নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায় এক মাসে কমপক্ষে ৪ থেকে ৭ দিন উপস্থিত থাকার কথা বলেছেন প্রায় ৩৫%, তিন দিন উপস্থিত থাকার জন্য মত দিয়েছেন প্রায় ৩২%। এফজিডি থেকে আরো জানা যায়, সংসদ সদস্যদের যেহেতু আরও অনেক কাজ থাকে, তাদের ঢাকায় বিভিন্ন প্রয়োজনে থাকতে হয়, দেশের বাইরে যেতে হয়, তাই যখন সংসদ অধিবেশন চলবে না তখন তারা মাসে মাত্র কয়েকদিন সংসদ সদস্যকে কাছে পেতে চায়। এর মাধ্যমে তাঁরা এলাকার সমস্যা সম্পর্কে তাঁদের অবহিত করতে পারবেন।

সারণি ৪.৮: সংসদ না চলাকালীন মাসে কমপক্ষে কতদিন জনগণ সংসদ সদস্যকে এলাকায় দেখতে চায়

দিন	*সংখ্যা*	*শতকরা হার*
৪-৭ দিন	৯৬২	৩৪.৭
কমপক্ষে তিন দিন	৯১০	৩২.৪
দু'সপ্তাহ	৪১৬	১৫.০
দু'সপ্তাহের উর্ধ্বে	৪০৩	১৪.৫
জানি না	৮৪	৩.০
মোট	২৭৭৫	১০০.০

এক্ষেত্রে এমনও মত এসেছে যে, সংসদ অধিবেশনের বাইরে যে সময় থাকবে তার পুরোটা সংসদ সদস্যদের নিজ নিজ এলাকায় থাকা উচিত। এতে তিনি এলাকার সমস্যার সমাধানে আরো সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারবেন বলে অনেক উত্তরদাতা মনে করেন। সংসদ অধিবেশনের বাইরে সংসদ সদস্যরা নিজ প্রয়োজনে বা ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ঢাকায় থাকেন, নিজ এলাকার জনগণের কথা ভুলে যান। আবার নির্বাচনের সময় আসলে এলাকায় থাকতে শুরু করেন। এতে সংসদ সদস্য হিসেবে জনগণের কাছে প্রদত্ত অঙ্গীকার ক্ষুণ্ন হয় বলে তারা মনে করেন।

৪.৪ উপসংহার

দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে রাজনৈতিক দল ও সংসদ সদস্যদের সম্পর্কে জনগণকে যথাযথভাবে অবহিত করতে হবে। এ ব্যাপারে রাজনৈতিক দলই মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলো এ ব্যাপারে কারও কাছে কোনো জবাবদিহিতা করতে চায় না বিধায় সংসদীয় নির্বাচনের প্রার্থীরা হাইকোর্টের আদেশ থাকার পরও তাঁদের ব্যক্তিগত আটটি তথ্য নির্বাচন কমিশনে জমা দেয় না বা অতিরঞ্জিত তথ্য প্রদান করে। অন্যদিকে নির্বাচন কমিশনের দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং রাজনৈতিক দলের কাছে গ্রহণযোগ্যতা না থাকায় এ ব্যাপারে তাদের একক সাংবিধানিক ক্ষমতা থাকার পরও তার প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে জনগণ প্রার্থী সম্পর্কে সঠিকভাবে না জেনে ভোট দিচ্ছেন। এর মাধ্যমে অযোগ্য প্রার্থীরাও অর্থের দৌরাত্ম্যে ও পেশীশক্তির প্রভাবে নির্বাচিত হয়ে আসেন, যারা সংসদে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারেন না। অথচ সংসদ সদস্যরা জাতির কাছে রোল মডেল হতে পারেন, একজন স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত মানুষ সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য। এজন্য তাঁদের যাবতীয় ব্যক্তিগত তথ্য, আয়-ব্যয়ের হিসাব যথাযথভাবে জনগণের সম্মুখে প্রকাশ করতে হবে।

সংসদ সদস্যরা জন-প্রতিনিধি হিসেবে তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য সংসদের নিকট থেকে পারিশ্রমিক ও ভাতাদি পেয়ে থাকেন, কিন্তু আমাদের দেশের সংসদ বেশির ভাগ অকার্যকর থাকায় সংসদ সদস্যরা নিয়মিত উপস্থিত থাকেন না, বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বেশি ব্যস্ত থাকায় সংসদে সময় দেন না। এ প্রেক্ষাপটে জনগণের কাছ থেকে তাঁদের অনুপস্থিতির জন্য বেতন-ভাতা কর্তনের সুপারিশ আসে। তবে অর্থের ব্যাপক অবমূল্যায়ন ও জীবন যাত্রার মান ঠিক রাখতে ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় সংসদ সদস্যদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধির জন্য জোর দাবি আসে। এর মাধ্যমে দুর্নীতিও হ্রাস পেতে পারে বলে অনেকে মনে করেন।

সংসদ সদস্যরা একটি নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত হওয়ায় সে এলাকার জনগণ এলাকার বা ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধানে তাঁদের সাথে সরকার নির্ধারিত কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে চান। এজন্য সংসদ সদস্যরা নিয়মিত এলাকায় যাবেন এবং নির্দিষ্ট সময়ে দল-মত নির্বিশেষে সকল মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখবেন। অনেকে মত দেন যে, সংসদ সদস্যদের উচিত তাঁদের নিজস্ব এখতিয়ার সম্পর্কে জনগণকে অবগত করানো এবং নির্বাচনে জনগণকে অন্যায্য প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিক্‌ভ্রান্ত না করা। এর মাধ্যমে জনগণ সংসদ সদস্য ও স্থানীয় সরকারের এখতিয়ার সম্পর্কে অবগত হবেন। তখন তারা আর সংসদ সদস্যর নিকট থেকে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে দ্বারস্থ হবেন না। স্থানীয় সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা হ্রাস পেতে পারে এমন কিছু করবেন না, বরং স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবেন।

অধ্যায় পাঁচ
সংসদ সদস্যের ভূমিকা

সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় আইন প্রণয়ন সংসদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলেও একমাত্র কাজ নয়। প্রতিনিধিত্ব এবং তদারকিও সংসদের অন্যতম প্রধান কাজ। সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে সংসদের ভিতরে ও বাইরে বিভিন্ন কাজে জড়িত থাকেন যা অনেক ক্ষেত্রেই জনগণ সহজভাবে মেনে নিতে পারেন না। জনগণের দৃষ্টিতে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা কী কী হতে পারে তা বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যে মাঠপর্যায় থেকে জরিপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, এফজিডি, কর্মশালা এবং বিশিষ্ট তথ্যদাতাদের মন্তব্য নেওয়া হয়। এ অধ্যায়ে জনগণের দৃষ্টিতে সংসদের ভিতরে ও বাইরে সংসদ সদস্যের ভূমিকা, অনুপস্থিতিজনিত কারণে সদস্যপদ বাতিল সংক্রান্ত আইন, আইন প্রণয়নের পূর্বে জনগণের মতামত নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা এবং নারী সদস্যদের নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে।

৫.১ জনগণের দৃষ্টিতে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা

সংসদ সদস্যরা সংসদের ভেতরে এবং বাইরে বিভিন্ন পর্যায়ে দেশ ও জনগণের কল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত করেন। জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে দেশ ও জনগণের কল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত করাই সংসদ সদস্যদের মুখ্য ভূমিকা বলে বিবেচিত। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, সংসদ সদস্যরা সংসদের বাইরে এমন কাজে জড়িত হন যা অনভিপ্রেত হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রায় ক্ষেত্রেই তাঁরা স্থানীয় সরকারের কার্যকলাপে এমন সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন যা স্থানীয় সরকারের কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ এবং স্থানীয় সরকার শক্তিশালী হওয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করে। এর পেছনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে জনগণের অজ্ঞতা ও সংসদ সদস্যদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি।

সংসদ সদস্যদের ভূমিকাকে দুই ক্ষেত্রে ভাগ করা যেতে পারে — সংসদের বাইরে বিশেষ করে স্থানীয় পর্যায়ে, এবং সংসদের ভেতরে।

৫.১.১ স্থানীয় পর্যায়ে সংসদ সদস্যের ভূমিকা

গবেষণায় দলীয় আলোচনা ও মুখ্য উত্তরদাতাদের প্রায় সকলেই মনে করেন, সংসদ সদস্যদের নিজ নিজ এলাকার অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত থাকা উচিত নয়। তবে তাঁরা স্থানীয় সরকার এলাকার অবকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা তদারকি করবেন এবং এর ওপর প্রতিবেদন তৈরি করে সংসদে তা উপস্থাপন করবেন। কিন্তু স্থানীয় প্রশাসনে (জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) হস্তক্ষেপ কোনো অর্থেই কাম্য নয় এবং তা একজন সংসদ সদস্যের এখতিয়ারভুক্তও নয়। স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা কমিটিতেও (যেমন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা) সংসদ সদস্যের থাকা উচিত নয়।

সারণি ৫.১: স্থানীয় পর্যায়ে জনগণ সংসদ সদস্যদের যে ভূমিকায় দেখতে চায়

ভূমিকা	*দেখতে চাই না*	*খুব কম দেখতে চাই*	*মাঝে মাঝে দেখতে চাই*	*নিয়মিত দেখতে চাই*
অবকাঠামোগত উন্নয়ন	০.৩	০.৩	৯.৩	৯০.০
ব্যক্তিগত পর্যায়ে জনগণকে সেবা দেওয়া	১.৫	১.২	১৭.০	৮০.৩
স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে তদারকি করার ভূমিকা	১.৭	৩.৭	২৬.৭	৬৭.৯
প্রকল্প বাস্তবায়নে হস্তক্ষেপ	৬৯.৮	১১.৬	৬.৩	১২.৩
স্থানীয় পর্যায়ে আইন-শৃঙ্খলা তদারকি	৮.২	৩.৫	১৯.৭	৬৮.৭
স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটির সভাপতি হিসেবে	২৩.৫	১৬.৪	২৭.৯	৩২.১

বর্তমান সময়ে একজন সংসদ সদস্যের ওপর ভোটারদের একটি মিথ্যা প্রত্যাশার জন্ম হয়েছে। একজন সংসদ সদস্যের মূল দায়িত্ব আইন প্রণয়ন করা। কিন্তু দেখা যায়, তাঁরা নিজ নির্বাচনী এলাকার অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সরাসরি যুক্ত থাকার ফলে সাধারণ মানুষের কাছে একটি প্রত্যাশা তৈরি হয় যে, সংসদ সদস্যরা নির্বাচিত হয়ে এলাকার রাস্তা-ঘাট, স্কুল-কলেজ, কালভার্ট ইত্যাদি নির্মাণ করে দিবেন। এমনকি তারা মনে করেন, চাকরি দেওয়া বা ব্যবসায়িক প্রয়োজনেও সংসদ সদস্য সুপারিশ করবেন। সাধারণ জনগণের এই প্রত্যাশার প্রতিফলন জরিপেও পাওয়া যায়।

জরিপে দেখা যায়, ৯০% জনগণ অবকাঠামো উন্নয়নে সংসদ সদস্যদের অংশগ্রহণ আশা করেন, এবং ৮০.৩% ব্যক্তিগত কাজে সংসদ সদস্যদের দেখতে চান। ৬৭.৩% জনগণ স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে তদারকির ভূমিকায় তাঁদের দেখতে চাইলেও প্রায় ৭০% প্রকল্প বাস্তবায়নে হস্তক্ষেপ আশা করেন না। ৬৮.৭% জনগণ স্থানীয় পর্যায়ে আইন-শৃঙ্খলা তদারকির কাজে তাঁদের দেখতে চান। ৪০% জনগণ স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটিতে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের ভূমিকায় তাঁদের দেখতে চান না বা খুব কম দেখতে চান। তবে দলীয় আলোচনায় এবং মুখ্য উত্তরদাতারা মনে করেন, নিজ এলাকার অবকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কাজে সংসদ সদস্যের জড়িত থাকা উচিত নয়। এমনকি তাঁদের কোনো কমিটির (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়) সভাপতি বা সদস্য হওয়াও উচিত নয়। উদাহরণ হিসেবে তথ্যদাতারা বলেন, অতীতে সংসদ সদস্যদের বিভিন্ন স্থানীয় কমিটিতে উপদেষ্টা বা সভাপতি করা হয় কিন্তু তাঁরা নিজেদের সেই সকল প্রতিষ্ঠানের মালিক মনে করে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন।

> "পত্র-পত্রিকায় আপনারা সবাই দেখেছেন একজন খুনি এমপি, মেয়র এবং মন্ত্রী হয়েছেন। তারা কেবল মানুষের অধিকার ক্ষুন্ন করেছেন। মানুষের জন্য কাজ করার প্রয়োজন মনে করেননি।"
>
> "যে লঙ্কায় যায় সেই হয় রাবণ।"
>
> "এমপিরা ক্ষমতায় গিয়ে নিজের পকেট বোঝাই করে আর তার চ্যালা ফ্যালাদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে, সাধারণ মানুষের তেমন কোন উপকার করেনা"

বিশিষ্ট তথ্যদাতাদের অনেকে মনে করেন, স্থানীয় প্রশাসনে হস্তক্ষেপ রোধ করতে কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকারের কাজের সীমারেখা নির্দিষ্ট করা উচিত। এজন্য সংসদের বাইরে সংসদ সদস্যদের কাজ কী হবে সে সম্পর্কে স্পষ্ট দিক নির্দেশনা তৈরি করতে হবে। এতে স্থানীয় প্রশাসনে সংসদ সদস্যের অযাচিত হস্তক্ষেপ রোধ হবে। দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা মনে করেন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত সদস্যরা যেন কোনোভাবেই কোনো রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠনের ভূমিকা পালন করতে না পারেন তা নিশ্চিত করতে হবে। আলোচকরা আরও বলেন, জনগণের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ, খাদ্য বা অন্য কোনো সাহায্য বা ত্রাণ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে সরাসরি স্থানীয় সরকারের নামে পাঠাতে হবে। তাহলে স্থানীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে দলীয়করণ হ্রাস পাবে।

৫.১.২ সংসদে সংসদ সদস্যের ভূমিকা

এলাকার অবকাঠামোগত উন্নয়নের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার কারণে একজন সংসদ সদস্য তার মূল যে দায়িত্ব — আইন প্রণয়ন, সংসদে জনস্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ে বিতর্ক, এবং সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে সরকারের কাজের তদারকি ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা — তা থেকে একজন সংসদ সদস্য সরে আসছেন।[৮৯] গবেষণার জরিপে দেখা যায়, উত্তরদাতাদের ৮৭% সংসদে এলাকার সমস্যা তুলে ধরার কাজে, ৮২.৬% আইন প্রণয়নের কাজে, ৮৯.২% সরকারকে জবাবদিহি করার ভূমিকায়, এবং ৭২.৪% স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে সরকারের কাজ তদারকি করার ভূমিকায় সংসদ সদস্যদের দেখতে চান।

সারণি ৫.২: জনগণ সংসদ সদস্যদের যে ভূমিকায় সংসদে দেখতে চান

ভূমিকা	*দেখতে চাই না*	*খুব কম দেখতে চাই*	*মাঝে মাঝে দেখতে চাই*	*নিয়মিত দেখতে চাই*
সংসদে এলাকার সমস্যা তুলে ধরা	০.২	০.১	১২.৭	৮৭.০
জনগণের কল্যাণে আইন প্রণয়ন করা	০.৩	০.৪	১৬.৮	৮২.৬
সরকারকে জনগণের কাছে জবাবদিহি করা	০.৪	০.৯	১৯.৪	৮৯.২
স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে সরকারের কাজ তদারকি	০.৪	১.৪	২৫.৮	৭২.৪

৫.২ প্রাণবন্ত সংসদ

গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী করতে সংসদকে কার্যকর করা অত্যাবশ্যক। একটি প্রাণবন্ত সংসদ জনগণের প্রত্যশা। আর এরূপ সংসদ গড়ে তোলার পূর্বশর্ত সংসদ অধিবেশনসহ সংসদীয় কমিটির সভাগুলোতে সংসদ সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। সংসদকে প্রাণবন্ত করার জন্য সংসদ সদস্যদের ভূমিকা সংক্রান্ত বিষয়ে জরিপ, দলীয় আলোচনা এবং মুখ্য উত্তরদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে একটি পর্যালোচনা করা হল।

৫.২.১ সংসদ সদস্যের সংসদে উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা

জাতীয় সংসদে সংসদ সদস্যদের নিয়মিত উপস্থিতি একান্ত কাম্য। কিন্তু গত সংসদের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, সংসদে যোগদানের ব্যাপারে তাঁদের অনাগ্রহ সংসদীয় কার্যক্রমে অচলাবস্থার সৃষ্টি করে। অষ্টম জাতীয় সংসদে প্রধান বিরোধী দলের লাগাতার সংসদ বর্জন এবং সরকারি দলের সদস্যদের সংসদে যোগদানে অনাগ্রহ সংসদের মূল উদ্দেশ্য পূরণের পথে বাধা সৃষ্টি

[৮৯] আরও জানতে দেখুন, তানভীর মাহমুদ, *গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে অষ্টম জাতীয় সংসদ (২০০১-২০০৬)*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০০৭; Fahreen Alamgir, Tanvir Mahmud and Iftekharuzzaman, Corruption and Parliamentary Oversight: Primacy of the Political Will", Transparency International Bangladesh, 2007.

করে। অনেক সংসদ সদস্য সংসদে যোগদানের তুলনায় জন-সংযোগে বেশি ব্যস্ত ছিলেন। জরিপে দেখা যায়, উত্তরদাতাদের ৯৬.২% সংসদ চলাকালীন সংসদ সদস্যের সংসদে নিয়মিত উপস্থিত থাকা অপরিহার্য বলে মত দিয়েছেন (সারণি ৫.৩)।

সারণি ৫.৩: সংসদ চলাকালীন সংসদ সদস্যের সংসদে উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা

সংসদ চলাকালীন উপস্থিতি	*সংখ্যা*	*শতকরা হার*
নিয়মিত উপস্থিত থাকা অপরিহার্য	৩০৭২	৯৬.২
মাঝে মাঝে উপস্থিত থাকতে পারে	৪২	১.৩
উপস্থিত নাও থাকতে পারে	১৫	০.৫
জানি না	৬৬	২.১
মোট	***৩১৯৫***	***১০০.০***

৫.২.২ সংসদ চলাকালীন সংসদে অনুপস্থিত থাকার বিষয়ে সংসদকে অবহিত করার প্রয়োজনীয়তা

অধিকাংশ মুখ্য উত্তরদাতা এবং দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা মনে করেন, যেহেতু জনগণের করের টাকায় সংসদ সদস্যদের ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়, কাজেই সংসদ চলাকালীন তাঁদের অবশ্যই সংসদে উপস্থিত থাকা উচিত। সংসদে উপস্থিত থেকে এলাকার সমস্যা সংসদে তুলে ধরে নীতি প্রণয়ন করার জন্যই জনগণ তাঁদের নির্বাচিত করেন। যদি কোনো কারণে তিনি উপস্থিত থাকতে না পারেন তবে সংসদকে অবশ্যই জানানো উচিত। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ৯৩.২% এই যুক্তির পক্ষে মত দেন।

সারণি ৫.৪: সংসদ চলাকালীন সংসদে অনুপস্থিত থাকার বিষয়ে সংসদকে অবহিত করার প্রয়োজনীয়তা

অনুপস্থিতির বিষয়ে সংসদকে অবহিত করা	*সংখ্যা*	*শতকরা হার*
প্রয়োজন আছে	২৯৭৮	৯৩.২
প্রয়োজন নেই	৬২	১.৯
জানি না	১৫৫	৪.৯
মোট	৩১৯৫	১০০.০

৫.২.৩ অনুপস্থিতিজনিত কারণে সদস্যপদ বাতিল সংক্রান্ত বিধান বিষয়ে মতামত

সংসদ সদস্যরা জনগণের কাছে সার্বক্ষণিকভাবে দায়বদ্ধ। সংবিধানের ৬৭ (খ) অনুচ্ছেদ অনুসারে কোনো সংসদ সদস্য সংসদকে অবহিত না করে একাদিক্রমে ৯০ বৈঠক দিবস অনুপস্থিত থাকলে তাঁর সদস্য পদ শূন্য হবে। অনেক সংসদ সদস্যকেই এই সুযোগের অপব্যবহার করতে দেখা যায়। অষ্টম সংসদে ৩০০ সংসদ সদস্যদের গড় উপস্থিতি ছিল ৫৫%। মাত্র ৭৪ জন সংসদ সদস্য (২৪.৮%) তিন-চতুর্থাংশের বেশি কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন, এবং ১০৪ জন সংসদ সদস্য (৩৪.৭%) অর্ধেকের বেশি কার্যদিবসে অনুপস্থিত ছিলেন।[৯০] অষ্টম সংসদের কার্যক্রম শুরু হয় প্রধান বিরোধী দলের সংসদ বর্জনের মধ্য দিয়ে এবং মোট ৩৭৩ কার্যদিবসের মধ্যে ২২৩ কার্যদিবস (মোট কার্যদিবসের প্রায় ৬০%) প্রধান বিরোধী দল দলীয় সিদ্ধান্তে সংসদ বর্জন করে। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, অনেক সংসদ সদস্য তাঁদের সদস্যপদ ধরে রাখতে ৯০ কার্যদিবসের আগেই সংসদে যোগদান করে আবার কিছুক্ষণের মধ্যেই সংসদ কক্ষ ত্যাগ করেন। [৯১] সংসদ অধিবেশন চলাকালীন বিনা কারণে সংসদে অনুপস্থিত থাকা জনগণের সঙ্গে প্রতারণার সামিল বলে গবেষণায় অংশগ্রহণকারী অনেকে মত দেন। সাধারণ জনগণ মনে করে, ৮৯ বৈঠক দিবস পর্যন্ত সংসদে অনুপস্থিত থাকতে পারবেন এমন বিধান থাকা উচিত নয়। সরকারি দলের সদস্যদের অনিয়মিত উপস্থিতিও কাম্য হতে পারে না। জরিপে ৮১.৭% অংশগ্রহণকারী অনুপস্থিতিজনিত কারণে সদস্যপদ বাতিল সংক্রান্ত বর্তমান সাংবিধানিক বিধান সমর্থন করেন না বলে জানান। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ৭০.৭% এবং দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা অনুপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা ৯০ বৈঠক দিবসের পরিবর্তে ৩০ বৈঠক দিবসের কম যেকোনো সীমা নির্ধারণ করার পক্ষে মত দেন।

সারণি ৫.৫: সংসদে অনুপস্থিতির কারণে সদস্যপদ বাতিল সংক্রান্ত বর্তমান বিধানের ওপর মতামত

মতামত	*সংখ্যা*	*শতকরা হার*
সর্বোচ্চ ৯০ কার্যদিবস অনুপস্থিতির অনুমতি সমর্থন করেন না	২৬০৮	৮১.৭
সর্বোচ্চ ৯০ কার্যদিবস অনুপস্থিতির অনুমতি সমর্থন করেন	২৮০	৮.৮
জানি না	৩০৩	৯.৫
মোট	৩১৯১	১০০.০

[৯০] বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন তানভীর মাহমুদ, *গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে অষ্টম জাতীয় সংসদ (২০০১-২০০৬)*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০০৭, পৃ. ৪৫-৪৬।

[৯১] আরও জানতে দেখুন, তানভীর মাহমুদ, *প্রাগুক্ত*।

সারণি ৫.৬: অনুপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমার ওপর জনগণের মতামত

বৈঠক দিবসের সংখ্যা	*মতামতের সংখ্যা*	*শতকরা হার*
৩০ বৈঠক দিবসের কম	১৮৪৪	৭০.৭
৩০-৪০ বৈঠক দিবস	৪৬৯	১৮.০
৪১-৫০ বৈঠক দিবস	১৬৩	৬.৩
৫০ - ৯০ বৈঠক দিবস	৯৯	৩.৮
জানি না	৩৩	১.৩
মোট	**২৬০৮**	**১০০.০**

এফজিডি ও মুখ্য তথ্যদাতাদের মতামত অনুযায়ী অসুস্থতা বা রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছাড়া একজন সংসদ সদস্যের সংসদ অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকা উচিত নয়। বিশেষ প্রয়োজনে বাইরে থাকতে হলেও অবশ্যই সংসদকে জানানো উচিত। সংসদকে অবহিত করা ছাড়া একজন সংসদ সদস্য সংসদে অনুপস্থিত থাকলে তার বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান, যেমন বেতন-ভাতা কর্তন, সদস্যপদ বাতিল, শোকজ নোটিশ প্রদান ইত্যাদির বিধান রাখা উচিত বলে অনেকে মত দেন। জরিপে মতামত প্রদানকারীদের প্রায় ৮৬% মনে করেন, সংসদকে অবহিত করা ছাড়া সংসদে অনুপস্থিত থাকলে বেতন-ভাতা পাওয়া উচিত নয়।

তবে জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ৮.৮% বর্তমান বিধানের পক্ষে মতামত দিয়ে বলেন সরকারি দলের সদস্যদের স্বেচ্ছাচারিতা, স্পিকারের পক্ষপাতিত্ব, বেসরকারি সংসদ সদস্যদের বিল বা মতামতের প্রতি অবজ্ঞা ইত্যাদি কারণে বিরোধী দলের সংসদ বর্জন করার অধিকার থাকা উচিত। মুখ্য উত্তরদাতাদের অনেকে এই যুক্তির বিপক্ষে মত দিলেও অধিকাংশ মনে করেন অনুপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা ৯০ বৈঠক দিবসের পরিবর্তে ৩০ বৈঠক দিবস করা উচিত। মুখ্য উত্তরদাতাদের কয়েকজন মনে করেন আইন করে সংসদ সদস্যদের মর্যাদার কথা ভেবে তাঁদের বেতন-ভাতা কর্তন করা ঠিক হবে না, তবে সংসদ সদস্যেরই উচিত সংসদে অনুপস্থিত থাকলে বেতন-ভাতা না নেওয়া।

৫.৩ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সংসদ সদস্যের ভূমিকা

প্রতিটি সংসদীয় গণতান্ত্রিক দেশেই নির্বাচনী প্রচার প্রচারণার একটি অপরিহার্য অংশ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি প্রদান। বাংলাদেশের নির্বাচনী আবহে এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না, বরং প্রতিশ্রুতি প্রদানের মাত্রা অনেক বেশিই। রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী ইশতেহার প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন ইস্যুতে দলের অবস্থান প্রকাশ করে জনগণের রায় চায়, অন্যদিকে প্রার্থীরাও নিজ সংসদীয় এলাকার মানুষের রায় পাওয়ার আশায় এলাকাভিত্তিক প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। এ সকল প্রতিশ্রুতির অধিকাংশই উন্নয়নমুখী, যার মধ্যে রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট, স্কুল-কলেজ-মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ বা সংস্কার, নদী ভাঙ্গন রোধ, কর্ম-সংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[৯২]

প্রত্যেক প্রার্থী প্রতিটি নির্বাচনী জনসভায় অসংখ্য প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন, আবার বাড়ি বাড়ি পরিদর্শনে যেয়েও ব্যক্তিগত পর্যায়ে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দেন। এর মাধ্যমে তাঁরা জনগণের কাছাকাছি আসেন, জনগণ প্রার্থীদের এসব প্রতিশ্রুতির ওপর আস্থা রেখে তাঁদের ভোট দিয়ে বিজয়ী করেন। কিন্তু সব নির্বাচিত সংসদ সদস্যর পক্ষে বিভিন্ন কারণেই সব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। বিরোধী দলের অনেক সংসদ সদস্যই কম পরিমাণে, অনেক ক্ষেত্রে একেবারে কোনো উন্নয়ন বরাদ্দই পান না। এছাড়া ব্যক্তিগত কাজ, এলাকার জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা না থাকা, ভোটে বিজয়ী হয়ে নিজস্ব স্বার্থ চরিতার্থ করার মানসিকতা থাকার কারণে অনেক সংসদ সদস্যই তাঁর দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে পারেন না। এছাড়া নির্বাচনের সময় এমন প্রতিশ্রুতি তাঁরা দিয়ে থাকেন যেগুলো স্থানীয় সরকারের এখতিয়ারভুক্ত বলে তাঁদের পক্ষে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়, তা জেনেও ভোট পাবার আশায় তা করেন বলে মুখ্য তথ্যদাতাদের কাছ থেকে জানা যায়। জরিপের ফলাফলেও দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট এলাকার সাবেক সংসদ সদস্য নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে খুবই ভালো ভূমিকা রেখেছে বলে মত দিয়েছেন মাত্র ৪%, অন্যদিকে কোনো ভূমিকাই পালন করেননি বলে জানান প্রায় ১৭.৪%। তবে মোটামুটি ভূমিকা রেখেছেন বলে বেশিরভাগ (৩৭.২%) উত্তরদাতা মত দেন।

[৯২] উল্লেখ্য, নির্বাচনী আচরণ বিধিমালা অনুযায়ী কোনো প্রার্থী স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য কোনো অঙ্গীকার করতে পারবেন না। দেখুন *আচরণ বিধিমালা* **১৯৯৬**, ধারা ৩।

সারণি ৫.৭: স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সংসদ সদস্যের ভূমিকা

প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন	*সংখ্যা*	*শতকরা হার*
খুবই ভালো (৮০-১০০%)	১২৯	৪.০
ভালো (৬০-৮০%)	৩৮৮	১২.২
মোটামুটি (৪০-৬০%)	১১৮৮	৩৭.২
তেমন একটা না (২০-৪০%)	৫৬৪	১৭.৭
একদম না (<২০%)	৫৫৭	১৭.৪
জানি না	৩৬৬	১১.৫
মোট	৩১৯২	১০০.০

এফজিডি থেকে জানা যায়, জনগণ এখন সংসদ সদস্যদের প্রতিশ্রুতির বুলিকে তেমন গুরুত্ব দেন না। তারা জানেন, এসব প্রতিশ্রুরিত উদ্দেশ্য ভোট-প্রাপ্তি। তাই তাদের মধ্যে থেকে একটি দাবি এসেছে যে সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীরা তাঁদের প্রতিশ্রুতি লিখিত আকারে দেবেন এবং প্রতি বছর সেই প্রতিশ্রুতির কতটুকু পালন করেছেন বা কেন পালন করতে পারেননি তা জনগণের সম্মুখে হাজির হয়ে জবাবদিহি করবেন। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন জনগণের সাথে সংসদ সদস্যের একটি সুসম্পর্ক তৈরি হবে, অন্যদিকে সংসদ সদস্যরা প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে আরও তৎপর হবেন।

মুখ্য তথ্যদাতাদের কাছ থেকে স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়নকে লক্ষ্য করে প্রদত্ত নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি প্রদানের রীতির বিরুদ্ধে একটি ভিন্ন মত পাওয়া যায়। তাঁরা মনে করেন, স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন করবে স্থানীয় সরকার। মানুষের কাছের সরকার হিসেবে স্থানীয় সরকারকে আরও শক্তিশালী করতে পারলে জনগণের জন্য তা সুফল বয়ে আসবে। এজন্য সংসদ সদস্যদের স্থানীয় সরকারের কাজে হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। সংসদীয় নির্বাচনের প্রার্থীরা জাতীয় ইস্যু নিয়ে জনগণের ভোট চাইবেন, দলের ইশতেহারে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করবেন এবং নির্বাচিত হয়ে আসলে জাতীয় স্বার্থে কাজ করবেন। এর মাধ্যমে তাঁরা জাতীয় পর্যায়ের নেতা হবেন, আইন প্রণয়নে ব্যস্ত থাকবেন, দেশের প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেন-দরবার করবেন। এ সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে তাঁদের অবশ্যই স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন উদ্যোগের বাইরে রাখতে হবে বিধায় তাঁরা স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়নে কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারবেন না।

৫.৪ সংসদ সদস্যের কার্যক্রমের মূল্যায়ন ও জবাবদিহিতা: সংসদ সদস্য প্রত্যাহার[৯৩]

গত তিনটি সংসদীয় নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে পরিচালিত হয়। অনেকে মনে করেন গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্য এই নির্বাচনগুলো মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে। তবে বিভিন্ন কারণে এই সংসদগুলো কার্যকরভাবে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে পারেনি, এবং বেশিরভাগ নির্বাচিত সংসদ সদস্য তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের পাশাপাশি তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালনেও সফল হননি বলে জনগণ জানান। সংসদ সদস্যর অসংসদীয় ও দায়িত্বহীন আচরণ সম্পর্কে জনগণ অবগত হয়েও কিছু করতে পারে না কারণ তাঁরা পাঁচ বছরের জন্য ক্ষমতা পেয়েছেন।

এ প্রেক্ষাপটে সংসদ সদস্যদের কার্যক্রমের মূল্যায়ন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সংসদ সদস্য প্রত্যাহারের বিষয়ে এফজিডির অধিকাংশ অংশগ্রহণকারী ঐকমত্য প্রকাশ করেন। জরিপের উত্তরদাতারাও এর পক্ষে তাদের মতামত দেন। প্রায় ৭৬% উত্তরদাতা মনে করেন, সংসদ সদস্যরা নির্বাচনে দেওয়া প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন না করলে এবং সংসদে জনগণের প্রতিনিধিত্ব না করলে তাঁদের প্রত্যাহারের মাধ্যমে জবাবদিহিতার ক্ষেত্র সৃষ্টি করা যেতে পারে।

সারণি ৫.৮: সংসদ সদস্য প্রত্যাহারের ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে কিনা

প্রত্যাহার ব্যবস্থা	*সংখ্যা*	*শতকরা হার*
প্রয়োজন আছে	২৪২৩	৭৬.১
প্রয়োজন নেই	৫০৪	১৫.৮
জানি না	২৫৭	৮.১
মোট	৩১৮৪	১০০.০

তবে তাঁদের অনেকে তত্ত্বগতভাবে ধারণাটিকে সমর্থন করলেও মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রক্রিয়ার জটিলতা ও অস্পষ্টতার কারণে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সহনশীল ও পেশাদারী রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিরাজমান না থাকায় মধ্যবর্তী নির্বাচন প্রক্রিয়া এখনই প্রবর্তনের বিপক্ষে। যাঁরা সংসদ সদস্যদের জবাবদিহিতার ক্ষেত্র তৈরিতে মধ্যবর্তী নির্বাচন চান তাঁরা বলেন একটি নির্দিষ্ট সময়

[৯৩] সংসদ সদস্য প্রত্যাহারের প্রচলন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ফেডারেল স্টেটগুলো যেমন মিশিগান, লস এঞ্জেলেস, অরিগন, মিনেসোটা, এবং ভেনেজুয়েলা, কানাডার ব্রিটিশ কলাম্বিয়ায় রয়েছে।

(দুই বা তিন বছর) পর জনগণ সংসদ সদস্যের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে তাঁর ভূমিকার ওপর ভিত্তি করে তাদের রায় দেবেন নির্বাচন কমিশনের কাছে। নির্বাচন কমিশন সংসদ সদস্যের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালনে সফলতা ও ব্যর্থতার পেছনের কারণ বিশ্লেষণ করে জনগণের অভিযোগের সত্যতা যাচাই করবেন। পরবর্তীতে বেশিরভাগ জনগণের অভিযোগ প্রমাণিত হলে নির্বাচন কমিশন মধ্যবর্তী নির্বাচন দেবেন। এই নির্বাচনে অভিযুক্ত প্রার্থী অংশগ্রহণ করতে পারবেন কিনা সে ব্যাপারে দুটি মত পাওয়া যায়। কেউ বলেন গণতান্ত্রিক অধিকার হিসেবে দ্বিতীয়বার সুযোগ পাওয়া উচিত, আবার কেউ বলেন যেহেতু তিনি অযোগ্য হিসেবে প্রমাণিত হয়েছেন এবং জনগণ তাঁর বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে তাই দ্বিতীয়বার তাঁকে সুযোগ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। সর্বোপরি মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়াটি নিয়ে আরও আলোচনা ও বিতর্কের সুযোগও রয়েছে বলে তারা মনে করেন।

অন্যদিকে প্রায় ১৬% উত্তরদাতা সংসদ সদস্যদের প্রত্যাহারের ধারণাকে সমর্থন করেননি। তাদের মতে, একটি নির্বাচনে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। মধ্যবর্তী নির্বাচন ঘন ঘন হতে গেলে দরিদ্র দেশ হিসেবে আমাদের অর্থের ব্যাপক অপচয় হবে। তাছাড়া এই ধরনের ব্যবস্থায় বিরোধী দলগুলো সরকারি দলের সংসদ সদস্যদের ব্যর্থ করার নিরন্তর চেষ্টায় লিপ্ত থাকবে বলে মুখ্য তথ্যদাতা ও কর্মশালার অংশগ্রহণকারীরা মনে করেন। তাছাড়া সংসদ সদস্যরা যেহেতু পাঁচ বছরের জন্য জনগণের রায় পেয়েছে তাই তাঁদের সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা ঠিক হবে না। তাঁরা যদি সংসদের মেয়াদে কোনো অবদান না রাখেন এবং নিজ এলাকার মানুষের চাহিদা পূরণ না করেন তবে সেই এলাকার জনগণই সিদ্ধান্ত নেবে পরবর্তী নির্বাচনের তারা সেই সংসদ সদস্যকে জয়ী করবে না বিদায় জানাবে। তাদের মতে নির্বাচনই জবাবদিহিতার সবচেয়ে বড় মাধ্যম।

উপসংহার

সংসদীয় গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকারের কার্যকলাপে একটি সীমারেখা নির্ধারণ করে তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। একই সাথে সংসদকে প্রাণবন্ত ও কার্যকর করতে দল-মত নির্বিশেষে সংসদ সদস্যদের সংসদে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। সংবিধান সংশোধন ও জনগুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন বা সংস্কার করার আগে জনগণকে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে তা নিশ্চিত করতে হবে। পরিশেষে উন্নয়ন ও নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বর্তমানে প্রচলিত সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন প্রক্রিয়া পুনঃবিবেচনা পূর্বক সংশোধনের মাধ্যমে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন প্রবর্তন করা যেতে পারে। একইসাথে রাজনৈতিক দলগুলোকে আরও সতর্কতার সাথে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন দেওয়ার সময় শতকরা ২০-৩০% হারে নারী প্রার্থীদের মনোনয়ন নিশ্চিত করতে হবে।

অধ্যায় ছয়
কার্যকর সংসদ

কার্যকর সংসদ জনগণের প্রত্যাশা। সংসদকে কার্যকর করার প্রধান পূর্বশর্ত সংসদীয় কর্মকাণ্ডে সরকারি ও বেসরকারি সব সংসদ সদস্যের সক্রিয় অংশগ্রহণ, এবং সরকারি ও বিরোধী দলের দায়িত্বশীল ভূমিকা। এক্ষেত্রে স্পিকারের নিরপেক্ষ ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংসদকে কার্যকর করতে হলে সরকারি ও বিরোধী উভয় দলকেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। জনগণের দৃষ্টিতে সংসদ কিভাবে কার্যকর হতে পারে তা বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যে মাঠ পর্যায় থেকে জরিপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, এফজিডি, কর্মশালা এবং বিশিষ্ট তথ্যদাতাদের মন্তব্য নেওয়া হয়। এ অধ্যায়ে জনগণের দৃষ্টিতে সংসদের মেয়াদ, সংসদে সরকারি দলের নেতা ও বিরোধী দলের নেতার অংশগ্রহণ, স্থায়ী কমিটির কার্যকারিতা, স্পিকারের নিরপেক্ষ ভূমিকা, আইন প্রণয়নের পূর্বে জনগণের মতামত নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা, এবং সংরক্ষিত আসনে নারী সদস্যদের নির্বাচন প্রক্রিয়ার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

৬.১ সংসদের মেয়াদ

বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে জাতীয় সংসদের মেয়াদ পাঁচ বছর।[৯৪] গবেষণার জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ৮৬.৫% সংসদের বর্তমান মেয়াদ অর্থাৎ পাঁচ বছরকে সমর্থন করেন।

সারণি ৬.১: পাঁচ বছর মেয়াদী সংসদ সমর্থন করেন কিনা

সংসদের মেয়াদ পাঁচ বছর	*সংখ্যা*	*শতকরা হার*
সমর্থন করেন	২৭৫৭	৮৬.৫
সমর্থন করেন না	৩৮৫	১২.১
জানি না	৪৭	১.৫
মোট	৩১৮৯	১০০.০

তবে জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ১২.১% এই মেয়াদ পরিবর্তনের কথা বলেন। যারা মেয়াদ পরিবর্তনের কথা বলেছেন, তাদের প্রায় ৫৬% সংসদের মেয়াদ ৩ বছর এবং ২৮% ৪ বছর হওয়া উচিত বলে মত প্রকাশ করেন। মুখ্য উত্তরদাতাদের অনেকেই সংসদের মেয়াদ চার বছরের পক্ষে মত দেন। কারণ হিসেবে তাঁরা বর্তমানে প্রচলিত পাঁচ বছর মেয়াদের শেষ বছর সংসদ সদস্যরা কোনো কাজ করেন না বলে জানান।

৬.২ সংসদ অধিবেশনের কার্যক্রম গণমাধ্যমে প্রচার

অষ্টম সংসদের কার্যক্রম 'রেডিও বাংলাদেশ' সরাসরি প্রচার করে। সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বাংলাদেশ টেলিভিশন অষ্টম সংসদের প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব ও বাজেট অধিবেশনের কিছু অংশ প্রচার করে। তবে গত সংসদে বেসরকারি রেডিও ও টেলিভিশন চ্যানেলের সংবাদকর্মীদের প্রশোধিকার ছিল না। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ৯৬.১% সংসদ অধিবেশনের কার্যক্রম প্রচার করা উচিত বলে মনে করেন। তাদের মতে, সংসদ অধিবেশন চলার সময় এর সকল কার্যক্রম প্রচার করা উচিত। এজন্য আলাদা টিভি এবং রেডিও চ্যানেল থাকতে পারে। তবে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকের আলোচনা সরাসরি প্রচার না করে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত গোপন বিষয় ছাড়া বৈঠকের অন্য সকল বিষয়ের ওপর কার্যবিবরণী করে তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা উচিত বলে জনগণ মত প্রকাশ করেন। মুখ্য তথ্যদাতা ও দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের প্রায় সকলেই মনে করেন, সংসদ অধিবেশন চলাকালীন প্রবেশাধিকারের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা থাকা উচিত নয়। এখানে সরকারি, বেসরকারি সবগুলো চ্যানেলের প্রবেশাধিকার থাকা উচিত। সংসদ অধিবেশন সব মাধ্যমে প্রচার করা উচিত যেন জনগণ সংসদের কার্যকারিতা দেখতে ও জানতে পারে এবং সংসদ সদস্যের কার্যক্রমের মূল্যায়ন করতে পারে।

[৯৪] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৭২ (৩)।

সারণি ৬.২: সংসদ অধিবেশনের কার্যক্রম প্রচার সমর্থন করেন কিনা

অধিবেশন প্রচার	*সংখ্যা*	*শতকরা হার*
সমর্থন করি	৩০৬৬	৯৬.১
সমর্থন করি না	৬০	১.৯
জানি না	৬৩	২.০
মোট	৩১৮৯	১০০.০

৬.৩ সংসদের কার্যবিবরণীর সহজলভ্যতা

গবেষণার জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ৮০.২% সংসদের কার্যবিবরণী সকলের জন্য সহজলভ্য হওয়া উচিত বলে মনে করেন। তাদের মতে, সংসদের কার্যবিবরণী বুলেটিন আকারে সকলের জন্য অবশ্যই সহজলভ্য করা উচিত। এছাড়া এটি প্রকাশিত দলিল হিসেবে ওয়েবসাইটে বা প্রেস রিলিজের মাধ্যমে প্রচার করতে হবে। যেন জনগণ অল্প খরচ ও সময়ে এই সকল তথ্য পেতে পারে।

সারণি ৬.৩: সকলের জন্য সংসদের কার্যবিবরণীর সহজলভ্যতা

সংসদের কার্যবিবরণী	*সংখ্যা*	*শতকরা হার*
সহজলভ্য হওয়া উচিত	২৫৪০	৮০.২
সহজলভ্য হওয়ার প্রয়োজন নেই	৬১	১.৯
জানি না	৫৬৮	১৭.৯
মোট	**৩১৬৯**	***১০০.০***

৬.৪ সংসদে সংসদ নেতা ও বিরোধীদলীয় নেতার নিয়মিত উপস্থিতির প্রয়োজনীতা

সংসদ কার্যকর হওয়ার অন্যতম পূর্বশর্ত সংসদ অধিবেশনে সরকারি ও বিরোধী দলের নেতার সক্রিয় উপস্থিতি। অষ্টম সংসদের অভিজ্ঞতায়ও দেখা যায়, সংসদ নেতা বা বিরোধীদলীয় নেতা সংসদ অধিবেশনে উপস্থিত থাকলে অন্যান্য সদস্যদের উপস্থিতি বেশি থাকে। কিন্তু গত সংসদে প্রধান বিরোধী দলের লাগাতার সংসদ বর্জন ও সরকারি দলের সদস্যদের সংসদ অধিবেশনে যোগদানে অনাগ্রহ সংসদীয় কার্যক্রমে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। প্রায়ই কোরাম সংকটের কারণে অধিবেশন দেরিতে শুরু হয়। এমনকি কোরাম সংকটের কারণে সংসদের অধিবেশন মাঝপথে মুলতবি হয়ে যাওয়ার ঘটনাও ঘটে। অষ্টম সংসদে গড়ে প্রায় ৩৭ মিনিট কোরাম সংকটের কারণে নষ্ট হয়, এবং এ কারণে মোট ১৩,৬৩৫ মিনিট বা প্রায় ২২৭ ঘন্টা সময় অপচয় হয়, যা মোট কার্যকালের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ। অষ্টম জাতীয় সংসদে মোট ২৩টি অধিবেশনে শুধুমাত্র কোরামের অভাবে অধিবেশন দেরিতে শুরু করায় অর্থের অপচয় হয় প্রায় ২০ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা।[৯৫]

জরিপে প্রায় ৯৫% জনগণ সংসদ অধিবেশন চলাকালীন সংসদে সরকারি ও বিরোধী দলের নেতার উপস্থিতির প্রয়োজন আছে বলে মতামত প্রকাশ করেন।

সারণি ৬.৪: সংসদে সরকারি ও বিরোধীদলীয় নেতার নিয়মিত উপস্থিতি প্রয়োজন কিনা

নিয়মিত উপস্থিতি	*সংখ্যা*	*শতকরা হার*
প্রয়োজন আছে	৩০২৮	৯৪.৯
প্রয়োজন নেই	৭৮	২.৪
জানি না	৮৬	২.৭
মোট	৩১৯২	১০০.০

৬.৫ স্পিকারের ভূমিকা

সংসদ কার্যকর ও প্রাণবন্ত করতে স্পিকারের ভূমিকা অপরিসীম। স্পিকারকে সংসদের অভিভাবক বলা হয়। সাধারণত কোনো সাধারণ নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকে সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত করা হয়। নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাধারণত সরকারি দল থেকে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের নাম প্রস্তাবের পর কণ্ঠভোটে প্রস্তাবগুলো গৃহীত হয়। এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই সরকার গঠনকারী দল থেকে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন।

[৯৫] তানভীর মাহমুদ, *গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে অষ্টম জাতীয় সংসদ (২০০১-২০০৬)*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০০৭।

সংবিধান ও সংসদীয় কার্যপ্রণালী বিধি অনুসারে[৯৬]:
১. স্পিকার সংসদে সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন;
২. স্পিকার বৈঠকে এবং বৈঠক চলাকালীন সংসদ গ্যালারিতে শৃঙ্খলা ও ভব্যতা রক্ষা করবেন;
৩. স্পিকার সকল বৈধতার প্রশ্নের নিষ্পত্তি করবেন;
৪. স্পিকারের সিদ্ধান্ত বলবৎ করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সকল ক্ষমতা স্পিকারের থাকবে;
৫. স্পিকারের আদেশ বলবৎ করার উদ্দেশ্যে সার্জেন-এ্যাট-আর্মস হিসেবে কাজ করার জন্য এক ব্যক্তি নিযুক্ত থাকবেন;
৬. স্পিকারের বিবেচনামতে কোন সদস্য গুরুতর বিশৃঙ্খল আচরণ করলে স্পিকার উক্ত সংসদ সদস্যকে বৈঠক হতে সাময়িক বহিষ্কার করতে পারবেন;
৭. সংসদে গুরুতর বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হলে স্পিকার প্রয়োজনবোধে তৎকর্তৃক নির্ধারিত সময়ের জন্য বৈঠক স্থগিত করতে পারেন;
৮. স্পিকারের অনুপস্থিতিতে সংসদের কোন বৈঠকে ডেপুটি স্পিকার সভাপতিত্ব করবেন;
৯. কার্যপ্রণালালী বিধি অনুযায়ী প্রদত্ত স্পিকারের সকল বা যে কোন ক্ষমতা তিনি লিখিতভাবে ডেপুটি স্পিকারকে প্রদান করতে পারবেন।

সংসদ কার্যকর করার আর একটি পূর্বশর্ত স্পিকারের ওপর বিরোধী দলের আস্থা। অষ্টম সংসদে বিভিন্ন সময় স্পিকারের নিরপেক্ষতা ও যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। দেখা যায়, অষ্টম সংসদের অধিবেশনগুলোতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন এবং মন্ত্রীদের কাছে প্রশ্নোত্তর পর্বে বিরোধী দলের অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল সীমিত। এছাড়াও বিরোধী দলের সদস্যদের মাইক বন্ধ করা এবং তাড়া দেওয়ার ঘটনা তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল।[৯৭] এই গবেষণায় মুখ্য তথ্যদাতা, কর্মশালা ও এফজিডিতে অংশগ্রহণকারী জনগণ সংসদকে কার্যকর ও স্পিকারের নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রদান করেন:

- সংসদকে কার্যকর ও স্পিকারের নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে স্পিকার সরকারি দল থেকে এবং ডেপুটি স্পিকার বিরোধী দল থেকে নির্বাচিত করা উচিত এবং বাজেট ও আইন প্রণয়ন কার্যাবলীসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যদিবসে ডেপুটি স্পিকারকে শতকরা অন্তত ৪০ ভাগ সভাপতিত্ব করার বিধান চালু করা উচিত।
- সংসদ সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশের ভোটে স্পিকার নির্বাচিত করা উচিত এবং প্রয়োজনে তাঁকে অপসারণের ব্যবস্থা থাকা উচিত।
- স্পিকার থাকাকালীন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন দলের সাথে যুক্ত থাকতে পারবেন না। এমন নিয়ম করা উচিত যে স্পিকার নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি দল থেকে অবসর নেবেন। পরবর্তী মেয়াদে স্পিকারের আসনে অন্য কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না এবং ঐ স্পিকার সরাসরি নির্বাচিত হবেন। স্পিকার দুই মেয়াদের বেশি দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না।

৬.৬ স্থায়ী কমিটির ভূমিকা

একটি দেশের শক্তিশালী কমিটি ব্যবস্থা গণতন্ত্রকে শক্তিশালী রূপ দিতে অন্যতম নিয়ামক হিসেবে বিবেচিত। সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সংসদের পক্ষে জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাহী বিভাগের কাজের পর্যালোচনা এবং তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সুপারিশ প্রদান করতে পারে, যা সরকারকে সংসদের কাছে জবাবদিহি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে বিদ্যমান স্থায়ী কমিটিগুলোকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যায়[৯৮]:
১. মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
২. সরকারি হিসাব কমিটি
৩. কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
৪. অন্যান্য কমিটি (যেমন বিশেষ অধিকার কমিটি, লাইব্রেরি কমিটি)

কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী প্রত্যেকটি স্থায়ী কমিটির মাসে অন্ততপক্ষে একটি বৈঠকে মিলিত হওয়ার কথা।[৯৯] বাংলাদেশের কমিটি কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ও হিসাব সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির মধ্যে মাত্র ১৩.২% কার্যপ্রণালী বিধি অনুসরণ করে বৈঠক করতে সমর্থ হয়। এই বৈঠকগুলো পর্যালোচনা করে দেখা যায় খুব কম সংখ্যক বৈঠকেই দুর্নীতি বা অনিয়মের বিষয় আলোচিত হয়। আবার যেগুলো আলোচিত হয় সেগুলোর ব্যাপারেও সরকার কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। অষ্ট সংসদে ছয়টি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি কোনো প্রতিবেদন সংসদে জমা দেয়নি, যেখানে ৩০টি কমিটি মাত্র

[৯৬] স্পিকারের ক্ষমতা ও কার্যাবলী নিয়ে বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৪ অনুচ্ছেদ ও জাতীয় সংসদের কার্য-প্রণালী বিধির ১৪-১৯ বিধিতে বিস্তারিত বলা আছে।
[৯৭] আরও জানতে দেখুন, *পার্লামেন্ট ওয়াচ* সিরিজ প্রতিবেদন, ২০০২-২০০৬, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ।
[৯৮] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৭৬ (১) এবং (২); বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের *কার্যপ্রণালী বিধি* ১৮৭-২৬৬; ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, সংসদ নির্দেশিকা: আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া এবং স্পিকার-সাংসদ-জনগণ, ২০০০।
[৯৯] *বাংলাদেশের সংসদীয় কার্যপ্রণালী বিধি*, ২৪৮ বিধি।

একটি করে প্রতিবেদন সংসদে জমা দেয়। এছাড়া যেসব কমিটি প্রতিবেদন জমা দেয় তাদের ৭৭% সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার মাসে প্রতিবেদন জমা দেয়। সংসদ কর্তৃক কোনো কমিটিতে প্রেরিত যেকোনো বিল বা বিষয় পরীক্ষা করা, উক্ত কমিটির আওতাধীন মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী পর্যালোচনা করা, মন্ত্রণালয়ের কার্যকলাপ বা অনিয়ম ও গুরুতর অভিযোগ তদন্ত করা এবং কমিটি যথোপযুক্ত মনে করলে উক্ত কমিটির আওতাধীন যেকোনো বিষয় সম্পর্কে পরীক্ষা করা ও সুপারিশ করা এসব স্থায়ী কমিটির কাজ। কার্যকর কোনো পদক্ষেপ না নিতে পারার পেছনে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব, কমিটি গঠনে কালক্ষেপণ, সরকারি দল থেকে কমিটির সভাপতি নির্বাচন, কমিটির প্রতিবেদন যথাসময়ে জমা না দেওয়া ও সংসদে এ নিয়ে আলোচনা না হওয়া, এবং কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের ক্ষমতা না থাকা উল্লেখযোগ্য।[১০০]

মুখ্য তথ্যদাতা এবং স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা সংসদকে যথাযথভাবে কার্যকর করতে হলে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিকে যথাযথভাবে কার্যকর করতে হবে বলে মতামত প্রদান করেন। স্থায়ী কমিটির সভার প্রতিবেদন নিয়মিত তৈরি করতে হবে এবং তা জনগণের অবগতির জন্য প্রকাশ করতে হবে। এছাড়া ফলো-আপ করার মধ্য দিয়ে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোকে কার্যকর করার কথাও তারা বলেন।

৬.৭ সংসদ সদস্যদের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা: গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের[১০১] নেতিবাচক ভূমিকা

বাংলাদেশের সংবিধানে ৭০ অনুচ্ছেদ প্রবর্তনের পেছনে মূল কারণ ছিল পঞ্চাশের দশকে ঘন ঘন সরকার পতন। এটি রোধ করার জন্য সংবিধানে 'ফ্লোর ক্রসিং' নিষিদ্ধ করা হয়। তবে গবেষণায় বিভিন্ন পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই একমত প্রকাশ করেন যে, সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংসদীয় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করছে। এ বিধানের ফলে একজন সংসদ সদস্য স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারেন না। জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসা একজন জন-প্রতিনিধি জনগণের পক্ষে সঠিক কথাটি বলার সুযোগ হারাচ্ছেন এই অনুচ্ছেদের কারণে। অন্যান্য অনেকে দেশের সংসদ সদস্য মুক্তভাবে মত দিতে পারলেও আমাদের দেশের সংসদ সদস্যরা পারেন না। এফজিডি ও কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী এবং মুখ্য তথ্যদাতাসহ অনেকেই সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংসদ সদস্যদের বাক্ স্বাধীনতা হরণ করে এবং সরকারের স্থায়ীত্ব নিশ্চিত হলেও গণতন্ত্রের চর্চা বাধাগ্রস্ত হয় বলে জানান। তাদের মতে কোনোভাবেই টেকসই গণতন্ত্রের জন্য স্বাধীন মতামত প্রকাশে বাধা দেওয়া গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সরকার কোনো বিষয়ে দেশের বা জনগণের স্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্ত নিতে গেলে একজন সংসদ সদস্যের নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব হল স্বাধীনভাবে বাধা দেওয়া কিন্তু এ অনুচ্ছেদের কারণে স্ব স্ব দলের বিরুদ্ধে কখনই অবস্থান নিতে পারেন না। এর ফলে রাজনৈতিক দলের ভেতরের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াও বাধাগ্রস্ত হয়। সুতরাং তাদের মতে এ অনুচ্ছেদের সংশোধনী প্রয়োজন। এই সংশোধনীর মাধ্যমে ভালোভাবে সংজ্ঞায়িত করা প্রয়োজন একজন সংসদ সদস্য দলের বিরুদ্ধে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ভোট দিতে পারবেন আর কোন্ ক্ষেত্রে ভোট দিতে পারবেন না। এফজিডি ও কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী এবং মুখ্য তথ্যদাতাসহ অনেকেই দলের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব, বাজেট, গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন (সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে), এবং দলের মূল আদর্শের পরিপন্থী অন্যান্য যেকোন বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে সংসদ সদস্যদের কথা বলার অধিকার থাকা উচিত বলে উল্লেখ করেন।

অন্যদিকে বেশ কয়েকজন মুখ্য তথ্যদাতা ভিন্নমতও প্রকাশ করেন। তাঁদের মতে আমাদের দেশে দল বদলের সংস্কৃতি প্রকট এবং অর্থের দ্বারা রাজনীতিকরা প্রভাবিত হয়ে থাকেন। এ প্রেক্ষিতে দলের বিরুদ্ধে অনাস্থা ভোটের মাধ্যমে সরকারের পতন রোধের জন্য এবং দলের মধ্যে বিশৃঙ্খলা রোধে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের প্রয়োজন রয়েছে বলে তাঁরা মতামত প্রকাশ করেন।

৬.৮ সংসদীয় প্রতিবাদ: ওয়াক-আউট ও সংসদ বর্জন

ওয়াক-আউট সংসদীয় গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির একটি অংশ। অন্যদিকে লাগাতার সংসদ বর্জন সংসদীয় গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির অন্তরায়। ১৯৯১ সালে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর প্রতিটি সংসদেই বিরোধী দল লাগাতার সংসদ বর্জন করে। এমনকি প্রধান বিরোধী দলের সংসদ বর্জনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় অষ্টম সংসদের অধিবেশন। নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ এনে প্রধান বিরোধী দল সংসদ বর্জন করে। প্রধান বিরোধী দল প্রথম থেকে তৃতীয় অধিবেশনের ৭৪ কার্যদিবসের মধ্যে টানা ৬৮ কার্যদিবস বর্জন করে। এর পর বিরোধী দল ষষ্ঠ-অষ্টম, নবম-দশম এবং পঞ্চদশ-বিংশতিতম অধিবেশন বর্জন করে অর্থাৎ অষ্টম জাতীয় সংসদের মোট কার্যদিবসের প্রায় ৬০% প্রধান বিরোধী দল সংসদ বর্জন করে।[১০২] এর আগে পঞ্চম ও সপ্তম সংসদে প্রধান

---

[১০০] আরও জানতে দেখুন Fahreen Alamgir, Tanvir Mahmud and Iftekharuzzaman, 'Corruption and Parliamentary Oversight: Primacy of the Political Will', Transparency International Bangladesh, 2006; তানভীর মাহমুদ, *প্রাগুক্ত*।

[১০১] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৭০। সংবিধানের ৭০(১) অনুচ্ছেদ অনুসারে, 'কোন নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়া কোন ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইলে তিনি যদি উক্ত দল হইতে পদত্যাগ করেন, অথবা সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন, তাহা হইলে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে'।

[১০২] তানভীর মাহমুদ, *প্রাগুক্ত*।

বিরোধী দল যথাক্রমে প্রায় ৩৪% ও ৪৩% কার্যদিবস সংসদ বর্জন করে। অন্যদিকে পঞ্চম, সপ্তম ও অষ্টম জাতীয় সংসদে বিরোধী দলগুলো যথাক্রমে ৬০ বার, ৬২ বার ও ৯৫ বার ওয়াক-আউট করে।[১০৩]

সংসদ বর্জন ও ওয়াক-আউট প্রসঙ্গে জনগণ মনে করে কোনো বিলের বিষয়ে, নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে, বা অন্য যেকোনো বিষয়ে বিরোধী দল সরকারের সাথে দ্বিমত পোষণ করে ওয়াক-আউট করতে পারে, কিন্তু সংসদ বর্জন কাম্য হতে পারে না। সংসদে রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে স্বল্প সময়ের জন্য ওয়াক-আউট হতে পারে। জনগণ মনে করে, রাজনৈতিক দলগুলোকে সংসদ বর্জনের সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসতে হবে। সংসদকে বিরোধী দলের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। সরকারি দলের উচিত হবে বিরোধী দলের মতের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আলোচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া।

"সংসদ অধিবেশনে ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে টানাটানি একেবারে অনুচিত।"

"সরকারি বা বিরোধী উভয় দলের প্রধানের অনুপস্থিতি সংসদে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য দায়ী।"

"সরকারি এবং বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের সমান সুযোগ-সুবিধা দেয়া দরকার অর্থাৎ সকল সংসদ সদস্যকে সংসদে কথা বলার জন্য সমান সময় দেয়া দরকার।"

"সংসদে প্রতিবাদ করার সুযোগ না থাকলে প্রতিবাদী সংসদ সদস্যদের পদত্যাগ করা উচিত।"

"হরতাল বন্ধ করে দিতে কইয়েন। তাহলে সরকারি সম্পদ নষ্ট হবে না।"

"আইন করে বাতিল নয়, হরতাল ও অবরোধ না করার সংস্কৃতি গড়ে তোলা দরকার।"

৬.৯ সংসদীয় বিষয়ে সংসদের বাইরে প্রতিবাদ: হরতাল ও অবরোধ

সংসদের বিষয় নিয়ে সংসদের বাইরে প্রতিবাদ হওয়া উচিত নয় বলে মনে করেন মুখ্য তথ্যদাতা, এফজিডি ও কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী জনগণ। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ৭৫% সংসদীয় বিষয়ে সংসদের বাইরে প্রতিবাদ করা উচিত নয় বলে জানান। তাদের মতে হরতাল ও অবরোধ যদি অন্যের জান-মালের ক্ষতি সাধন করে তবে সেরকম হরতাল বা অবরোধ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হতে পারে না। তবে জরিপে অংশগ্রহণকারীদের প্রায় ৮৫% জনগণ আইন করে হরতাল, অবরোধ বন্ধ করার পক্ষে মত দিলেও মুখ্য তথ্যদাতা, এফজিডি ও কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা মনে করেন আইন করে হরতাল বা অবরোধ বন্ধ করা উচিত নয়। হরতাল, অবরোধ সাংবিধানিক অধিকার। গণতন্ত্রের স্বার্থে এমন কোনো আচরণ করা উচিত না যা গণতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর। তাঁরা মনে করেন, হরতাল যদি দিতেই হয় তবে তা বেশ কিছুদিন পূর্বেই ঘোষণা দিতে হবে। সংসদ অধিবেশন চলাকালীন সংসদ সদস্য বা রাজনৈতিক দলের উচিত সংসদেই প্রতিবাদ জানানো। সংসদ অধিবেশন স্থগিত থাকাকালীন প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে হরতাল হতেই পারে তবে তার ফলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড যেন বিঘ্নিত না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। বাংলাদেশে যে ধরনের হরতাল, অবরোধ পালন করা হয় এটি একটি ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি বদলাতে হবে।

_সারণি ৬.৫: সংসদীয় বিষয়ে সংসদের বাইরে প্রতিবাদ করা উচিত কিনা_

প্রতিবাদ	*সংখ্যা*	*শতকরা হার*
সংসদের বাইরে প্রতিবাদ করা উচিত	৫৩৭	১৬.৯
সংসদের বাইরে প্রতিবাদ করা উচিত না	২৩৮৫	৭৫.০
জানি না	২৫৯	৮.১
মোট	৩১৮১	১০০.০

তারা আরও মনে করেন, রাজনৈতিক দল বা অন্য যেকোনো সংগঠন হরতাল ডাকতে পারে তবে কাউকে হরতাল মানতে বাধ্য করা যাবে না বা অন্যের সম্পদের ক্ষতি সাধন করা যাবে না। সংসদের বাইরে যদি বাস্তবিক কারণে প্রতিবাদ জানাতে হয় তবে প্রতিবাদ হিসেবে সংবাদ সম্মেলন, মিটিং ও নির্দিষ্ট স্থানে গণজমায়েতের পক্ষে মত দিয়েছেন অধিকাংশ জনগণ। শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল করার জন্য যে সচেতনতা দরকার তা অনেক ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত বলে মনে করে গবেষণায় অংশগ্রহণকারী জনগণ।

৬.১০ আইন প্রণয়ন বা সংস্কার করার আগে জনগণকে সম্পৃক্ত করার প্রয়োজনীয়তা

সংসদের বহুবিধ কাজের মধ্যে আইন প্রণয়ন অন্যতম প্রধান কাজ। যেকোনো আইনের চূড়ান্ত বৈধতার জন্য সংসদের অনুমোদনের প্রয়োজন। সংসদে অনুমোদনের পর মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি দানের জন্য পাঠানো হয় এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি সম্মতি দানের পরেই তা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয় এবং আইনে পরিণত হয়। এই আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সাথে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সরাসরি জড়িত। একটি আইন পাশ করতে দীর্ঘ সময় এবং প্রক্রিয়া অতিক্রম করতে হয়। কোনো আইন পাশ করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা সংসদীয় কমিটি কর্তৃক আলোচনার পর খসড়া বিল আকারে সংসদে

[১০৩] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, *সপ্তম সংসদের দৈনিক বুলেটিন*; মো. আলী আকবর, *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ওয়াকআউট ও বয়কট*, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ঢাকা।

উত্থাপিত হয়। উক্ত বিলের উপর সংসদ সদস্যরা আপত্তি, জনমত যাচাই বাছাইয়ের প্রস্তাব বা সংশোধনী আনতে পারেন। এরপর উক্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনার পর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে ভোট আহ্বান (কণ্ঠ ভোট) করা হয় এবং ভোটের ফলাফলের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

জনগণের ভোটে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা যখন আইন প্রণয়ন বা সংশোধনে অংশগ্রহণ করেন তখন পরোক্ষভাবে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়। কিন্তু গত সংসদের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, আইন প্রণয়ন একচেটিয়াভাবে সরকারি দলের ওপর নির্ভর করে এবং বিরোধী দলের মতামত গ্রহণ করা হয় না। আবার সরকারি দলের সদস্যরা সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের কারণে মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত আইনের বিপক্ষে মতামত বা ভোট দিতে পারেন না। উন্নত দেশে আইনের ওপর আপত্তি বা সংশোধনীকে অতি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য বাংলাদেশে আইন প্রণয়নের বিভিন্ন ধাপে সরকারি দলের সদস্যরা বিরোধী দলের আপত্তি, জনমত যাচাই-বাছাইয়ের প্রস্তাব বা সংশোধনীগুলোকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখেন।[১০৪]

অষ্টম সংসদে মোট ১৮৫টি আইন পাশ হয়। অষ্টম সংসদে উত্থাপিত বিলের প্রায় ৯৩% জনমত যাচাই ও বাছাইয়ের প্রস্তাব কণ্ঠ ভোটে নাকচ হয়, ৫.৩% জনমত যাচাই ও বাছাইয়ের প্রস্তাব প্রদানকারী সংসদ সদস্য উত্থাপন করেননি অথবা অনুপস্থিত ছিলেন, আর ১.৮% প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য কর্তৃক প্রত্যাহৃত হয়। মোট পাসকৃত ১৮৫টি বিলের মধ্যে যেসব বিলে বিরোধী দল সংশোধনী দিয়েছিল তার অধিকাংশ সংশোধনী কণ্ঠ ভোটে নাকচ হয়ে যায়; গৃহীত বা আংশিক গৃহীত হয় যৎসামান্য। যে সংশোধনীগুলো গৃহীত হয় সেগুলোর প্রায় সবগুলোই ছিল বানান সংশোধনী সম্পর্কিত। অন্যদিকে সরকারি দল কর্তৃক প্রদত্ত ১০০% সংশোধনীই সংসদে গৃহীত হয়। অষ্টম সংসদে কোনো আইন প্রণয়নেই জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ছিল না। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার কয়েকটি আইন প্রণয়নে জনগণের মতামত নিয়েছেন, যার মধ্যে তথ্য অধিকার আইন, নির্বাচন সংক্রান্ত গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ সংশোধন, ও ক্রয় সংক্রান্ত আইন উল্লেখযোগ্য।

সারণি ৬.৬: আইন প্রণয়নের পূর্বে জনগণের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা

আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায়	*সংখ্যা*	*শতকরা হার*
জনগণের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে	৩০১৪	৯৪.৫
জনগণের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা নেই	৬৭	২.১
জানি না	১১০	৩.৪
মোট	***৩১৯১***	***১০০.০***

বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশে সব আইনে জনগণের প্রত্যক্ষ মতামত বা জনমত যাচাই-বাছাইয়ের কাজ অতি দুরূহ। তবে তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সংবিধানের সংশোধনী ও জনগুরুত্বপূর্ণ আইনের খসড়া ওয়েবসাইট বা পত্রিকায় প্রকাশ করে জনগণের মতামত চাওয়া যেতে পারে। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের প্রায় ৯৫%, এবং দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারী ও মুখ্য উত্তরদাতারা কোনো আইন প্রণয়ন বা সংস্কার করার আগে জনগণের মতামত নেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন। তবে এত বৃহৎ জন-সমষ্টিকে সে অর্থে সম্পৃক্ত করা সম্ভব নয়। তাদের মতে একটি আইন প্রণয়ন বা সংস্কারের ক্ষেত্রে আইনের খসড়া সংবাদপত্রে প্রকাশ করা উচিত। ওয়েবসাইটে সাধারণ মানুষের মতামত চেয়ে কোনো আইন প্রণয়ন বা সংস্কার করার আগে জনগণের মতামত নেওয়া বা জনগণকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী, স্বেচ্ছাসেবক, এনজিও কর্মী এবং অন্যান্য গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আলোচনা করে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যেতে পারে। স্পর্শকাতর আইন তৈরি বা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে জনগণকে সম্পৃক্ত করার প্রয়োজন আছে। এক্ষেত্রে মিডিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। একটি নির্ধারিত কমিটি থাকবে যার বরাবর সুপারিশ জমা পড়বে এবং কমিটির বিশ্লেষণের পর সংসদে আলোচনা হয়ে তা পাশ হতে পারে।

৬.১১ সংসদে সংরক্ষিত আসনে নারী সদস্যদের নির্বাচন প্রক্রিয়া

সংবিধান ও নির্বাচনী আইন অনুযায়ী সাধারণ আসনে নারীদের প্রার্থী হতে কোনো বাধা নেই। তবে এছাড়াও বাংলাদেশ সংসদে নারীদের জন্য ৪৫টি আসন সংরক্ষিত আছে যা সংসদে প্রতিনিধিত্বশীল দল আনুপাতিক হারে মনোনয়ন দেয়। কিন্তু এই প্রক্রিয়াটিকে সমর্থন করেন মাত্র ১৮.৩% উত্তরদাতা। গবেষণায় দেখা যায়, জনগণ সংসদে সংরক্ষিত আসনে দল কর্তৃক মনোনয়নের পরিবর্তে সরাসরি নির্বাচন সমর্থন করেন। তাদের প্রায় ৫৪% বলেন, সংরক্ষিত আসনে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নারী সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়া দরকার। বিশিষ্ট নারী প্রতিনিধিসহ অন্যান্য মুখ্য তথ্যদাতারাও নারীদের সংরক্ষিত আসনে মনোনীত করার প্রক্রিয়াটিকে নারীদের জন্য অবমাননাকর বলে অভিহিত করেন। রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক দলগুলোকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। জরিপে দেখা যায়, উত্তরদাতাদের ৫৪.১% সংরক্ষিত আসনে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন সমর্থন করেন।

---

[১০৪] আরও জানতে দেখুন তানভীর মাহমুদ, *প্রাগুক্ত*।

সারণি ৬.৭: নারী সদস্যের কোন নির্বাচন প্রক্রিয়াকে সমর্থন করেন

নির্বাচন প্রক্রিয়া	*সংখ্যা*	*শতকরা হার*
মনোনয়নের মাধ্যমে সংরক্ষিত আসনে	২৫৩	১৮.৩
সরাসরি ভোটে সংরক্ষিত আসনে	৭৪৬	৫৪.১
জানি না	৩৮১	২৭.৬
মোট	***১৩৮০***	***১০০.০***

মুখ্য উত্তরদাতারা মনে করেন, যদিও ৩০০ আসনে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নারীদের আসার সুযোগ আছে তথাপি সংরক্ষিত ৪৫টি আসন থাকা উচিত কারণ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীরা এখনো সে অবস্থানে আসতে পারেনি। এজন্য অবশ্য অনেক কারণ বিদ্যমান আছে। তাঁরা বলেন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বদলাতে হবে। রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে মনোনয়ন দেওয়ার সময় শতকরা ২০-৩০% আসনে নারী সদস্য মনোনয়ন দিবেন — যা সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নারীদের আসতে সহযোগিতা করবে। জনগণ মনে করেন, সংসদে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে আসতে নারীদেরকে উৎসাহিত করতে হবে এবং এক্ষেত্রে তাদেরকে রাজনীতিতে আসার যথাযথ সুযোগ দিতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোও তাদের সব পর্যায়ের কমিটিতে নারীদের জন্য ৩৩ শতাংশ পদ বরাদ্দ রাখবেন। সরকার দায়িত্ব নিয়ে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে যাতে তারা নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারেন। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে নারীদের অবদান রাখার সুযোগ দিতে হবে। কোরাম সংকট কাটানোর জন্য নারী প্রতিনিধিত্ব প্রায়োগিক অর্থে ফলপ্রসূ হয় না।

সংরক্ষিত আসনের মাধ্যমে সঠিক নেতৃত্ব জাতীয় সংসদে আসছে না। আনুপাতিক হারে মনোনীত হয়ে যেসব নারী সংসদ সদস্য হন তাঁরা স্বভাবতই মনোনয়নকারীদের আনুগত্য করে থাকেন। তাছাড়া নারীদের জন্য এটি মর্যাদা হানিকরও বলে বিশিষ্ট নারী প্রতিনিধিসহ অনেক মুখ্য তথ্যদাতা মত দেন। সুতরাং সংসদে নারীদের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে আসার সুযোগ তৈরি করতে হবে। অনেকে মনে করেন, শুধু নারীদের জন্য নয়, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্যও সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত।

"সংরক্ষিত আসন বুঝিনা। আমরা সরাসরি ভোটে যেতে চাই।"

"মহিলাদের জন্য কোন সংরক্ষিত আসন থাকবে না। নির্বাচনের মাধ্যমে নারী প্রার্থী পুরুষ প্রার্থীদের সাথে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আসতে পারে।"

"নারীদের ক্ষমতায় আসা ঠিক না। একজন শিক্ষিত মা জাতিকে অনেক কিছুই দিতে পারে তবে তা সংসদের বাইরে, সংসদে নয়। সংসদে নারী থাকা ইসলাম বিরোধী।"

৬.১২ উপসংহার

সংসদকে যথাযথভাবে কার্যকর করতে হলে বিভিন্ন পর্যায়ে রাজনৈতিক বিতর্কের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এটি রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিষয়। সংসদ কার্যকর করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। বিরোধী দলকে গঠনমূলক ছায়া সরকারের ভূমিকা পালন করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারি দলকে ইতিবাচক মানসিকতা দেখাতে হবে। সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে সরকারি দলের সঙ্গে বিরোধী দলের একটি ভারসাম্য রাখতে হবে। প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য সৃষ্টি করতে হবে। সংসদীয় স্থায়ী কমিটিকে কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। সর্বোপরি রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও অঙ্গীকার জাতীয় সংসদকে কার্যকর করতে পারে।

অধ্যায় সাত
সংসদীয় গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু রাজনৈতিক দল। তাই সংসদীয় গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অপরিসীম। রাজনৈতিক দল অবশ্যম্ভাবী এবং সকল স্বাধীন, বৃহৎ রাষ্ট্রেই এর অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়।[১০৫] পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে বিশেষ করে যুক্তরাজ্যে সংসদীয় ব্যবস্থা ও ভোটাধিকার সম্প্রসারণের সাথে রাজনৈতিক দলের ক্রমবিকাশ সম্পর্কযুক্ত। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-আন্দোলন, একাত্তরের মুক্তি সংগ্রাম, এবং নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। বস্তুতপক্ষে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রাজনৈতিক দল ছাড়া অকার্যকর। একটি নির্দিষ্ট আদর্শ ও নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে জনগণের সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় গিয়ে বা বাইরে থেকে জাতীয় স্বার্থ বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক দল গড়ে উঠে। তাইতো বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী রাজনৈতিক দল বলতে এমন একটি অধিসঙ্ঘ বা ব্যক্তিসমষ্টি অন্তর্ভুক্ত, যা সংসদের ভেতরে বা বাইরে স্বাতন্ত্র্যসূচক কোনো নামে কাজ করে এবং কোনো রাজনৈতিক মত প্রচার বা কোনো রাজনৈতিক তৎপরতা পরিচালনার উদ্দেশ্যে অন্যান্য অধিসঙ্ঘ থেকে পৃথক কোনো অধিসঙ্ঘ হিসেবে নিজেদের প্রকাশ করে।[১০৬] বাংলাদেশের সংসদে প্রতিনিধিত্বের হারের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), জামায়াতে ইসলামী এবং জাতীয় পার্টিকে বড় রাজনৈতিক দল হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

গণতান্ত্রিক দেশে সঙ্ঘবদ্ধ মানুষের রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার রয়েছে। আবার রাজনৈতিক জীব হওয়ায় মানুষ তার নিজ প্রয়োজনে, লক্ষ্য সাধনে বা মূল্যবোধের ওপর ভর করে একটি রাজনৈতিক পরিচয় লাভ করে। অনেকে আবার স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের জন্য কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক পরিচয়ে বেড়ে ওঠে না। আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের মনোনয়নের ভিত্তিতে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে সংসদ সদস্যরা নির্বাচিত হয়ে আসেন। কোনো দলনিরপেক্ষ ব্যক্তির স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হওয়ারও সুযোগ রয়েছে। তবে রাজনৈতিক দলের মাধ্যমেই আমাদের দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র বিকশিত হচ্ছে। কিন্তু এই দলগুলো নিজেদের মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা করে কিনা, দলগুলোতে অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সুস্থ কিনা, রাজনৈতিক সহনশীলতা বিদ্যমান কিনা — এসব প্রশ্নের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রয়েছে আমাদের সংসদ সদস্যদের প্রকৃতি, ধরন ও যোগ্যতা। সংসদীয় গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত রাখতে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতির চর্চা অত্যাবশকীয়। গবেষণায় জরিপ, এফজিডি, কর্মশালা ও মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার — প্রতিটি মাধ্যমেই জনগণের কাছ থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংস্কৃতি চর্চার অভাবের বিষয়টি উঠে আসে।

৭.১ রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্র[১০৭] ও বাস্তবতা

প্রতিটি রাজনৈতিক দলের সুসংগঠিত গঠনতন্ত্র রয়েছে। এই গঠনতন্ত্রে দলের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, মূলনীতি, অঙ্গীকার, পতাকা, গঠন-প্রণালী, সদস্যপদ, কাউন্সিল এবং এর কার্যাবলী ও ক্ষমতা, দল কিভাবে পরিচালিত হবে, দলের নেতৃত্ব কিভাবে সৃষ্টি হবে, দলের শাখা-প্রশাখা কতটা বিস্তৃত থাকবে, দলের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্রগুলো কি হবে ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা থাকে। গণতান্ত্রিক দেশে রাজনৈতিক দলগুলোর গঠনতন্ত্র একটি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়।

- ***লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:*** বাংলাদেশের প্রধান চারটি রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আওয়ামী লীগ, বিএনপি এবং জাতীয় পার্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে। এ দলগুলো জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও অর্থনৈতিক মুক্তির প্রতি জোর দিয়েছে। তবে জাতীয় পার্টির ইসলামী আদর্শ এবং জামায়াতে ইসলামীর আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল প্রদর্শিত দ্বীন (ইসলামী জীবন বিধান) কায়েমের কথা বলা হয়েছে। জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়নি।

- ***কর্তৃত্ব:*** বিএনপি এবং জাতীয় পার্টির পরিচালনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ণ কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা রয়েছে দলের প্রধানের ওপর। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলী এবং জামায়াতে ইসলামীর ক্ষেত্রে মজলিসে শূরার ওপর পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। বিএনপি, জাতীয় পার্টি এবং জামায়াতে ইসলামীতে পার্টি প্রধানের অপসারণ ব্যবস্থার উল্লেখ রয়েছে, যা আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রে অনুপস্থিত।

---

[১০৫] ড. মো. আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন*, আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৪২৭।
[১০৬] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ১৫২ (১)।
[১০৭] বিস্তারিত জানতে দেখুন পরিশিষ্ট ৭।

- ***কমিটি ব্যবস্থা:*** দলগুলোর কমিটি ব্যবস্থা জাতীয় পর্যায় থেকে একেবারে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। জামায়াতে ইসলামীর সর্বোচ্চ পরিষদ কেন্দ্রীয় *রুকন* সম্মেলন আর অন্য তিনটি দলে জাতীয় কাউন্সিল। দলীয় গণতন্ত্রের প্রথা অনুসারে প্রতিটি কমিটির নেতৃত্বে নির্বাচনের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য নির্ধারিত হওয়ার বিধান রয়েছে। দলের পূর্ণাঙ্গ সদস্যরাই নির্বাচনের মাধ্যমে নেতৃত্ব পায়। রাজনৈতিক দলের আদর্শে বিশ্বাসী আঠার বছর বা ততোধিক বা পূর্ণ বয়স্ক বাংলাদেশের নাগরিক অতি সামান্য অংকের চাঁদা দিয়ে সদস্যপদ পায়।

- ***জাতীয় কাউন্সিল:*** জাতীয় কাউন্সিল এবং *রুকন* সম্মেলনের মাধ্যমে দলগুলোর প্রধান নেতৃত্ব একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হয়। তাই আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির গঠনতন্ত্রে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর পর জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে। জামায়াতে ইসলামীর *রুকন* সম্মেলন প্রয়োজন মোতাবেক আহ্বানের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বিএনপির জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা বেঁধে দেওয়া নেই। জামায়াতে ইসলামী জাতীয় পর্যায়ের যেকোনো নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ে *মজলিসে শূরা* কর্তৃক মনোনীত নির্বাচন কমিশন গঠন করে। অন্য তিনটি বৃহৎ দলে সংসদীয় বোর্ড গঠনের কথা বলা হয়েছে, যার সভাপতি হিসেবে দলের প্রধানকে রাখা হয়েছে এবং বোর্ডের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয়েছে।

- ***দলীয় তহবিল:*** প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের নিজস্ব তহবিল গঠনের ব্যবস্থা রয়েছে। সদস্যদের চাঁদা, ব্যক্তিগত অনুদান/দান, দলীয় প্রকাশনা বিক্রয় ইত্যাদি উপায়ে সংগৃহীত অর্থ বাংলাদেশের তফসিলভুক্ত ব্যাংকে রেখে দলের প্রয়োজনে খরচ করা হয়। আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির দলীয় প্রধান, সাধারণ সম্পাদক/মহাসচিব ও কোষাধ্যক্ষের স্বাক্ষরের মাধ্যমে অর্থ উত্তোলন করা হয়। জামায়েতে ইসলামীর ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ উত্তোলনের জন্য স্বাক্ষরদানকারীর পদবি ও সংখ্যার উল্লেখ নেই। তবে প্রতিটি দলের গঠনতন্ত্রে তহবিলের হিসাব অডিট করার মাধ্যমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে।[১০৮]

দলগুলোর গঠনতন্ত্রে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ, নেতৃত্ব সৃষ্টি, কমিটি ব্যবস্থা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সদস্যপদ প্রাপ্তি, তহবিল সংগ্রহ ও নিরীক্ষা প্রতিটি ক্ষেত্রেই গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি ও মূল্যবোধের কথা বলা হলেও বাস্তবে তার প্রতিফলন খুব সামান্য দেখা যায় বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা জানান। বাংলাদেশে বড় দলগুলো নিজ অবস্থানে গণতান্ত্রিক নয়। প্রায় সকল দলের সভাপতি বা প্রেসিডেন্ট একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় তাঁরা নিজের ইচ্ছেমত একক সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। অধিকাংশ দল তাদের সদস্যপদের রেকর্ড সংরক্ষণ করে না। এমনকি তারা নিয়মিতভাবে দলীয় সম্মেলনও করে না। যদিও বা করে, কোনো দলের নির্বাহী কমিটি ঘোষণা করা বিরল ঘটনা। অধিকাংশ দলই তাদের সভাপতি বা প্রেসিডেন্টকে পুনরায় নির্বাচিত করে এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের মনোনীত করার কর্তৃত্ব দেয়। অধিকাংশ দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটির সদস্য মনোনীত করার ক্ষমতা নিজেদের হাতেই রাখে। প্রতিটি দলের শীর্ষ পর্যায়ের নেতারা সংসদীয় বোর্ডের সদস্যদের বাছাই করে, এরাই পরবর্তীতে সংসদীয় নির্বাচনের জন্য প্রার্থীদের মনোনয়ন দেয়।

জাতীয় দলের স্থানীয় শাখাগুলো বাস্তবিক অর্থে কেন্দ্রীয় দলের বর্ধিত সংগঠন ছাড়া আর কিছু নয়। রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয়করণের এই নীতির পেছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য রয়েছে, তা হল দলের মধ্যে ভিন্নমতকে চাপিয়ে রাখা। নেতৃত্ব নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় সাধারণ সদস্যদের কোনো মুখ্য ভূমিকা নেই। প্রকৃতপক্ষে প্রধান তিনটি রাজনৈতিক দলের- আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টি- শীর্ষ নেতৃত্ব প্রায় পঁচিশ বছর একই অবস্থানেই রয়েছে। তিনটি দলের সর্বোচ্চ নেতাই ১৯৮০ দশকের প্রথম থেকে দলের শীর্ষ পদে আসীন রয়েছে। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র শীর্ষ নেতারা উত্তরাধিকার সূত্রে দলের প্রধান হয়েছেন, স্পষ্টত তাঁরা নিজ দলের কোনো পদে দায়িত্বরত ছিলেন না, এমনকি তাঁদের রাজনীতির কোনো অভিজ্ঞতাও ছিল না। এ বিষয়ে দলের কোনো পর্যায় থেকে দলের গণতন্ত্রায়নের ব্যাপারটি বিবেচ্য হয়নি, বরং কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই দলের সকলে তাঁদের অনুসরণ করে গেছেন। যদিবা কেহ দলের নেতৃত্বের স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত অমান্য করেছেন, তারা সাময়িকভাবে বরখাস্ত বা দল হতে অপসারণের ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছেন। বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে সংসদের সদস্যপদও হারিয়েছেন।[১০৯]

৭.২ রাজনৈতিক দলের কাছে প্রত্যাশিত রাজনৈতিক সংস্কৃতি

রাজনৈতিক দলগুলোর বহুবিধ অর্জনের পাশাপাশি অনেক ব্যর্থতা রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। তাঁরা বলেন, দলগুলোর মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে, দল ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা পরিবারকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে। বিভিন্ন স্তরের নির্বাচন করা হচ্ছে না, জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে না, দলের নেতৃত্ব পূর্ব নির্ধারিত থাকছে। এর ফলে দলগুলোতে অর্থের দৌরাত্ম্য বেড়েছে আর দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত রাজনীতিকরা অসম প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছেন। ড. আবদুল ওদুদ ভূঁইয়ার বিশ্লেষণে,

---

[১০৮] বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (২০০২), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (১৯৯৫), জাতীয় পার্টি (পার্টির ওয়েবসাইটে প্রবেশ ২০০৮) এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ (২০০৬) এর গঠনতন্ত্র পর্যালোচনা করে লিখিত। বিস্তারিত জানতে দলগুলোর গঠনতন্ত্র পড়ুন।

[১০৯] Prof. Dr. Ataur Rahman, 'Democratisation of parties', *The Daily Star*, Anniversary Special, 2007 (অনূদিত)।

বর্তমানে বাংলাদেশের দল ব্যবস্থায় নতুন কিছু অগণতান্ত্রিক উপাদান যুক্ত হয়েছে, যেমন দলত্যাগের প্রবণতা, অসংগঠিত দলব্যবস্থা, আভ্যন্তরীণ কোন্দল ও দলীয় মতানৈক্য, ব্যক্তিকেন্দ্রিক দলের অস্তিত্ব, সরকারি ও বিরোধী দলের অহেতুক দ্বন্দ্ব, কায়েমী স্বার্থবাদ, প্রতিক্রিয়াশীলতা, সুবিধাবাদ এবং আদর্শহীনতা।[১১০] এর ফলে মুখ্য তথ্যদাতাদের অনেকেই মনে করেন, যারা দলে গণতন্ত্রের চর্চা করেন না, তাদের পক্ষে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা স্বপ্নবিলাস মাত্র।

দলগুলোর আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রে যে সংকট দেখা দিয়েছে তা প্রতিফলিত হয়েছে জরিপের উত্তরদাতাদের মাধ্যমেও। উত্তরদাতারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় দলের নেতা-নেত্রী নির্বাচন (৭৮.৯%), দলগুলোর আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ (৬৫.৭%), দলগুলোর গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নিয়মিত সভা করা (৫৯.৬%), অন্য দলের প্রতি সহনশীল আচরণ করা (৫৩%), ব্যক্তিগতভাবে পার্টির কোনো ভুল সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করার স্বাধীনতা থাকা (৫২.৭%), নির্বাচন কমিশনের সাথে দলের নিবন্ধন করা (৪৯.৫%), এবং দলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত করার (৩৯.৩%) পক্ষে মত ব্যক্ত করেন।

সারণি ৭.১: রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে প্রত্যাশিত রাজনৈতিক সংস্কৃতি

দলের কাছ থেকে প্রত্যাশিত রাজনৈতিক সংস্কৃতি	*সংখ্যা*	*শতকরা হার*
গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নেতা/নেত্রী নির্বাচন	২৫২৫	৭৮.৯
নিয়মিত আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ	২১০১	৬৫.৭
নিয়মিত সভা	১৯০৬	৫৯.৬
ব্যক্তিগতভাবে পার্টির কোন ভুল সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করার স্বাধীনতা	১৬৮৫	৫২.৭
অন্যান্য দলে মতামতের প্রতি সহনশীল আচরণ	১৬৯৭	৫৩.০
নির্বাচন কমিশনের সাথে নিবন্ধন	১৫৮৩	৪৯.৫
স্বচ্ছতার ভিত্তিতে দলীয় পদ স্থগিত (প্রয়োজনে) ও বাতিল	১৪৫৮	৪৫.৬
সম্মেলন	১২৫৬	৩৯.৩
জানি না	২৬১	৮.২

** একাধিক উত্তর প্রযোজ্য*

৭.৩ রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ (সংশোধিত ২০০৮) অনুসারে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নির্বাচন কমিশনের সাথে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক।[১১১] রাজনৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলোকে বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধন করানো আবশ্যক বলে আধুনিক রাষ্ট্রতাত্ত্বিকরা মনে করেন। এর মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোর জবাবদিহিতার ক্ষেত্র তৈরি হবে বলে মনে করা হয়। কিন্তু আজও পর্যন্ত[১১২] বড় দলগুলো নিবন্ধন করা থেকে নিজেদের বিরত রেখেছে। অন্যদিকে নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিকভাবে স্বাধীন একটি সত্ত্বা হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সমঝোতা করে এসেছে। তারা দলগুলোকে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ এ বর্ণিত ধারার গুরুত্ব বোঝাতে সক্ষম হয়নি। রাজনৈতিক দলগুলো নিবন্ধন করার জন্য সংবিধানের মূল্যবোধ ও মূলনীতিকে বিশ্বাস থাকতে হবে, বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও একতা তুলে ধরতে হবে, দলীয় সদস্যপদে নারী-পুরুষের অনুপাত ঠিক রাখতে হবে ইত্যাদি শর্তাদি মেনে আবেদন করলে নির্বাচন কমিশন একক ভাবে আবেদন গ্রহণ বা বাতিল করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে। এই নিবন্ধনের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোর যেসব সুবিধা পাওয়ার কথা সেগুলো নির্বাচন কমিশনকে নিশ্চিত করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলো যদি নিবন্ধনের শর্ত ভঙ্গ করে তাহলে নিবন্ধন বাতিলের ব্যবস্থাসহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। উল্লেখ্য, আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, পাকিস্তান, এবং নেপালে রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন কমিশনের সাথে নিবন্ধিত।[১১৩]

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের সমর্থন নিয়ে জনগণের জন্য কাজ করছে। তাই তারা শুধুমাত্র জনগণের কাছে জবাবদিহি করবে – এই অজুহাতে নির্বাচন কমিশনের সাথে তারা নিবন্ধিত হয়নি। এছাড়া প্রতিটি রাজনৈতিক সরকারের সময় বিরোধী দলগুলো নির্বাচন কমিশনের দলীয় ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং নিবন্ধনের বিষয়টি এড়িয়ে যায়। সম্প্রতি রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থানে কিছুটা পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের শক্ত অবস্থান এবং বৃহৎ দুটি দলের সাথে সমঝোতামূলক সংলাপের ফলে এই উদ্যোগ কিছুটা এগিয়েছে। জরিপে যায়, ৪৯.৫% উত্তরদাতা রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচন কমিশনের সাথে নিবন্ধন করা উচিত বলে মত প্রকাশ করেন। তবে মুখ্য তথ্যদাতা, এফজিডি ও কর্মশালার অংশগ্রহণকারীরা এ বিষয়ে পরস্পর ভিন্ন মতামত দেন। কারও তারও মতে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন অবশ্যই করা উচিত। সর্বোপরি নির্বাচন কমিশনের

[১১০] বিস্তারিত জানতে পড়ুন ড. আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৮-৪৩২।
[১১১] গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ (সংশোধিত ২০০৮), অনুচ্ছেদ ৯০এ।
[১১২] ১৯ অক্টোবর ২০০৮ পর্যন্ত।
[১১৩] For details, see: Justice Chowdhury A. T. M. Masud, *Reminiscence of Few Decades and Problems of Democracy in Bangladesh*, Academic Press and Publishers Library, Dhaka, 2005.

নিরপেক্ষ ভূমিকা, দৃঢ়চেতাসম্পন্ন প্রধান নির্বাচন কমিশনার, কমিশনের শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং রাজনৈতিক দলগুলো গণতন্ত্র ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলে নির্বাচন কমিশনের সাথে দলগুলোর নিবন্ধন সম্ভব হবে বলে তাঁরা মনে করেন। অন্যদিকে কারও কারও মতে এ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের কোনো হস্তক্ষেপ থাকা উচিত নয়। রাজনৈতিক দলগুলোর জবাবদিহিতার প্রয়োজন নেই কারণ তারা কোনো অন্যায় করছে না বলেও অনেকে মত প্রকাশ করেন।

৭.৪ রাজনীতিতে 'পরিবারতন্ত্র': জনগণের প্রত্যাশা

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোতে দেখা যায় অনেক রাজনীতিক পারিবারিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় রাজনীতিতে এসেছেন। অনেকেই দলের গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন যাঁরা বর্ষীয়ান নেতার স্ত্রী, ভাই, সন্তান বা কন্যা। রাজনৈতিক পরিবার থেকে আসার বিষয়টিকে ইতিবাচক হিসেবে দেখা হয় যখন প্রকৃত রাজনীতিবিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জনগণের পাশে থেকে কোনো নেতৃত্ব উঠে আসে। তবে আমাদের দেশের রাজনীতিতে পরিবারতন্ত্রের প্রভাব দেখিয়ে এবং ক্ষমতার অপপ্রয়োগের মাধ্যমে অনেক প্রতিশ্রুতিশীল কর্মীকে বঞ্চিত করে দলীয় পদ দেওয়া হয়। এর ফলে দলে কোন্দল দেখা যায়, নেতা-কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করে। পারিবারিক বন্ধনের ওপর ভিত্তি করে দলীয় সদস্যপদ প্রদানকে জনগণও সমর্থন করেন না। তাই জরিপের ফলাফলে দেখা যায় প্রায় ৮২% উত্তরদাতা রাজনৈতিক পদে অধিষ্ঠানের জন্য শীর্ষ নেতৃত্বের সাথে পারিবারিক সম্পর্ক থাকাকে সমর্থন করেন না।

সারণি ৭.২: রাজনৈতিক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে পরিবারতন্ত্র যৌক্তিক কিনা

পরিবারতন্ত্র যৌক্তিক কিনা	*মতামত*	*শতকরা হার*
যৌক্তিক	৩৬৬	১১.৫
যৌক্তিক নয়	২৬১৯	৮২.১
জানি না	২০৫	৬.৪
মোট	৩১৯০	১০০.০

তবে এফজিডিতে অংশগ্রহণকারীরা মত দেন যে, দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা থাকলে এবং জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা থাকলে যে কেউই দলীয় নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক পদ পেতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে পারিবারিক বন্ধন থাকলেও তা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচ্য হওয়া উচিত নয়। এভাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে দলীয় পদ পেলে কোনো সমালোচনার অবকাশ থাকবে না। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেলে এটা সম্ভব বলে তাঁরা মনে করেন।

৭.৫ রাজনৈতিক দলের স্বচ্ছতা

রাজনৈতিক দলের মধ্যে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেলে তাদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে। আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলো কারও কাছে জবাবদিহি করতে চায় না বলেই তাদের বিভিন্ন কর্মকান্ডে বিশেষ গোপনীয়তা লক্ষ করা যায়। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত আর্থিক বিষয়ে স্বচ্ছতা এবং সব ধরনের তথ্যে জনগণের অধিকার নিশ্চিত করা। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আন্দোলন করেছে, বুকের রক্ত দিয়েছে, দেশ থেকে স্বৈরাচারী সরকার বিতারিত করেছে। এখনও তারা জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করে চলেছে। এত অর্জন থাকার পরও সাধারণ জনগণ ভাবতে শুরু করেছে দলগুলোর মধ্যে নিজস্ব গণতন্ত্র নেই, তাই তারা আর্থিক বিষয়গুলো জনগণের সামনে প্রকাশ করে না। জরিপে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, প্রায় উত্তরদাতাদের ৭৬% দলগুলোর তহবিল সংগ্রহের উৎস জানতে চায়, ৭৩.৩% দলীয় আয় ব্যয়ের হিসাব পেতে চায়, এবং ৬৫.৪% দলীয় নির্বাচনী ব্যয় প্রকাশিত হতে দেখতে চায়।

সারণি ৭.৩: রাজনৈতিক দলের যেসব বিষয় নিয়মিত প্রকাশ করা উচিত

দল কর্তৃক নিয়মিত প্রকাশ করার বিষয়	*সংখ্যা*	*শতকরা হার*
তহবিল সংগ্রহের উৎস	২৪২৮	৭৫.৯
দলীয় আয় ব্যয়ের হিসাব	২৩৪৫	৭৩.৩
দলীয় নির্বাচনী ব্যয় জনগণের সম্মুখে প্রকাশ	২০৯৪	৬৫.৪
সদস্যদের চাঁদার হার ও আদায়ের পরিমাণ	১১৬৪	৩৬.৪
নিরীক্ষা প্রতিবেদন	৭০৮	২২.১
দলীয় মনোনয়ন পেতে চাঁদার প্রকৃত হার	৯০৮	২৮.৪
জানি না	৩৪৩	১০.৭

এফজিডি ও কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী এবং মুখ্য তথ্যদাতাদের প্রায় সবাই জনগণের তথ্যে অধিকারের বিষয়টিকে সমর্থন করেছেন এবং রাজনৈতিক দলগুলোর নিজস্ব স্বচ্ছতার স্বার্থে তাদের আয়-ব্যয়ের হিসাব, তহবিল সংগ্রহের উৎস, সদস্যদের চাঁদার পরিমাণ, নির্বাচনে ব্যয়ের তথ্য ইত্যাদি প্রকাশ করা উচিত বলে মনে করেন। নির্বাচনে মনোনয়ন পেতে অনেক প্রার্থী

দলকে প্রচুর অর্থ প্রদান করেন বলে একজন প্রাক্তন মন্ত্রীর কাছে থেকে তথ্য পাওয়া যায়। তিনি আরও বলেন, নির্বাচনে অর্থের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পাওয়ায় সংসদ সদস্যদের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। পরবর্তীতে এইসব সংসদ সদস্যরা ব্যয়িত অর্থের বহুগুণ উদ্ধার করেন ক্ষমতার অপপ্রয়োগের মাধ্যমে। তাই নির্বাচনে মনোনয়ন পেতে কোনো প্রার্থী চাঁদা দিয়ে থাকলে তার পরিমাণও প্রকাশ করতে হবে। দলগুলো এই সকল তথ্য নির্বাচন কমিশনে জমা দিবে, কমিশন সরকারি বিভিন্ন সরকারি বিভাগের যেমন, অর্থ, বাংলাদেশ ব্যাংক, সিএজি, কর, রাজস্ব ও আবগারী সহায়তায় তথ্যের সত্যতা যাচাই করে ওয়েবসাইট বা গণমাধ্যমে জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দেবে। দল কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক বিবরণীতে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বড় অঙ্কের গরমিল প্রমাণিত হলে প্রয়োজনীয় শাস্তির বিধান থাকা উচিত বলে অনেকে মনে করেন।

৭.৬ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন প্রাপ্তি

প্রতিটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রেই কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত কমিটি ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর মাধ্যমে সকল স্তরের জনগণ রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হতে পারে এবং একজন সাধারণ কর্মীর পর্যায়ক্রমে জাতীয় পর্যায়ের নেতা হওয়ার সুযোগ থাকে। দল হতে মনোনয়ন প্রদান করার ব্যবস্থাটাও অনেকটা এরূপ। দলগুলোর সংসদীয় বোর্ড থাকে যারা স্থানীয় পর্যায়ের জেলা বা উপজেলা কমিটির সহায়তায় মনোনয়ন প্রদান করেন। গত তিনটি সংসদীয় নির্বাচনে অনেকগুলো আসনের মনোনয়ন প্রদানের পেছনে অর্থের প্রভাব বা দৌরাত্ম্য রয়েছে বলে মুখ্য তথ্যদাতা হিসেবে সাক্ষাৎকৃত সাবেক মন্ত্রী বা সংসদ সদস্যদের কাছ থেকে তথ্য পাওয়া যায়। রাজনৈতিক দলের তহবিলে এবং সংসদীয় বোর্ডের সদস্যদের বড় অংকের অনুদান প্রদানের মাধ্যমে মনোনয়ন প্রদানের অভিযোগ তাঁরা করেন। যেহেতু মনোনয়ন প্রদানের ক্ষেত্রে সংসদীয় বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত তাই জেলা বা উপজেলা কমিটির সুপারিশ অনেক ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয় না। এতে প্রকৃত রাজনীতিবিদরাও অসম নির্বাচনী দৌড়ে বাদ পড়ে যান। এর ফল হিসেবে দলের মধ্যে বিভেদ, বিবাদ বাড়ে। অযোগ্য, অরাজনৈতিক, দুর্নীতিবাজ হিসেবে অভিযুক্ত প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়ার কারণে দলের ভাবমূর্তিও ক্ষুণ্ন হয়। এ বাস্তবতার প্রেক্ষিতে সাধারণ জনগণ নির্বাচনে মনোনয়ন দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের প্রধান বিবেচ্য বিষয়গুলো তুলে ধরেন।

সারণি ৭.৪: নির্বাচনে মনোনয়ন দেয়ার ক্ষেত্রে যেসব বিষয় রাজনৈতিক দলের বিবেচনা করা উচিত

বিবেচনা করা উচিত	*একেবারে না থাকলেও চলে*	*কিছু থাকা উচিত*	*মোটামুটি থাকা উচিত*	*অবশ্যই থাকা উচিত*	*মোট*
সততা	১ (০.০)	৩ (০.১)	৭৬ (২.৪)	৩০৯৫ (৯৭.৫)	৩১৭৫ (১০০.০)
শিক্ষাগত যোগ্যতা	৯ (০.৩)	২৪ (০.৮)	২৫৩ (৮.০)	২৮৭৫ (৯১.০)	৩১৬১ (১০০.০)
জনকল্যাণে অবদান	৩ (০.১)	৬৪ (২.০)	৩৭৭ (১২.০)	২৭০৮ (৮৫.৯)	৩১৫২ (১০০.০)
রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা	৬৯ (২.২)	১৯৬ (৬.৩)	৫৩০ (১৭.১)	২২৯৮ (৭৪.৩)	৩০৯৩ (১০০.০)
স্থানীয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ততা	৬৩ (২.১)	২৪৭ (৮.২)	৭৫২ (২৫.০)	১৯৪৯ (৬৪.৮)	৩০১১ (১০০.০)
অর্থের প্রাচুর্য	৩৬৬ (১১.৮)	৭২৬ (২৩.৫)	১২৭১ (৪১.১)	৭৩০ (২৩.৬)	৩০৯৩ (১০০.০)
পেশীশক্তি	২৮০২ (৯১.৩)	১৩৮ (৪.৫)	৮৩ (২.৭)	৪৭ (১.৬)	৩০৭০ (১০০.০)

** প্রথম বন্ধনীতে প্রদত্ত সংখ্যাটি শতকরা হার প্রকাশ করে।*

জরিপে দেখা যায়, রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রদত্ত মনোনয়নের সময় প্রার্থীর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা (৭৪.৩%), জনকল্যাণে অবদান (৮৫.৯%), স্থানীয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ততা (৬৪.৮%), সততা (৯৭.৫%), এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা (৯১.০%) অবশ্যই থাকা উচিত বলে মনে করেন। এখান থেকে বোঝা যায়, সাধারণ জনগণ প্রকৃতই একজন রাজনীতিককে সংসদে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে দেখতে চায়। এই বিষয়গুলোর সাথে এফজিডির অধিকাংশ অংশগ্রহণকারীরাও একমত পোষণ করেন। মুখ্য তথ্যদাতাদের কাছ থেকেও এই ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়। তাঁরা মনে করেন, দেশে একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হলে এবং সংসদীয় ব্যবস্থাকে জোরালো করতে হলে রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রার্থী বাছাইয়ে সাবধানী হতে হবে। প্রকৃতই সৎ, যোগ্য, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, জনগণের সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করলে নির্বাচনে গুণগত পরিবর্তন হবে বলে তাঁরা মনে করেন।

অন্যদিকে রাজনৈতিক দলগুলোর বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে পেশীশক্তি একেবারে না থাকলেও চলে বলে জরিপের ৯১.৩% উত্তরদাতা মত দেন। প্রায় ৮১% উত্তরদাতা দল কর্তৃক মনোনয়ন প্রদান করতে প্রার্থীর মোটামুটি অর্থবিত্ত আছে কিনা তা বিবেচনা করা উচিত বলে উল্লেখ করেন। এ সম্পর্কে এফজিডি থেকে জানা যায়, প্রার্থীর যদি অর্থ বিত্ত থাকে তবে তাঁরা ক্ষমতা পেয়ে আর অর্থের পিছনে ছুটবেন না। কিন্তু এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন মুখ্য তথ্যদাতারা। তাঁরা বলেন, যে কোন ব্যক্তি তার রাজনৈতিক পরিচিতি, সততা, যোগ্যতা এবং জনগণের সাথে কাজ করার মানসিকতার ওপর ভর করে মনোনয়ন পেতে পারে, এখানে অর্থ-বিত্ত বিবেচ্য হতে পারে না। এটি সম্ভব হলে নির্বাচনে কালো টাকার প্রভাব ও পেশীশক্তি কমে আসবে এবং প্রকৃত রাজনীতিবিদরা দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পাবে।

৭.৭ রাজনৈতিক দলের প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ

বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ার প্রক্রিয়াটি রাজনৈতিক দলের এখতিয়ারভুক্ত। প্রতিটি দল তাদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সংসদীয় বোর্ড গঠন করে এবং এই বোর্ডের সদস্যদের ওপর সর্বোপরি দলের সভাপতির ওপর প্রার্থীর মনোনয়ন প্রদানে পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকে। সংসদীয় বোর্ডের ক্ষমতার অপপ্রয়োগের মাধ্যমে প্রার্থীর মনোনয়ন প্রদানের দৃষ্টান্ত থাকায় অনেক যোগ্য রাজনীতিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে সমর্থ হননি। অনেক প্রার্থীর বিরুদ্ধে অর্থ দিয়ে মনোনয়ন ক্রয়ের অভিযোগ পাওয়া যায়, এই সকল প্রার্থী সম্পর্কে সাধারণের জনগণের ব্যাপক অনাস্থা ও অসন্তুষ্টি ছিল। এ কারণে এফজিডি ও কর্মশালার অংশগ্রহণকারীরা মনোনয়ন প্রদানে জনমতের প্রকাশ ঘটানোর জন্য দলগুলোর কাছে দাবি জানান। তারা কেন্দ্র থেকে মনোনীত কয়েকজন প্রার্থীর ব্যাপারে সমালোচনামুখর হন। তাই তাঁরা মনোনয়ন প্রক্রিয়াটি তৃণমূল পর্যায় থেকে উচ্চ পর্যায়ে যাওয়া উচিত বলে মনে করেন। তৃণমূল পর্যায়ের জনগণ নিজ এলাকার বা সংসদীয় আসনের সম্ভাব্য প্রার্থীদের ভূমিকা ও অবদান সম্পর্কে অবগত থাকেন। তাই তাদের মতামত নেওয়া উচিত বলে কয়েকজন অংশগ্রহণকারী জোরালো মত দেন। তবে প্রক্রিয়াটি কী হতে পারে এ প্রশ্নের জবাবে তারা বলেন, দলগুলোকে গঠনতন্ত্র মেনে চলতে হবে। এছাড়াও জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কমিটি নিজ উদ্যোগে জনমত যাচাই করে প্রার্থী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবে এবং তা কেন্দ্রে সংসদীয় বোর্ডের কাছে প্রেরণ করবে।[১১৪]

> "আমাদের এমপি যেন আর না দাঁড়াইতে পারে (নির্বাচনে) তার ব্যবস্থা কইরেন"

প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ার প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ করার প্রয়োজন নেই বলে এফজিডি ও কর্মশালার কয়েকজন অংশগ্রহণকারী মনে করেন। তাদের মতে এটি দলের অভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক বিষয়। দলের গঠনতন্ত্রে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে। তাই দল সে অনুযায়ী বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটির সহায়তা নিয়ে প্রার্থিতা চূড়ান্ত করবে। জনগণের মতামত নিতে গেলে দল প্রক্রিয়াগত জটিলতায় পড়বে। একটি সংসদীয় এলাকার জনগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত। তাই একটি রাজনৈতিক দল তার উপযুক্ত প্রার্থীর সন্ধানে অন্য দলের সমর্থকদের নিকট গেলে যথার্থ সিদ্ধান্ত নাও পেতে পারেন বলে এই অংশগ্রহণকারী মত দেন। তবে তারা তৃণমূল পর্যায়ের দলীয় সদস্যদের মতামতের প্রতিফলন প্রার্থী মনোনয়নে দেখতে চান।

৭.৮ নির্বাচনী প্রচারণা

আমাদের দেশের বহুদলীয় সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জাতীয় নির্বাচন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনা করার পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের ওপর। এটি একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে দল মতের ঊর্ধ্বে থেকে সকল অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে একটি নিরপেক্ষ ক্ষেত্র তৈরি করবে যেখানে সকল দল সমান সুযোগ পাবে। এর জন্য নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী আচরণ বিধি প্রণয়ন করে। এই আচরণ বিধির লঙ্ঘনজনিত বিভিন্ন শাস্তির ব্যবস্থাও রয়েছে। আমাদের দেশের জনগণের কাছে যেকোনো নির্বাচনই, তা স্থানীয় সরকার নির্বাচন বা সংসদীয় নির্বাচন হোক, একটি উৎসব বা মেলার মতো। এর পেছনে রয়েছে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী প্রচারণার ধরন, জনগণকে প্রভাবিত করার পন্থা, স্থানীয় ও ধর্মীয় রীতি-নীতি ও সংস্কৃতির সাথে নির্বাচনের প্রচারণাকে যুক্ত করা। রাজনৈতিক দলগুলো একদিকে যেমন নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন করে অন্যদিকে নির্বাচন কমিশন একটি দুর্বল প্রতিষ্ঠান হিসেবে লঙ্ঘিত আচরণের জন্য প্রার্থী বা রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়।[১১৫]

গত দেড় দশকে এমন একটি নির্বাচনী সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে যেখানে একজন প্রার্থীর গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারিত হয় তার দলের প্রতীক, পূর্ববর্তী সরকারের সাফল্য ও ব্যর্থতা, পূর্ববর্তী সরকারের সময়ে তার দলের কার্যক্রম, এবং তার অর্থ ও স্থানীয় কর্মীদের শক্তিমত্তার ওপর। গত কয়েকটি জাতীয় নির্বাচনে ধীরে ধীরে এই ধারায় প্রার্থী মনোনয়ন এবং নির্বাচনে জয়লাভের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলো সংসদীয় ও অন্যান্য নির্বাচনে বিজয় নিশ্চিত করার জন্য কালো টাকার মালিক, সন্ত্রাসী, ব্যবসায়ী, শিল্পপতিদের মনোনয়ন দিচ্ছে। নির্বাচনে জয়লাভের জন্য প্রার্থীরা বিভিন্ন ধরনের আইন-বহির্ভূত উপায়ের আশ্রয় নিয়ে থাকে যার মধ্যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে নির্বাচনী আচরণ বিধি ভঙ্গ করা, নির্বাচনী পরিবেশ নষ্ট করা, ভোট জাল, ভোট গণনায় প্রভাব সৃষ্টি, ভোট জাল করার পরিবেশ সৃষ্টি, এবং দলীয় পর্যায়ে প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধা তৈরি ও তা সদ্ব্যবহার করা প্রধান।

আইন অনুযায়ী তফসিল ঘোষণার পরে প্রার্থীদের মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পরেই একজন প্রার্থী হিসেবে গণ্য হতে পারেন এবং নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করতে পারেন। কিন্তু দেখা যায় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণারও বহু আগে থেকে প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচারণায়

---

[১১৪] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ (সংশোধিত ২০০৮) অনুসারে প্রতিটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে স্থানীয় কমিটি থেকে সুপারিশকৃত তিন জন প্রার্থীর মধ্যে থেকেই তাদের প্রার্থী মনোনয়ন করতে হবে।

[১১৫] শাহজাদা আকরাম ও সাধন কুমার দাস, *বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন: একটি ডায়াগনস্টিক প্রতিবেদন*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০০৬।

নেমে যান। এই সময়ে প্রার্থীরা প্রচারণার মাধ্যম হিসেবে পোস্টার, দেওয়াল লিখন, ব্যাপক জনসংযোগ, জনসভা, মিছিল, র্যালি, মোটর সাইকেল শোভাযাত্রা প্রভৃতির মাধ্যমে দল থেকে মনোনয়ন পাওয়ার জন্যও এ ধরনের কার্যক্রম শুরু করেন।[১১৬]

বাংলাদেশে নির্বাচনী ব্যয় দুর্নীতির একটি অন্যতম প্রধান উৎস, যা এই দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বিনিয়োগের পরিবেশ এবং শেষ পর্যন্ত উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। গত নির্বাচনগুলোতে আইন অনুযায়ী নির্বাচনী ব্যয় পাঁচ লক্ষ টাকায় সীমিত রাখার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের তদারকির দায়িত্ব থাকলেও এটি ঠিকমতো পালন করতে পারেনি। এর একটি প্রধান কারণ হচ্ছে প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের ওপর দৃষ্টি রাখা এবং পরবর্তীতে এ সংক্রান্ত হিসাব যাচাই করার কোনো যথাযথ ও কার্যকর ব্যবস্থা নির্বাচন কমিশনের নেই।[১১৭]

স্থগিত নবম সংসদ নির্বাচনের জন্য মনোনয় পত্র প্রত্যাহারের দিন পর্যন্ত প্রার্থীদের নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘনের ওপর ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায়, ১২২ জন প্রার্থী নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণা বাবদ ৩ জানুয়ারি ২০০৭ পর্যন্ত মোট খরচ করেন ১৮ কোটি ৫৫ লক্ষ ৪৫ হাজার ৩৫০ টাকা। এই হিসেবে প্রত্যেক প্রার্থী গড়ে ১৫ লক্ষ ২০ হাজার টাকার বেশি খরচ করেন। প্রার্থীদের ব্যয়ের মধ্যে র্যালি/মিছিল, জনসভা আয়োজন, নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন ও পরিচালনা, কর্মীদের জন্য ব্যয় ও পরিবহন ব্যয় ছিল উল্লেখযোগ্য খরচের খাত। এইসব খাতে প্রার্থীরা গড়ে পাঁচ লক্ষ টাকার ওপরে ব্যয় করেন।[১১৮]

নির্বাচনী প্রচারণায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকাও অনস্বীকার্য। কিন্তু গত নির্বাচনগুলোতে তারা নিজেদের বিতর্কিত করে ফেলেছে। তাদের ওপর জনগণের আস্থা কমে যাচ্ছে। রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকাকালে নির্বাচনী প্রচারণায় জাতীয় বাজেটকে ব্যবহার করার একটি প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সর্বশেষ ২০০৬-০৭ অর্থবছরের বাজেটকে এই অর্থে ভোটের বাজেট বলে অভিহিত করা হয়।[১১৯] বিদায়ী সরকার তাদের প্রণীত শেষ বাজেটে সংসদ সদস্যদের জন্য টেস্ট রিলিফ[১২০], বিশেষ নির্বাচনী বরাদ্দ[১২১], থোক বরাদ্দ, এবং বিভিন্ন অস্বচ্ছ গুচ্ছ প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারে থাকার সুযোগ নিতে দেখা যায়। ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে বাজেটে থোক বরাদ্দ রাখা হয় ৭,৩৯৭ কোটি টাকা, যার মধ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আওতায় খাতওয়ারী বরাদ্দ তিন হাজার ২৪ কোটি ৯৩ লাখ টাকা।[১২২] সরকারি দলে থাকার পূর্ণ সুবিধা নিয়ে এক দিনে ১,৪৭৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের নভেম্বর পর্যন্ত মোট এডিপি বাস্তবায়নের হার ২০%-২৫% এর বেশি ব্যয় করে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।[১২৩]

রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচারণায় ধারাবাহিকভাবে নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন করে জনগণকে প্রভাবিত করে চলেছে। অনেক মুখ্য তথ্যদাতা মনে করেন এটি আরও বাড়ছে। কালো টাকা ও পেশীশক্তির প্রভাব বৃদ্ধির কারণে নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয় না বলে তাঁরা মত দেন। এ প্রেক্ষাপটে জরিপের উত্তরদাতাদের অধিকাংশই নির্বাচনী প্রচারণার ধরন পরিবর্তনের পক্ষে মত দেন। প্রায় ৫৬% উত্তরদাতা বলেন নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে নির্বাচনী প্রচারণা হওয়া উচিত। এফজিডির অংশগ্রহণকারীরা এর ব্যাখ্যায় বলেন, দল বা প্রার্থী নির্বাচনের নিজে কোনো প্রচারণা করতে পারবেন না, তাঁরা নির্বাচনে ব্যয়ের জন্য নির্ধারিত অর্থ বা কম নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দেবেন। নির্বাচন কমিশন সেই অর্থ দিয়ে পোস্টার ও লিফলেট

---

[১১৬] শাহজাদা আকরাম ও সাধন দাস, *নির্বাচনী ব্যয় পর্যালোচনা: স্থগিত নবম সংসদ নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের দিন পর্যন্ত প্রার্থীদের নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘনের ওপর একটি বিশ্লেষণ*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০০৭।

[১১৭] *প্রাগুক্ত*।

[১১৮] *প্রাগুক্ত*।

[১১৯] *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৫ জুন ২০০৬।

[১২০] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৯ আগস্ট ২০০৬। ভোটের আগে সংসদ সদস্যদের জন্য টেস্ট রিলিফ হিসেবে দেড় লাখ টন চাল খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে জেলা প্রশাসকের অনুকূলে বরাদ্দ দেওয়া হবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচির অধীনে প্রতি নির্বাচনী এলাকায় সর্বোচ্চ দেড় কোটি থেকে সর্বনিম্ন ৩৫ লাখ টাকা করে দেওয়া হয়। প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় সাধারণভাবে ১০০ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দেওয়ার কথা যার বাজার মূল্য প্রতি টন ১২ হাজার টাকা।

[১২১] *দৈনিক যুগান্তর*, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৫। জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ক্ষমতাসীন জোট সরকারের শরিক দলগুলোর ২২০ জন এমপির নামে বিশেষ রাজনৈতিক বরাদ্দ হিসেবে ২২০ কোটি টাকা ও ৩ লাখ ২৫ হাজার মেট্রিক টন চাল দেয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিএনপি প্রত্যেক সংসদ সদস্যের আসনে ১ কোটি টাকা ও ২০০ টন চাল এবং জোট শরিক দল জামায়েতে ইসলামী ও বিজেপি সংসদ সদস্যদের প্রত্যেকের আসনে ৫০ লাখ টাকা ও ১০০ টন করে চাল বরাদ্দ দেয়া হয়।

[১২২] *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৩ জুলাই ২০০৬।

[১২৩] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৮ জানুয়ারি ২০০৭। একইভাবে দেখা যায়, ক্ষমতা ত্যাগের আগে আগে চার মাসে ঐচ্ছিক তহবিলের পুরো টাকা নিয়ে যান জোট সরকারের ২৫ মন্ত্রী যার পরিমাণ প্রায় ৫৪ লাখ টাকা। আরও ১৭ জন মন্ত্রী, প্রতি মন্ত্রী ও উপমন্ত্রী ক্ষমতা ছাড়ার পরও আগের তারিখে ২২ লাখ টাকা ওঠানোর জন্য প্রধান হিসাব রক্ষণের অফিসে পাঠিয়েছিলেন (*দৈনিক প্রথম আলো*, ২০ জানুয়ারি ২০০৭)।

ছাপানো, একটি মঞ্চে এনে সব দলের প্রতিনিধিদের জনগণের মুখোমুখি করা, গণমাধ্যমে প্রশ্নের সম্মুখীন করা ইত্যাদি উদ্যোগ নিয়ে প্রার্থীদের হয়ে প্রচারণা চালাবেন।

সারণি ৭.৫: নির্বাচনী প্রচারণা কিভাবে হওয়া উচিত

নির্বাচনী প্রচারণা	*সংখ্যা*	*শতকরা হার*
নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে	১৭৮১	৫৫.৭
বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে	৯৭৩	৩০.৪
ব্যক্তিগত ও দলীয় পর্যায়ে	৯৫৯	৩০.০
জানি না	২২০	৬.৯

** একাধিক উত্তর প্রযোজ্য*

মুখ্য তথ্যদাতাদের অনেকেই এই মতকে সমর্থন করলেও নির্বাচন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাছাড়া আমাদের দেশে নির্বাচন কমিশন সকল দলের কাছে এখনও গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হতে পারেনি। তবে নির্বাচন কমিশন যদি তার এখতিয়ারাধীন নির্বাচনী আচরণ বিধি ১৯৯৬[১২৪] প্রয়োগ করতে পারে এবং লঙ্ঘনজনিত কারণে অভিযুক্ত প্রার্থীর বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারে তাহলে নির্বাচনী প্রচারণার ব্যয় কমানো সম্ভব। সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন প্রার্থীর মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার সময় প্রার্থীর সমর্থনে আয়োজিত শো-ডাউন বন্ধ করেছে। এ রকম আরও কিছু পদক্ষেপ, যেমন নির্বাচনী ক্যাম্পের সংখ্যা কমানো, মিছিল সংখ্যা কমানো এবং রাতের অন্ধকারে ভোটারদের অর্থ প্রদান রোধ করা গেলে নির্বাচনী প্রচারণা ব্যয় কমানো সম্ভব হবে। এতে অবাধ, নিরপেক্ষ ও মুক্ত নির্বাচন পরিচালনার প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে বলে তাঁরা মনে করেন।

৭.৯ উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, একটি দেশের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তি প্রস্তুত হয় রাজনৈতিক দলগুলোর আভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক চর্চার ওপর। কিন্তু আমাদের দেশে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পরিচালিত না হয়ে অনেকটা ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। দলগুলোতে নিয়মিত সভা, দলের কাউন্সিল নির্বাচন, নেতা নির্বাচন, আয় ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ ইত্যাদি হয় না। এ কারণে জনগণের নিকট থেকে জোরালো দাবি এসেছে দলগুলোর মধ্যে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য। এটি হলে দলে পরিবারতন্ত্র রোধ করা সম্ভব। যোগ্য, দক্ষ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্ব তৈরি করতে হলে দলকে অবশ্যই সকল ধরনের স্বজনপ্রীতি, পরিবারতান্ত্রিক মানসিকতা, অর্থের লোভ ত্যাগ করতে হবে।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ অনুসারে প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে নির্বাচন কমিশনের সাথে নিবন্ধিত হওয়ার আইন থাকলেও তারা এটিকে আমলে নেয়নি। এই বিষয়ে জনগণের মত, রাজনৈতিক দলের নিজস্ব জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার স্বার্থে নির্বাচন কমিশনের অধীনে নিবন্ধিত হওয়া উচিত। রাজনৈতিক দল তার কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে পারলে দেশের অগ্রগতিতে তার ব্যাপক প্রভাব পড়বে। কারণ দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার প্রধান শক্তি রয়েছে রাজনৈতিক দলের হাতে। আর গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনগণের তথ্যে অধিকার। কিন্তু আমাদের দলগুলো তাদের আয় ব্যয়ের হিসাব, নিরীক্ষা প্রতিবেদন, আর্থিক তহবিলের উৎস, নির্বাচনী মনোনয়ন প্রদানে গৃহীত অর্থের পরিমাণ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করতে চায় না। এতে দলের মধ্যে দুর্নীতির ক্ষেত্র তৈরি হয়। এর ফলে দলের গুটিকয়েক নেতা বর্তমানে লাভবান হলেও দলের বা গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাই জনগণের কাছ থেকে দলের আর্থিক ও অন্যান্য সকল তথ্য প্রকাশের জোর দাবি উত্থাপিত হয়েছে।

রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে মনোনয়ন দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রকৃত যোগ্যতা যাচাই না করে অর্থের বা স্বজনপ্রীতির বা অন্য কোন গূঢ় কারণে অযোগ্য ব্যক্তিকে বাছাই করে। এতে দলের ও জনগণের মধ্যে দল সম্পর্কে একটি নেতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়। তাই জনগণ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, জনকল্যাণে অবদান, স্থানীয় রাজনীতির অভিজ্ঞতা, সৎ ও শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন রাজনীতিবিদকে নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেওয়ার পক্ষে মত দেয়। সর্বোপরি নির্বাচনী প্রচারণায় নির্বাচনী আচরণ বিধির লঙ্ঘন, নির্বাচন কমিশনের প্রতি রাজনৈতিক দলগুলোর আস্থাহীনতা, আইন প্রয়োগে নির্বাচন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার কারণে আমাদের দেশে নির্বাচন পরিপূর্ণভাবে অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু হয় না। নির্বাচনে কালো টাকা ও পেশীশক্তির প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেকে নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে নির্বাচনী প্রচারণা করা প্রয়োজন বলে মনে করেন। যদিও তারা নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতা ও এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে চিন্তার অবকাশ রয়েছে বলে মত দেন।

[১২৪] এসআরও নং ৬০ আইন/৯৬। এসআরও নং ২২৪ আইন/২০০১ দ্বারা ২০ আগস্ট ২০০১ তারিখে সংশোধিত।

অধ্যায় আট
সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণ বিধি

সংসদ সদস্যরা দেশের আইন প্রণয়নকারী সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি। তাই জনগণ আশা করে তাঁরা নিজেদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে সর্বোচ্চ পর্যায়ের নৈতিকতা প্রদর্শন করবেন এবং জনগণের কাছে রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত হবেন। সংসদ অধিবেশনে অসংসদীয় ভাষার অত্যধিক ব্যবহার, সংসদীয় শিষ্টাচারের অভাব, যথাযথ রাজনৈতিক আবহের অনুপস্থিতি, সংসদ সদস্যদের মধ্যে দুর্বল ব্যক্তিগত সম্পর্ক, দলগুলোর মধ্যে একে অপরের প্রতি তীব্র-বিদ্বেষ ইত্যাদি কারণে সংসদ সদস্যদের জন্য একটি আচরণ বিধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে বলে মুখ্য তথ্যদাতারা মনে করেন। আমাদের দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণ বিধি একটি নতুন ধারণা হওয়া সত্ত্বেও এ সম্পর্কে জনমত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ অধ্যায়ে সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণ বিধি'র ওপর প্রাথমিক ধারণা, আচরণ বিধির মৌলিক বা আবশ্যিক উপাদানসমূহ, অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা ও পরিশেষে বাংলাদেশে আচরণ বিধি প্রণয়নে জনগণের মতামত ও প্রত্যাশার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

৮.১ সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণ বিধি: ধারণার উৎপত্তি এবং অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা

সংসদ সদস্যদের জন্য 'আচরণ বিধি' বিভিন্ন আইনসভায় প্রচলিত ও গৃহীত বিধি যা আইন প্রণেতাদের একটি আচরণের মানদন্ড নির্দিষ্ট করে দেয়। যুক্তরাজ্যে সরকারি কর্মকর্তাদের অর্থনৈতিক স্বচ্ছতার বিষয়ে জনগণের উৎকণ্ঠার ভিত্তিতে ১৯৯৪ সালে লর্ড নোলানের সভাপতিত্বে 'জন জীবনের নৈতিক মানদন্ডের ওপর কমিটি' গঠন করা হয়। এই কমিটির প্রধান বিষয় ছিল সাধারণভাবে জন-জীবন এবং বিশেষভাবে যেখানে সরকারি অর্থ ব্যয় জড়িত তার একটি নির্দিষ্ট মানদন্ড নিয়ে কাজ করা। এই কমিটি যেসব বিষয় নিয়ে কাজ করে তার মধ্যে ছিল আচরণ বিধি, বার্ষিক পারিশ্রমিক, একজন স্বাধীন পর্যবেক্ষকের (Watchdog) নিয়োগ, এবং সংসদ সদস্যদের সংসদ সংক্রান্ত পরামর্শক হিসেবে কাজ করার প্রবণতা। এই কমিটির প্রথম প্রতিবেদন ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত হয়, যেখানে সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণের পথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কিছু মৌলিক নীতি সম্বলিত আচরণ বিধি প্রণয়নের সুপারিশ করে।[১২৫] এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৬ সালের ২৪ জুলাই হাউজ অব কমন্স সংসদ সদস্যদের আচরণ সম্পর্কিত একটি আচরণ বিধি অনুমোদন করে। এই আচরণ বিধিতে 'রাষ্ট্রীয় জীবনের সাতটি মূলনীতি' অন্তর্ভুক্ত হয়। এগুলো হচ্ছে (১) স্বার্থহীনতা, (২) চারিত্রিক দৃঢ়তা, (৩) বস্তুনিষ্ঠতা, (৪) জবাবদিহিতা, (৫) স্বচ্ছতা, (৬) সততা, এবং (৭) নেতৃত্ব।[১২৬] এই সাতটি মূলনীতি সংসদ সদস্য, মন্ত্রী, সরকারি কর্মকর্তা, এবং অ-বিভাগীয় সরকারি সংস্থা ও জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সংস্থার নির্বাহীদের জন্য প্রযোজ্য।

বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশে (যেমন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, ফিজি, জার্মানি, গ্রেনাডা, ইসরায়েল, জাপান, ফিলিপাইন, ফ্রান্স ইত্যাদি) সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণ বিধি বা এ সংশ্লিষ্ট আইন রয়েছে। এই ধরনের আচরণ বিধি কোনো কোনো দেশে সমঝোতার ভিত্তিতে পালিত হয় (যেমন ফ্রান্স), আবার কোনো কোনো দেশে যথাযথ আইনী প্রক্রিয়ায় প্রণীত হয়েছে (যেমন দক্ষিণ আফ্রিকা)। ফিজি, জার্মানি, গ্রেনাডা, ইসরায়েল, জাপান, ফিলিপাইন, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র – এই দেশগুলোতে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গৃহীত আচরণ বিধি রয়েছে।[১২৭] বিভিন্ন দেশে প্রচলিত এই নৈতিকতা বিধি বা আচরণ বিধিগুলোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কোনো কোনো আচরণ বিধিতে আইনসভার সদস্যদের পেশাগত কার্যক্রমের জন্য সাধারণভাবে উঁচু পর্যায়ের নৈতিকতা ও মূল্যবোধ নির্দেশ করে থাকে। অন্যদিকে কোনো কোনো আচরণ বিধির মাধ্যমে এসব নীতি ও মূল্যবোধ প্রায়োগিক ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করা থাকে।[১২৮] নিচে কয়েকটি দেশের আচরণ বিধির ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

যুক্তরাষ্ট্র: যুক্তরাষ্ট্রে সিনেট এবং হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভ এ যথাক্রমে Select Committee on Ethics এবং Committee on Standard of Official Conduct নামে দুইট কমিটি রয়েছে।[১২৯] এই নৈতিকতা কমিটিগুলোর কয়েকটি ক্ষমতা রয়েছে, যেমন আচরণ বিধি নিশ্চিত করার জন্য বিধি বিধান সুপারিশ করা, আচরণ বিধি ভঙ্গ সংক্রান্ত যেকোনো অভিযোগ গ্রহণ করা, এবং বিভিন্ন আর্থিক তথ্য প্রকাশের বিধি প্রয়োগ নিশ্চিত করা। নৈতিক আচরণ বিধির ধারাগুলো দুটি কক্ষের নির্বাচিত জন

---

[১২৫] বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন <http://www.archive.official-documents.co.uk/document/parlment/nolan/nolan.htm> (accessed on 7 October 2008).

[১২৬] 'Codes of Conduct for Parliamentarians', <http://www.corisweb.org/> (accessed on 4 January 2007).

[১২৭] বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন <www.ipu.org>।

[১২৮] যুক্তরাজ্য ও শ্রীলঙ্কার আচরণ বিধির জন্য পরিশিষ্ট ৮ ও ৯ দ্রষ্টব্য।

[১২৯] Prof. Md. Ali Ashraf, *Ethical Standards of Parliamentarians*, Bangladesh Institute of Parliamentary Studies, Dhaka, October 2001.

প্রতিনিধিদের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।[১৩০] কোনো অভিযোগের ভিত্তিতে অফিসিয়াল আচরণের মানদণ্ডের ওপর কমিটি বহিষ্কার, কঠোর তিরস্কার, হুঁশিয়ারি, জরিমানা, যেকোনো অধিকার, ক্ষমতা এবং/বা সুবিধা থেকে বঞ্চিত বা সীমিত করা, বা অন্য যেকোনো ধরনের শাস্তি দিতে পারে।

ভারত: ১৯৯৮ সালের ৮ ডিসেম্বর ভারতের রাজ্যসভার নৈতিকতা বিষয়ক কমিটি সংসদ সদস্যদের জন্য একটি আচরণ বিধি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন যা ১৯৯৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর গৃহীত হয়। ২০০৫ সালের ১৪ মার্চ উক্ত কমিটির চতুর্থ প্রতিবেদনে সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণবিধির অন্তর্ভুক্ত বিষয় সম্বলিত প্রতিবেদন উপস্থাপনের পর ২০০৫ সালের ২০ এপ্রিল গৃহীত হয়।[১৩১]

ভারতে ২০০২ সালের মে মাসে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী লোকসভা ও অন্যান্য আইনসভায় যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে তাদের জন্য ভারতীয় নির্বাচন কমিশনে হলফনামার মাধ্যমে তাদের ব্যক্তিগত তথ্য দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। সুপ্রিম কোর্ট আরও নির্দেশ দেয় যে ভোট গ্রহণের আগেই এসব তথ্য জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে। কোর্টের ভাষ্য অনুযায়ী প্রার্থীদের ইতিহাস সম্পর্কে জানার অধিকার রয়েছে নাগরিকদের এবং এটি মৌলিক অধিকার। এই নির্দেশের উদ্দেশ্য ছিল জনগণ যেন তথ্যসমৃদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। যেসব তথ্য দিতে হবে তার মধ্যে রয়েছে শিক্ষাগত যোগ্যতা, সম্পদ, ফৌজদারি মামলা, সরকারি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ, এবং প্রার্থীর কাছে সরকারের কোনো বকেয়া থাকলে সেই তথ্য। তবে প্রার্থীদের পেশা, আয়ের উৎস বা প্রকৃত আয় সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ এই হলফনামার অন্তর্ভুক্ত নয়।[১৩২]

শ্রীলংকা: শ্রীলংকার সংসদীয় কমিটি সংসদ সদস্যদের আচরণ বিধি প্রণয়নের জন্য কিছু সুপারিশ প্রস্তাব করে। সুপারিশগুলোর মধ্যে ব্যক্তিগত আচরণ সংশ্লিষ্ট, দাপ্তরিক কাজে সততা, নিরপেক্ষতা সংশ্লিষ্ট, ও ক্ষমতা অপব্যবহার সম্পর্কিত, সরকারের সাথে চুক্তি, মালিকানা, আর্থিক কিংবা এরূপ অন্য কোনো স্বার্থ-সম্পর্কিত বিষয়, অযাচিতভাবে প্রভাব বিস্তার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত, ব্যক্তিগত স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়, বিদেশী রাষ্ট্রে অবস্থানকালীন আচরণ সম্পর্কিত, আতিথেয়তা গ্রহণের ক্ষেত্রে আচরণ বিধি, বিদেশ ভ্রমণ সম্পর্কিত এবং আচরণ বিধির লঙ্ঘন সম্পর্কিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত।[১৩৩]

৮.২ সংসদ সদস্যের জন্য আচরণ বিধি'র মূল উপাদানসমূহ

সংসদ সদস্যদের জন্য প্রণীত আচরণ বিধিতে সাধারণত যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে সেগুলো হচ্ছে:[১৩৪]

১. স্বার্থের দ্বন্দ্ব বিষয়ক দিক-নির্দেশনা এবং এই সংক্রান্ত বিষয়ে সংসদের নির্দেশনা অনুযায়ী স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট পূর্ব-ঘোষণা দিতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে আরোপিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা।
২. সংসদীয় নিরাপত্তা বিষয়ক নির্দেশনা। তবে এটি সীমিত অর্থে ব্যবহার করা হয় যেন সদস্যরা এর সুযোগ নিয়ে সাধারণ অপরাধ করে আইনের হাত থেকে বেঁচে যেতে না পারেন।
৩. সংসদীয় অধিকার বা সম্পদের অপব্যবহার নিষিদ্ধ করা।
৪. সংসদীয় সময়সীমার পরবর্তী নিয়োগ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা (restriction)।
৫. রাজনৈতিক অনুদান এবং নির্বাচনী ব্যয়ের উৎস ও পরিমাণ প্রকাশ করা সংক্রান্ত ধারা।
৬. সংসদের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত করে বা এর সম্মান ও মর্যাদা নষ্ট হয় এমন কাজ থেকে বিরত রাখা।
৭. জবাবদিহিতা প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে এমন কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকা। যেমন প্রয়োজনীয় নথিপত্র সরবরাহ করায় ব্যর্থতা বা সংসদে বা কমিটিতে প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থতা।

স্টাপেনহার্স্ট ও পেলিজ্জো এর মতে আচরণ বিধির অধীনে যেসব বিষয়ে তথ্য প্রকাশ করা উচিত সেগুলো হচ্ছে:[১৩৫] (১) আয়কর রিটার্ন, (২) পৈত্রিক আয়ের উৎস, (৩) বিনিয়োগ, (৪) ব্যবসায়ে অংশীদারের আয়ের উৎস, (৫) ব্যবসায়ে অংশীদার হিসেবে স্বার্থ, (৬) 'রিয়েল এস্টেট' সংক্রান্ত স্বার্থ, (৭) পরিচালনা পরিষদে অন্তর্ভুক্তি বা পদায়ন, (৮) ঋণগ্রস্ততা, (৯) সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে লীজ ও অন্যান্য চুক্তি, (১০) রিটেইনার (সেবা লাভের জন্য অর্থ ব্যয়কারী), (১১) সরকারি প্রতিষ্ঠানে ক্ষতিপূরণমূলক প্রতিনিধিত্ব, (১২) সম্মানী, (১৩) পেশাদারী লাইসেন্স, (১৪) ব্যক্তিগত উৎস থেকে প্রাপ্ত ভ্রমণ ভাতা, (১৫)

---

[১৩০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮-১৯।
[১৩১] বিস্তারিত জানতে দেখুন RAJYA SABHA Secretariat, *Code of Conduct for Members of Rajya Sabha*, New Delhi, 2005, http:\\rajyasabha.gov.in/code.htm
[১৩২] Samuel Paul and M Vivekananda, *Holding a Mirror to the New Lok Sabha*, Public Affairs Centre (PAC), 2004। উল্লেখ্য, প্রার্থীদের সবাই সব তথ্য দেয় না, তথ্য গোপন করে বা বাড়িয়ে লেখে।
[১৩৩] প্র মো. আলী আশরাফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫-২৭।
[১৩৪] 'Codes of Conduct for Parliamentarians', <http://www.corisweb.org/> (accessed on 4 January 2007).
[১৩৫] Rick Stapenhurst and Riccardo Pelizzo, 'Legislative Ethics and Codes of Conduct', WBI Working Papers, World Bank Institute, Washington, 2004, pp. 9-10.

আর্থিক প্রতিষ্ঠানে গচ্ছিত অর্থ, (১৬) বীমাকৃত অর্থ, (১৭) ব্যক্তি পর্যায়ে নিয়োগকর্তা বা ব্যক্তিগত নিয়োগের ধরন, (১৮) পেশাগত সেবা গ্রহণ, (১৯) ট্রাস্টিদের মাধ্যমে ট্রাস্ট নির্ধারণ, (২০) সুবিধাগ্রহীতাদের মধ্যে ট্রাস্ট নির্ধারণ, (২১) পরিবারের সদস্যদের নাম, এবং (২২) স্বামী বা স্ত্রীর আর্থিক স্বার্থ।

আবার আচরণ বিধিতে যেসব নিষেধাজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত সেগুলো হচ্ছে: (১) ব্যক্তিগত লাভের জন্য সরকারি ক্ষমতার ব্যবহার, (২) দাপ্তরিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করার জন্য সুবিধা প্রদান, (৩) সরকারি গোপন তথ্য ব্যবহার, (৪) সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর দুই বছরের জন্য নিয়োগ, (৫) নির্দিষ্ট অঙ্কের ঊর্ধ্বে উপহার গ্রহণ, (৬) সরকারি কর্মকর্তাদের সম্মানী গ্রহণ, (৭) সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যক্তিগত সেবাগ্রহীতা (খদ্দের) হিসেবে দায়িত্ব পালন, (৮) আর্থিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব, (৯) স্বজনপ্রীতি, (১০) কর্মচারীদের রাজনৈতিক কর্মকান্ড, (১১) প্রতিযোগিতামূলক দর প্রস্তাব, (১২) সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যবসা বা অন্য চাকরি, এবং (১৩) বেসরকারি সেবাখাত থেকে ভ্রমণ ভাতা গ্রহণ।[১৩৬]

আচরণ বিধির ধারাগুলোর মধ্যে অর্থ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ, স্বার্থের দ্বন্দ্ব, এবং চাকরির ওপর নিষেধাজ্ঞা অনেক দেশেই বিদ্যমান। যেমন সংসদ সদস্যদের সকল প্রকার অর্থনৈতিক স্বার্থ (সম্পদ ও আয়) সংক্রান্ত তথ্য বাধ্যতামূলকভাবে প্রকাশ করার বিধান বিশ্বের ২৩ শতাংশ দেশেই রয়েছে। বিশ্বের ৪১টি দেশে ব্যক্তিগত সম্পদ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করার বিধান রয়েছে। স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য বিশেষ করে কোনো বিষয়ে সংসদে বিতর্কের আগে সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যদের দ্বারা তথ্য প্রকাশ করার বিধান বিদ্যমান। এর উদ্দেশ্য জনগণের স্বার্থ না দেখে ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার সুযোগ রোধ করা। বেশিরভাগ দেশেই নির্দিষ্ট অঙ্কের সীমার বাইরে উপহার গ্রহণ এবং বেসরকারি (ব্যক্তিগত) খাত থেকে ভ্রমণ ভাতা গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। তবে এটি একেক দেশে একেকভাবে বিদ্যমান। যেমন জাম্বিয়ার 'পার্লামেন্টারি অ্যান্ড মিনিস্টারিয়াল কোড অব কনডাক্ট অ্যাক্ট' সম্পদের দেনার হিসাব উন্মুক্তকরণ আইন রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য। এই আইনের অধীনে মন্ত্রীদের ও স্পিকারের সম্পদ ও দেনার হিসাব প্রতি বছর দাখিল করতে হবে। এতে ব্যর্থ হলে সদস্যপদ ও মন্ত্রীত্ব হারাতে হয়। তবে উল্লেখযোগ্য, সাধারণ সংসদ সদস্যদের এই কাজটি করতে হবে না। মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের স্বার্থের দ্বন্দ্ব সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করতে হবে। কোনো মন্ত্রী বা সংসদ সদস্য জ্ঞাতসারে ব্যক্তিগত স্বার্থ লাভের জন্য কোনো উপহার গ্রহণ বা তথ্য পাচার বা পরামর্শ দান করলে নীতিমালা ভঙ্গ হবে। এই ধরনের কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ার পর জুডিশিয়াল ট্রাইব্যুনাল এর মাধ্যমে বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলে সদস্যপদ হারাবেন। এর পাশাপাশি জেল-জরিমানাও হতে পারে।[১৩৭]

৮.৩ সংসদ সদস্যদের আচরণ বিধি: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

জাতীয় সংসদের সদস্যদের কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তির বিধান রয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী সংসদের যে সদস্যের ওপর সংসদের কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রণ, কার্য পরিচালনা বা শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে, তিনি সকল ক্ষমতাপ্রয়োগ সম্পর্কিত কোনো ব্যাপারে কোনো আদালতের এখতিয়ারের অধীন হবেন না। সংসদে বা সংসদের কোনো কমিটিতে কিছু বলা বা ভোটদানের জন্য কোনো সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে কোনো আদালতে কার্যধারা গ্রহণ করা যাবে না।[১৩৮] এছাড়াও সংসদ অধিবেশন চলাকালীন কোনো সদস্য বক্তব্য উপস্থাপন করার সময় অন্য কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে অশালীন বক্তব্য, ব্যক্তিগত আক্রমণ, আক্রমণাত্মক ভাষা, হেয় প্রতিপন্ন করা এবং যৌক্তিক কারণ ছাড়া তার বিরুদ্ধে দোষারোপ করা যাবে না।[১৩৯]

যদি কোনো সংসদ সদস্যকে নির্দিষ্ট কোনো অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করতে হয় বা তাকে মুক্ত করতে হয় তবে অবশ্যই স্পিকারকে নির্ধারিত ফরমের মাধ্যমে জানাতে হবে। তবে স্পিকারের অনুমতি ছাড়া সংসদীয় এলাকার মধ্যে কোনো সদস্যকে গ্রেফতার করা বা অন্য কোনো ধরনের আইনী কার্যক্রম চালানো যাবে না।[১৪০] অন্যদিকে সংসদে শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার জন্য সংসদ সদস্যদের জন্য স্পিকারের পক্ষ থেকে সতর্কতা সংকেত প্রদান, বক্তব্যদান বন্ধ করে দেওয়া, বহিষ্কার, এবং অধিবেশনে যোগদান সাময়িকভাবে স্থগিত করার বিধান রয়েছে।[১৪১] বাংলাদেশে সংসদ সদস্যদের জন্য সুনির্দিষ্ট আচরণ বিধি এখনও প্রণীত

---

[১৩৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০।

[১৩৭] বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন A W Chanda, *Disclosure Laws in Zambia,* Position Paper, Transparency International Zambia, 2005।

[১৩৮] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৭৮ (২) ও (৩), (১৯৯৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সংশোধিত)।

[১৩৯] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *সংসদীয় কার্যপ্রণালী বিধি*, ধারা ২৭০ (২), (৫), (৬), (৭) এবং (৯), এবং ২৭১।

[১৪০] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *সংসদীয় কার্যপ্রণালী বিধি*, ধারা ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, এবং ১৭৫।

[১৪১] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *সংসদীয় কার্যপ্রণালী বিধি*, ধারা ১৪ (৩), (৫) ও (৬), ১৫ থেকে ১৭, ২৭০ (২), (৫), (৬), (৭) এবং (৯), ২৭১, ২৭৩ এবং ৩০৩।

হয়নি, তবে আচরণ বিধিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মতো কিছু শর্ত সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন নির্বাচনের জন্য অযোগ্যতা এবং সদস্যপদ খারিজ হওয়ার কারণসমূহ।[১৪২]

বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশে সংসদ সদস্যদের জন্য সুনির্দিষ্ট আচরণ বিধি থাকলেও বাংলাদেশে এখনও কোনো আচরণ বিধি প্রণয়ন করা হয়নি। যদিও জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির বিভিন্ন ধারায় সংসদ সদস্য কর্তৃক সংসদের বৈঠক চলাকালে পালনীয় বিধি বিষয়ক বলা আছে[১৪৩] কিন্তু সংসদের বাইরে এবং দৈনন্দিন কার্যকলাপে সংসদ সদস্য হিসেবে তাদের করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ নেই। ফলে সংসদ সদস্যরা এমন কিছু কার্যকলাপে লিপ্ত হন যা জনগণের কাছে অনেক ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য হয় না। গত অষ্টম সংসদে নেতাদের অত্যধিক তোষামদী, বিরোধী দলের অগঠনমূলক সমালোচনা, অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা, ওয়াক আউট, বয়কট, বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি ইত্যাদি সংসদের কার্যকারিতার পথে বাধা সৃষ্টি করে। সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণ বিধি প্রণয়নের জন্য যেসব রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রয়োজন তার প্রতিটি বাংলাদেশে বিদ্যমান।

জরিপেও দেখা যায়, অংশগ্রহণকারীরা সংসদে যেসব আচরণ প্রত্যাশা করেন না তার মধ্যে রয়েছে সংসদে বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি (৮০.৬%), অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা (৭৫.৩%), নেতাদের তোষামোদী (৬১.৬%), অগঠনমূলক সমালোচনা (৫৭.৬%), এবং বয়কট (৪৮.৮%)। মুখ্য তথ্যদাতা, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন ও কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মতামত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, জনগণ মনে করেন, সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণ বিধি অবশ্যই থাকা দরকার। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের নাগরিক তথা ভোটারদের কাছে সংসদ সদস্যকে অধিক জবাবদিহি করে তোলা যায়। বাংলাদেশের জনগণ আশা করেন, পরবর্তী নির্বাচিত সরকার সংসদ সদস্যদের জন্য পূর্ণাঙ্গ আচরণ বিধি প্রণয়নে সচেষ্ট হবে ।

এই আচরণ বিধিতে নিচের বিষয়গুলো উল্লেখ থাকা প্রয়োজন:

১. ***সাধারণ বিষয়:*** স্থানীয় সরকারের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের অযাচিত হস্তক্ষেপ দূর করতে সংসদ সদস্য হিসেবে তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্ট করা, জন-প্রতিনিধি হিসেবে মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে করণীয়, সরকারি বা সেরকারি প্রশাসনে হস্তক্ষেপ রোধ, প্রশ্নবিদ্ধ বা সাধারণ জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এমন স্থান যেমন নৃত্যশালা বা জুয়ার আড্ডায় গমন না করা সংক্রান্ত ইত্যাদি বিষয়সমূহ।

২. ***সংসদ সংশ্লিষ্ট বিষয়:*** সংসদে প্রবেশ এবং ত্যাগকালীন সময়ে করণীয় আচরণ, সংসদে পোশাক পরিচ্ছদ সম্পর্কিত, সংসদীয় কার্যকলাপে বিঘ্ন সৃষ্টি সংক্রান্ত, ফ্লোর ক্রসিং বা পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার বিষয়ক, অনুপস্থিতিজনিত কারণে সদস্যপদ বাতিল সংক্রান্ত ইত্যাদি বিষয়সমূহ সম্পর্কিত।

৩. ***স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বা অর্থ-সম্পদ সংক্রান্ত:*** প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উৎস থেকে অর্জিত সম্পদ, আয়-ব্যয়ের উৎস, পরিবারের অন্য সদস্যদের যাবতীয় সম্পদ এবং দেনার হিসাব প্রকাশ নিয়মিত প্রকাশ এবং মিথ্যা তথ্য প্রদানে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, সংসদ সদস্য থাকাকালীন এবং পরবর্তী সময়ে কোনো লাভজনক পদে থাকা সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন, দাপ্তরিক ক্ষমতা ব্যবহার করে ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কোনো পরিকল্পনা সমর্থন বা চুক্তি সম্পাদন, প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে কোনো প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি কিংবা সংগঠনের পক্ষে কোন ব্যবসায়িক সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য তদবির সংক্রান্ত, অযাচিতভাবে প্রভাবিত করা বা চেষ্টা করা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ।

৪. ***উপহার বা আর্থিক সুবিধা সংক্রান্ত:*** বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কিংবা দেশের বাইরে অন্য কারও কাছ থেকে উপহার বা আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা বা না করা সম্পর্কিত বিষয়।

৫. ***সংসদের মর্যাদা ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত:*** সংসদের সীমানার মধ্যে অনশন কিংবা অন্য কোনো উপায়ে প্রতিবাদ করা, সংসদকে অভয়াশ্রম কিংবা প্রতিরক্ষার স্থান হিসেবে ব্যবহার, স্পিকারের লিখিত অনুমতি ছাড়া সংসদীয় সীমানায় কোনো প্রকার সাহিত্য, প্রশ্নপত্র কিংবা প্যামফ্লেট বিতরণ ইত্যাদি সংক্রান্ত।

৬. ***আতিথেয়তা বিষয়ক:*** দাপ্তরিক উদ্দেশ্য ছাড়া কোনো কূটনৈতিক দূতাবাস বা বিদেশি কোনো মিশন বা কোনো বিদেশি সংস্থার আতিথেয়তা গ্রহণ করা বা না করা সংক্রান্ত, কোনো ব্যবসায়ী বা স্বার্থ গ্রুপ কর্তৃক প্রদত্ত দুপুরের খাবার, রাতের

---

[১৪২] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৬৬ (২) (ঘ) (ঘঘ), (৪) ও (৫), অনুচ্ছেদ ৬৯।

[১৪৩] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, *কার্যপ্রণালী বিধি* ১৪-১৬, ১৫৯-১৬১, ১৭৭-১৮০, ২৬৭-২৭৭, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি, ২০০৭।

খাবার কিংবা জনগণের দৃষ্টিতে মর্যাদা ক্ষুণ্নকারী অন্য কোনো বিনোদনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা ও নিয়ম ইত্যাদি সংক্রান্ত।

৭. ***বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত***: বিদেশি সরকার কিংবা সংস্থার কিংবা প্রতিষ্ঠানের কিংবা এরূপ কোনো এজেন্সি প্রদত্ত আমন্ত্রণে যোগদান ও করণীয় শিষ্টাচার বিষয়ক নিয়ম-কানুন সংক্রান্ত বিষয়সমূহ।

৮. ***বিচার কার্য পরিচালনা:*** সংসদ সদস্য থাকাকালীন দেওয়ানি, ফৌজদারি বা অন্য যেকোনো আইনে বিচার কার্য পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়সমূহ।

৯. ***নৈতিক বা চারিত্রিক স্খলনজনিত:*** বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ।

১০. ***আচরণ বিধির লঙ্ঘন:*** এ প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় আইনী ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কিত।

৮.৪ উপসংহার

সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণ বিধি প্রণয়নের মাধ্যমে গণতন্ত্রের দুটি মৌলিক মূল্যবোধ – স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা – ভালভাবে নিশ্চিত করা যেতে পারে। সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণ বিধি সংসদের ভেতরে বা বাইরের প্রাত্যহিক কাজে উপযুক্ত বা যথার্থ আচরণের একটি দিক-নির্দেশনা দেয়। এটি সংসদ সদস্যের কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে নৈতিক ও দায়িত্বপূর্ণ আচরণের ভিত্তি তৈরি করে, যা লঙ্ঘনে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ থাকে। এছাড়াও এটি জনগণকে তাঁদের দ্বারা নির্বাচিত জন-প্রতিনিধিদের কাছ থেকে কী ধরনের আচরণ আশা করতে পারে সেই ব্যাপারে সচেতন করে, যা পরবর্তীতে জনগণের আস্থা অর্জনে সংসদ সদস্যদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের জনগণ আশা করে, রাজনৈতিক সদিচ্ছার মাধ্যমে পরবর্তী নির্বাচিত সরকার এবং বিরোধী দল সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণ বিধি প্রণয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সচেষ্ট হবেন এবং তা কার্যকর করার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটি গঠন করবেন।

অধ্যায় দশ
উপসংহার ও সুপারিশমালা

বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র খুব বেশি দিন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। স্বাধীনতা অর্জনের পর সুদীর্ঘ সময় সামরিক শাসন ব্যবস্থায় গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়নি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে সংসদীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। সংসদীয় গণতান্ত্রিক ধারাকে সমুন্নত রাখতে চালকের ভূমিকা পালন করেন সংসদ সদস্যরা। জাতীয় সংসদে সংসদ সদস্যবৃন্দ দেশের জন্য, জনগণের জন্য কথা বলা এবং কাজ করার মাধ্যমে সংসদের প্রভাব ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে গণতন্ত্রকে কার্যকর করবেন এটাই কাম্য। কিন্তু স্বাধীনতার দীর্ঘপথ পরিক্রমায় এখনো বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ভীত দৃঢ় হয়নি। এদেশের গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রার প্রধান অন্তরায় রাজনৈতিক শ্রেণীর গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের আত্মস্থীকরণ ও কার্যকরণে ব্যর্থতা। আর এই ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হিসেবে রাজনীতি বিশ্লেষকরা যোগ্য প্রার্থী মনোনয়নে রাজনৈতিক দলের এবং উপযুক্ত সংসদ সদস্য নির্বাচনে জনগণের ব্যর্থতাকে দায়ী করেছেন।

সংসদ সদস্যদের যোগ্যতা হিসেবে দেশপ্রেম, সততা, স্বচ্ছতা, জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা, দূরদর্শিতা, অসাম্প্রদায়িকতা এবং দেশকে ও দেশের মানুষকে নির্মোহভাবে সেবা করার মানসিকতাকে অধিকাংশ জনগণ চিহ্নিত করেছেন। আবার সংসদ সদস্যদের সংসদীয় শিষ্টাচার, আইন প্রণয়ন এবং দেশে ও বিদেশে রোল মডেল হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করতে সংসদ সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন রয়েছে বলে অনেক অংশগ্রহণকারীই মনে করে। সংসদ সদস্যরা যে কোন পেশা থেকেই আসতে পারেন তবে তাঁরা সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণের পর সংসদে ও জনগণের পাশে সর্বদা থাকবেন এবং পেশাগত কারণে সরকারের সাথে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হবেন না। বাংলাদেশের যে কোন সংসদীয় এলাকা থেকে একজন জন-সম্পৃক্ত ব্যক্তি প্রার্থী হতে পারেন, তবে একজন প্রার্থীর একাধিক আসন থেকে নির্বাচন করার বিষয়টিকে তারা সমর্থন করেননি। এর মাধ্যমে অযোগ্য প্রার্থীর নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয় বলে তারা মনে করেন।

সংসদ সদস্যরা জনগণ ও সংসদের কাছে দায়বদ্ধ। এর জন্য তাঁদের ব্যক্তিগত ও আর্থিক বিষয় সম্পর্কিত সমস্ত তথ্যে জনগণ প্রবেশাধিকার চায়। নির্বাচনের পূর্বে একজন প্রার্থীর ব্যক্তিগত আটটি তথ্য প্রকাশ সম্পর্কে হাইকোর্টের আদেশকে সমর্থন করার সাথে সাথে সংসদ সদস্যদের ব্যক্তিগত আর্থিক তথ্যাদি বাৎসরিক ভিত্তিতে প্রকাশের দাবী করেছেন। সংসদ সদস্যদের পারিশ্রমিক ও ভাতাদি তাঁদের সামাজিক অবস্থান ও জীবন যাত্রার মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করতে হবে। এ বিষয়ক সমস্ত তথ্যাদি জনগণকে অবগত করতে হবে। তাঁদের প্রদত্ত তথ্য ভুল বা অতিরঞ্জিত প্রমাণিত হলে শাস্তির ব্যবস্থা থাকার কথাও জনগণের কথায় উঠে এসেছে। সংসদীয় অধিবেশন চলার সময় সংসদে প্রত্যেকটি চ্যানেলের প্রবেশাধিকার এবং সংসদীয় ও স্থায়ী কমিটির কার্যবিধি জনগণের জন্য উন্মুক্ত থাকা উচিত। রাজনৈতিক দলগুলোর আয়-ব্যয়ের হিসাব, নির্বাচনী প্রচারণার ব্যয় ও ব্যয়ের উৎসসহ অন্যান্য সকল অর্থনৈতিক তথ্য জানার অধিকার রয়েছে জনগণের। দলের মধ্যে স্বচ্ছতার ক্ষেত্র তৈরি হলে দল মনোনীত সংসদ সদস্যদের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা যাবে।

সংসদ সদস্যদের প্রধান ভূমিকা আইন প্রণয়ন করা। জনপ্রতিনিধি হিসেবে নিজ সংসদীয় আসনের জনগণের কাছেও তার একটি দায়বদ্ধতা রয়েছে। কিন্তু সংসদ সদস্যরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের এখতিয়ার বহির্ভূত দায়িত্ব পালন করেন। এ সম্পর্কে তাঁদের অনেকের মধ্যে যেমন অস্পষ্টতা রয়েছে, তেমনি অনেকে নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত হয়েও এলাকার মানুষের চাহিদার প্রেক্ষিতে এখতিয়ার বহির্ভূত কাজ করে থাকেন। ব্যক্তিগত বা এলাকার উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে সংসদ সদস্যর সাথে জনগণের যোগাযোগ করার সংস্কৃতি আমাদের দেশে গড়ে উঠেছে। এ থেকে বের হয়ে আসতে সংসদ সদস্যদের এগিয়ে এসে একদিকে জনগণকে সংসদ সদস্যদের মুখ্য ভূমিকা সম্পর্কে অবগত করতে হবে অন্যদিকে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করণের মাধ্যমে স্থানীয় উন্নয়নে তাদের ভূমিকা বৃদ্ধি করতে হবে। সংসদ সদস্যদের সংসদের ভেতরে ও বাইরে যথাযথ ভূমিকা পালনের জন্য ও জন প্রতিনিধি হিসেবে জনগণের রোল মডেল হতে গেলে একটি আচরণ বিধি প্রয়োজন। সংসদ সদস্য আচরণ বিধি লঙ্ঘন করলে সংসদীয় নৈতিকতা কমিটি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সংসদ সদস্যরা সংসদ অধিবেশন এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাজের বাইরে এলাকায় অবস্থান করে এলাকার সমস্যা এবং উন্নয়ন কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে অবগত হবেন কিন্তু কোনক্রমেই স্থানীয় সরকারের কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না।

জনগণ প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতায়িত করে সংসদ সদস্যদের সংসদে পাঠান দেশের স্বার্থে আইন প্রণয়ন এবং এলাকার বা জনগণের সমস্যা সংসদে তুলে ধরতে। তাই সরকারি ও বিরোধী দলীয় নেতা সহ সংসদ সদস্যরা শারীরিক অসুস্থতা বা রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছাড়া সংসদে অনুপস্থিত থাকবেন না বলে জনগণ প্রত্যাশা করেন। সংসদ সদস্যদের ৮৯ কার্যদিবস অনুপস্থিত

থাকার সুযোগটিকে কেউ সমর্থন করেননি। এটিকে কমিয়ে ১৫ থেকে ২০ করার জোরালো দাবী ওঠে। সংসদ চলাকালীন কোন সংসদ সদস্য স্পিকারের অনুমতি না নিয়ে অনুপস্থিত থাকেন তবে অনুপস্থিতির দিনগুলোর জন্য আনুপাতিকহারে পারিশ্রমিক ও ভাতাদি কর্তনের দাবী ওঠে। সংসদ সদস্যরা জনগণের কাছে এবং দেশের কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন দলীয় ও ব্যক্তিগত ইজতেহার এর মাধ্যমে। কিন্তু পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকা কালীন তাঁদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে মাঝামাঝি সময়ে একটি মূল্যায়ন ব্যবস্থা থাকা উচিত যার মাধ্যমে তাঁদের প্রত্যাহার করা যেতে পারে। আমাদের সংসদীয় ব্যবস্থায় আত্মসমালোচনার পথটি অনেকটা সংকুচিত হয়ে গেছে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে। তাই দলের প্রতি অনাস্থা, বাজেট সংক্রান্ত বিল পাস ছাড়া অন্যান্য জন-সম্পৃক্ত বিষয়ে নিজ দলের বিরুদ্ধে মতামত দেওয়ার প্রক্রিয়া চালু করতে ৭০ অনুচ্ছেদের সংশোধন আবশ্যক।

বাংলাদেশের জনগণ আগামীতে একটি কার্যকর সংসদ দেখতে চায় যেখানে সংসদ সদস্যরা সংসদীয় আচরণ ও শিষ্টাচার মেনে চলবেন এবং স্পিকার নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করবেন। সরকারি ও বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যরা সংসদ অধিবেশনে গঠনমূলক ও প্রাসঙ্গিক আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একমত হবেন। তাঁরা একে অপরের প্রতি পারস্পরিক সম্মানবোধ বজায় রাখবেন। সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে প্রায় অর্ধেকের বেশি স্থায়ী কমিটির (পাবলিক একাউন্টস কমিটিসহ) সভাপতির পদ বিরোধী দল থেকে হওয়া উচিত। এছাড়া ডেপুটি স্পিকারের পদটিও বিরোধী দল থেকে হওয়া উচিত বলে জনগণের মত পাওয়া যায়। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জনগণকে সর্ব কাজে সম্পৃক্ত করা হয়ে থাকে। এ কারণে সংবিধানের সংশোধন ও জন-গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইন প্রণয়নে জনগণের মতামত নিতে হবে। আইনের খসড়া ওয়েবসাইটে ও পত্রিকায় প্রকাশ করে, সভার মাধ্যমে জনমতামত নেওয়া উচিত। জনগণ সরকারি ও বিরোধী দলের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক দেখতে চায়। তাঁদের মধ্যে অবশ্যই মতাদর্শগত পার্থক্য থাকবে। দেশের অর্থনীতির স্বার্থে, জাতীয় স্বার্থে একে অপরের গঠনমূলক সমালোচনা করবে, এর জন্য তাঁরা আন্দোলন করবে, প্রতিবাদ জানাবে। কিন্তু জান-মালের ক্ষতি না করে সংসদীয় রীতি অনুযায়ী প্রতিবাদ করার প্রতি জনগণ জোরালো দাবী জানান। সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব ও নারীদের যথাযথ ভূমিকা পালনের স্বার্থে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের দাবী ওঠে। অন্যান্য সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর যেমন, ধর্মীয় সংখ্যা লঘু, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী ও আদিবাসী, প্রতিবন্ধী অধিকার সংরক্ষণে রাজনৈতি দলগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে। এ সম্পর্কিত বিষয় দেখার জন্য প্রতিটি দলে পদ তৈরি করতে হবে, সংসদে স্থায়ী কমিটি গঠিত করতে হবে, এবং আইন পর্যালোচনা পরিষদে বিশেষজ্ঞের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

সংসদীয় গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা মুখ্য। এজন্য রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ অপরিহার্য। দলের নিয়মিত সভা-সমাবেশ এবং জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠান, নির্বাচন কমিশনের সাথে নিবন্ধন, বিরোধী দলের প্রতি সহযোগিতামূলক মনোভাব, পেশী শক্তি, সন্ত্রাসী, কালো টাকার মালিক, স্বাধীনতার চেতনার পরিপন্থীদের দলের সদস্যপদ বা নির্বাচনে মনোনয়ন না দেওয়া ইত্যাদি প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে মেনে চলতে হবে। শুধুমাত্র পারিবারিক বন্ধনের সুযোগে একজন ব্যক্তি দলের উচ্চতর পদে আসীন হতে পারে না বা জাতীয় নির্বাচনে দলের মনোনয়ন পেতে পারে না। দল মনোনয়ন প্রদানের সময় তৃণমূল পর্যায় থেকে উঠে আসা জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য প্রার্থীকে মনোনয়ন দেবে। সর্বোপরি প্রতিটি রাজনৈতিক দল তার নিজ নিজ গঠনতন্ত্র অনুসরণ করে রাজনীতির চর্চা করলে দেশে গণতন্ত্রের পথ সুগম হবে।

জাতীয় সংসদ ও সংসদ সদস্যদের ওপর নাগরিক সনদ প্রণয়নের এই প্রক্রিয়ায় ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ বেশ কিছু সুপারিশ প্রদান করছে যার সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে একটি কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা করা ও সংসদ সদস্যদের কাছে জনগণের প্রত্যাশার সঠিক প্রতিফলন সম্ভব।

তথ্য অধিকার

১. নির্বাচনের পূর্বে প্রার্থীদের ব্যক্তিগত আটটি তথ্য নির্বাচন কমিশনে জমাদান সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায়টি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
২. নির্বাচন কমিশন প্রার্থীদের ব্যক্তিগত তথ্যাদি যাচাই বাছাই করে তা জনগণের মাঝে প্রচার করবে। তবে কোনো ভুল তথ্য পাওয়া গেলে প্রার্থীর মনোনয়ন পত্র বাতিল করার ক্ষমতাও নির্বাচন কমিশনের থাকবে।
৩. সংসদ সদস্যরা প্রতি বছর তাঁদের আর্থিক স্বার্থ সংক্রান্ত ও ব্যক্তিগত তথ্যাদি নির্বাচন কমিশনে জমা দিবে। নির্বাচন কমিশন তা ওয়েব সাইটে বা বুকলেট আকারে জনগণের জন্য উন্মুক্ত করবে।
৪. সংসদ সদস্যদের সংসদে কার্যক্রমের বার্ষিক মূল্যায়ন প্রকাশ করতে হবে। এই কার্যক্রমের মধ্যে থাকবে তাদের উপস্থিতি, সংসদে অংশগ্রহণের ধরন, কমিটিতে অংশগ্রহণ, আইন প্রণয়নে ভূমিকা ইত্যাদি।
৫. সংসদ অধিবেশনে সকল সরকারি ও বেসরকারি গণমাধ্যমের প্রবেশাধিকার দিতে হবে।
৬. সংসদ অধিবেশন ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যবিবরণী লিখিত আকারে থাকতে হবে এবং তা জনগণের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে। তবে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে আলোচিত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাজনিত তথ্যাদি গোপনীয় তথ্য হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে।
৭. রাজনৈতিক দল প্রতি বছর তাদের আয়-ব্যয়ের হিসাব, তহবিলের উৎস এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশ করবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ এ সকল তথ্য যাচাই বাছাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৮. রাজনৈতিক দল তাদের নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যয়কৃত অর্থের উৎস ও ব্যয়ের খাত জনগণের সামনে প্রকাশ করবে। এ সম্পর্কে ভুল বা অতিরঞ্জিত তথ্য প্রকাশ করলে নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
৯. সংসদ সদস্যদের পারিতোষিক ও ভাতাদি সম্পর্কে জনগণকে বিস্তারিতভাবে অবগত করতে হবে। তাঁদের সামাজিক মর্যাদা ও জীবনযাত্রার মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রেখে পারিতোষিক ও ভাতাদি পাবেন। এক্ষেত্রে এমন কোন সুযোগ তাঁদের দেওয়া হবে না যার মাধ্যমে তার অপব্যবহার বা সরকারি অর্থের অপচয় হয়।

সংসদ সদস্যর ভূমিকা

১০. সংসদ সদস্যরা নিজেদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবেন এবং জনগণকেও অবহিত করবেন।
১১. জাতীয় নির্বাচনের প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচারণায় স্থানীয় সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের বিষয়াদি নিয়ে কোন প্রকার প্রতিশ্রুতি দিতে পারবেন না।
১২. সংসদ সদস্যরা আইন প্রণেতা ও নীতি নির্ধারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং স্থানীয় সরকারের উন্নয়নমূলক কাজে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করবেন না।
১৩. উপজেলা পরিষদ নির্বাচন করতে হবে এবং স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
১৪. সংসদ সদস্যদের একটি আচরণ-বিধি (কোড অব কনডাক্ট) প্রণয়ন করতে হবে এবং সঠিক ভাবে পালিত হচ্ছে কিনা তা সংসদীয় নৈতিকতা কমিটি তত্ত্বাবধান করবে।
১৫. সংসদে নৈতিকতার ওপর একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করতে হবে। এর দায়িত্ব হবে আচরণ বিধি লঙ্ঘন সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ করা, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত পরিচালনা করা এবং তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য স্পিকারকে পরামর্শ বা সুপারিশ প্রদান করা।
১৬. সংসদ সদস্যরা রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ বা শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণ ছাড়া সংসদের অনুমতি না নিয়ে অনুপস্থিত থাকা উচিত নয়। এ ক্ষেত্রে সংবিধানের ৬৭ (১) (খ) অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে, এবং সময়সীমা কমাতে হবে।
১৭. বছরভিত্তিক সর্বোচ্চ উপস্থিতির জন্য সংসদ সদস্যদের পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যদিকে, সংসদের অনুমতি না নিয়ে কোন বৈঠক দিবস অনুপস্থিত থাকলে সেই সকল দিনের জন্য সংসদ সদস্যর পারিশ্রমিক ও ভাতা আনুপাতিকভাবে কর্তন করতে হবে।
১৮. সংসদে গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা, আত্মসমালোচনা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সচেতনভাবে সংশোধন করতে হবে। এক্ষেত্রে দলের বিরুদ্ধে অনাস্থা ভোট প্রদান ও বাজেট সংক্রান্ত বিলের বিরোধিতা না করার বিষয়টি থাকা উচিত।
১৯. প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যর জনগণের সাথে যোগাযোগের জন্য একটি ব্যবস্থা থাকতে হবে। সংসদ অধিবেশন না চললে বা রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ না থাকলে তিনি স্থানীয় জনগণের সাথে যোগাযোগ রাখবেন।
২০. রাজনৈতিক দলের ইশতেহার বাস্তবায়নে সংসদ সদস্যদের সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হবে। তাঁরা বাৎসরিক ভিত্তিতে নিজ নিজ কাজের সাফল্য ও ব্যর্থতা এবং পেছনের কারণ জনসম্মুখে তুলে ধরবেন।
২১. সংসদ সদস্যদের মেয়াদের মাঝামাঝি সময়ে কাজ, দক্ষতা, সংসদে উপস্থিতি, জন-সম্পৃক্ততা, প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে উদ্যোগ ইত্যাদির ভিত্তিতে তাঁদের মূল্যায়ন করতে হবে। কোন সংসদ সদস্য জনগণের রায়ে ব্যর্থ হলে সে সংসদীয় আসনে পুনরায় নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।

কার্যকর সংসদ

২২. সরকারি ও বিরোধী দলের নেতাকে সংসদে নিয়মিত উপস্থিত থাকা নিশ্চিত করতে হবে।
২৩. সংসদের কার্যদিবস ও কার্যসময় বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে সংসদীয় অধিবেশন বিকেলের পরিবর্তে সকালে করতে হবে।
২৪. কোন সংসদ সদস্য স্পিকার হিসেবে নির্বাচিত হবার পর দলীয় পদ থেকে পদত্যাগ করবেন এবং পরবর্তী নির্বাচনে তাঁর সংসদীয় আসনে অন্য কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে না।
২৫. সংসদের ডেপুটি স্পিকারের পদটি বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের মধ্যে থেকে আসতে হবে।
২৬. সরকারি হিসাব সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি সহ গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী কমিটিগুলোর মধ্য থেকে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ কমিটিতে বিরোধী দলের মধ্য থেকে সভাপতি নির্বাচন করতে হবে।
২৭. জনগণ সংসদ বর্জনের রাজনীতি দেখতে চায় না। তাই লাগাতার সংসদ বয়কট বন্ধ করতে হবে।
২৮. সংবিধানের সংশোধন ও জন-গুরুত্বপূর্ণ কোনো আইন প্রণয়নের পূর্বে সেসকল আইনের খসড়ার ওপর সভা, গণভোট, এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনগণের মতামত নিতে হবে।
২৯. সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রতিবাদের ভাষা হল হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ। কিন্তু জান-মালের ক্ষতি করে এগুলো পালন করা যাবে না।
৩০. নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।
৩১. ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠী, আদিবাসী এবং প্রতিবন্ধীদের বিষয়সমূহ যথার্থভাবে মূল্যায়ন করতে সংসদে এ সংক্রান্ত বিষয়ে সংসদীয় বিশেষ কমিটি গঠন করতে হবে।

সংসদীয় গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

৩২. প্রতিটি দল তাঁদের কমিটির সদস্য হিসেবে এবং নির্বাচনে মনোনয়ন দেওয়ার সময় ৩৩ শতাংশ নারীকে নির্বাচিত করবেন।

৩৩. রাজনৈতিক দলগুলো ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, আদিবাসী এবং প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংরক্ষণে দলের কমিটি ব্যবস্থায় পদ তৈরি করবে।

৩৪. রাজনৈতিক দল নির্বাচন কমিশনের সাথে নিবন্ধিত হবে এবং নিবন্ধনের শর্তাদি মেনে চলবে।

৩৫. প্রতিটি দল নিজেদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পরিচালিত হবে। এক্ষেত্রে তৃণমূল পর্যায় থেকে রাজনীতির অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নেতৃত্ব তৈরি করতে হবে।

৩৬. দলের মধ্যে মতাদর্শগত বিরোধ থাকলেও জাতীয়, জনগণ ও গণতন্ত্রের স্বার্থে দলগুলোর মধ্যে সহনশীলতা, পারস্পরিক সম্মানবোধ এবং পরমত সহিষ্ণুতা গড়ে তুলতে হবে।

৩৭. স্থানীয় সরকারের নির্বাচনকে দলীয় নির্বাচনের বাইরে রাখতে রাজনৈতিক দলগুলো সক্রিয় উদ্যোগ নিবে।

৩৮. সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি তৈরি করতে রাজনৈতিক দলকে সৎ, জনগণ-সম্পৃক্ত, জনকল্যাণে নিয়োজিত, অসাম্প্রদায়িক, রাজনীতির অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন ব্যক্তিকে জাতীয় নির্বাচনের প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করা উচিত। অন্যদিকে বিল-ঋণখেলাপী, সন্ত্রাসী, কালো টাকার মালিক, যুদ্ধাপরাধীদের নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন দেওয়া হতে তাদের বিরত থাকতে হবে।

৩৯. রাজনৈতিক দলগুলো সংসদকে কার্যকর করতে এবং সংসদ সদস্যদের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে দলীয় ভাবে সক্রিয় ভূমিকা রাখবে। এছাড়া দেশের সাংবিধানিক ও জাতীয় সততা ব্যবস্থার অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানসমূহের যেমন, নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, সরকারি কর্ম কমিশন, বিচার বিভাগ, আইন কমিশন, পুলিশ বিভাগ স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রেখে তাদের শক্তিশালী করণে ভূমিকা রাখবে। এর মাধ্যমে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা পাবে। ফলে সংসদ সদস্যদের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বাড়বে।

গ্রন্থ-সহায়িকা

Ahmed, Nizam, *Limits of Parliamentary Control: Public Spending in Bangladesh*, The University Press Limited, 2006.

Alamgir, Fahreen *et al*, *Corruption and Parliamentary Oversight: Primacy of the Political Will*, Transparency International Bangladesh, 2007.

Ashraf, Prof. Md. Ali, *Ethical Standards of Parliamentarians*, Bangladesh Institute of Parliamentary Studies, Dhaka, October 2001

Besley, Timothy and Valentino Larcinese, *Working or Shirking? A Closer Look at MPs' Expenses and Parliamentary Attendance*, August 2005.

Chanda, A W, *Disclosure Laws in Zambia,* Position Paper, Transparency International Zambia, 2005.

Choudhury, Jamshed S A, *Bangladesh: Failure of a Parliamentary Government 1973-75,* Pathak Shamabesh, 2004.

Chowdhury, Justice A. T. M. Masud, *Reminiscence of Few Decades and Problems of Democracy in Bangladesh*, Academic Press and Publishers Library, Dhaka, 2005.

Hassanuzzaman, Al Masud, *Role of opposition in Bangladesh politics*, The University Press Limited, 1998.

Keefer, Philip and Razvan Vlaicu, *Democracy, Credibility and Clientelism*, Development Research Group, The World Bank, Policy Research Working Paper 3472.

Khemani, Stuti, *Decentralization and Accountability: Are Voters More Vigilant in Local than National Elections?*, Policy Research Working Paper 2557, Development Research Group, The World Bank, 2001.

Kish, L., *'A procedure for objective respondent selection within the household'*, Journal of the American Statistical Associatio*n*, 1949, p. 380-387;

Kish, L., *Survey Sampling*, John Wiley and Sons Inc., New York, 1965.

Laver, Michael and Kenneth A. Shepsle (ed.), *Cabinet Ministers and Parliamentary Government*, Cambridge University Press, New York, 1994.

Loffler, Elke *et al, Improving Customer Orientation through Service Charters*, OECD/ Ministry of Interior of the Czech Republic/Governance International, 2007, p 16.

McLean, Ian and Alistair McMillan (ed), *The Concise Dictionary of Politics*, New Delhi, Oxford University Press, 2006.

Mollah, Md. Awal Hossain (undated), *Good Governance in Bangladesh: Role of Parliament*, Dept of Public Administration, University of Rajshahi.

Murray, Senator Lowell, *'MPs, Political Parties and Parliamentary Democracy'*, isuma, Volume 1 N 2, Autumn 2000.

Norris, Pippa, *Are Australian MPs in Touch with Constituents?*, Australian Democratic Audit, January 2004.

Paul, Samuel and M Vivekananda, *Holding a Mirror to the New Lok Sabha*, Public Affairs Centre (PAC), 2004.

Rahman, Md. Saidur, *Law on Election*, Mrs. Mohfuza Rahman, 2001.

Reynolds, Andrew *et al*, *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Stockholm, Sweden, 2005, pp. 35-44.

Stapenhurst, Rick and Riccardo Pelizzo, 'Legislative Ethics and Codes of Conduct', in *The Role of Parliament in Curbing Corruption*, Rick Stapenhurst, Niall Johnston and Riccardo Pelizzo (ed.), World Bank Institute, Washington, 2006.

The Institute on Governance (undated), *The Exercise of Power: A Round Table Series on Accountability*.

Weinstock, Daniel, '*A Professional Ethics for Politicians*', Canadian Federation for the Humanities and Social Sciences, Ottawa, October 2002.

Zappala, Gianni, 'The micro-politics of immigration: service responsiveness in an Australian 'ethnic electorate', *Ethnic and Racial Studies*, 1998, cited in Pippa Norris, *Are Australian MPs in Touch with Constituents?*, Australian Democratic Audit, January 2004.

http:/en,wikipedia.org/wiki/unicameralism.

http:/en,wikipedia.org/wiki/bicameralism.

http://www.parlcent.ca/index_e.php for 'Parliamentary Performance'

www.u4.no for Anti-Corruption Resource Centre, 'Political Corruption'

www.gfn-ssr.org/good_practice.cfm for Compendium of Good Practices on Security Sector Reform, The Issue of Transparency.

www.corisweb.org/article/articlestatic/473/1/320/ for 'Parliamentary Ethics and Accountability'.

www.gfn-ssr.org/good_practice.cfm for 'Accountability: Idea, Ideals, Constraints', cited in *Developing Oversight Mechanisms: The Issue of Accountability*, Compendium of Good Practices on Security Sector Reform.

http://goicharters.nic.in/cchandbook.htm for DARPG, Citizen's Charter – A Handbook, New Delhi, India, 26 August 2008.

www.adamsmith.org/80ideas/idea/53.htm for Adam Smith Institute, 'Public Administration 53, Citizen's Charter: Consumer rights for public-services users', *Around the world in 80 Ideas*, London, 26 August 2008.

http://archive.cabinetoffice.gov.uk/servicefirst for Cabinet Office of UK: "How to draw up a local charter".

www.archive.official-documents.co.uk/document/parlment/nolan/nolan.htm.

www.corisweb.org/ for 'Codes of Conduct for Parliamentarians'.

www.ipu.org

http:\\rajyasabha.gov.in/code.htm for Rajya Sabha Secretariat, Code of Conduct for Members of Rajya Sabha, New Delhi, 2005.

www.corisweb.org for 'Codes of Conduct for Parliamentarians'.

আরিফ হোসেন খান, *'নাগরিক সনদ: কি, কেন ও কিভাবে'*, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এবং ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০০৮।

আল মাসুদ হাসান উজ্জামান, 'বাংলাদেশে কমিটি ব্যবস্থা', মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর (সম্পাদিত), *গণতন্ত্র*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ১৬৫-১৭৩।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ২০০১।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি, ২০০১।

জালাল ফিরোজ, *পার্লামেন্ট কিভাবে কাজ করে: বাংলদেশের অভিজ্ঞতা*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১০৯-১১১।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, *সংসদ নির্দেশিকা এবং স্পিকার-সাংসদ-জনগণ,* ২০০০।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, *পার্লামেন্ট ওয়াচ* সিরিজ প্রতিবেদন, ২০০২-২০০৬।

তানভীর মাহমুদ, *গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে অষ্টম জাতীয় সংসদ (২০০১-২০০৬),* ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০০৭।

ফজলুল করিম, *সংসদ রিপোর্টিং,* বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ২০০৩।

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর (সম্পাদিত), *গণতন্ত্র*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬।

মো. আলী আকবর, *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ওয়াকআউট ও বয়কট*, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ঢাকা।

মো. আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন*, আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৪২৭।

রাকিবা ইয়াসমিন, *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র ও কমিটি ব্যবস্থা: ১৯৭২-১৯৯৬,* উত্তরণ, ২০০৭।

শাহজাদা আকরাম ও সাধন কুমার দাস, *বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন: একটি ডায়াগনস্টিক প্রতিবেদন*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০০৬।

শাহজাদা আকরাম ও সাধন কুমার দাস, *নির্বাচনী ব্যয় পর্যালোচনা: স্থগিত নবম সংসদ নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের দিন পর্যন্ত প্রার্থীদের নির্বাচনী বিধি লজ্ঞনের ওপর একটি বিশ্লেষণ*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০০৭।

হারুনুর রশীদ, *রাজনীতিকোষ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯।

পরিশিষ্ট ১ ক: জরিপে অন্তর্ভুক্ত জেলা

বিভাগ	*জেলা*		*মোট*
	সনাক এলাকা	*সনাক এলাকার বাইরে*	
রাজশাহী	রাজশাহী, নাটোর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, রংপুর, কুড়িগ্রাম	নওগাঁ, পঞ্চগড়	৭
ঢাকা	ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, গাজীপুর, ফরিদপুর, মাদারীপুর	ঢাকা (৩টি আসন), মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ	১০
খুলনা	যশোর, খুলনা	নড়াইল	৩
বরিশাল	বরিশাল, ঝালকাঠি	পটুয়াখালি	৩
সিলেট	সিলেট, মৌলভীবাজার	হবিগঞ্জ	৩
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, কুমিল্লা, চাঁদপুর	রাঙ্গামাটি, নোয়াখালি	৬
মোট	১৯টি জেলা (১৯টি আসন)	১০টি জেলা (১৩টি আসন)	৩২

পরিশিষ্ট ১ খ: জরিপে অন্তর্ভুক্ত এলাকা

আসন নং	*আসনের নাম*	*উপজেলা*	*এলাকার ধরন*	*বাছাইকৃত ওয়ার্ড / ইউনিয়ন*	*বাছাইকৃত গ্রাম / মহল্লা*
২	পঞ্চগড় ২	দেবীগঞ্জ	পল্লী	দ্বন্দ্বপাল	এনায়েতপুর, পামুলি
২২	রংপুর ৩	পীরগাছা	পল্লী	পারুল	সৈয়দপুর, জগৎপুর
২৬	কুড়িগ্রাম ২	পৌরসভা, সদর উপজেলা	পৌর	১ নং ওয়ার্ড	বিষ্ণুপাড়া, বেপারিপাড়া
৪৪	চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২	নাচোল	পল্লী	নাচোল	হাজীডাঙ্গা, নাচোল
৪৭	নওগাঁ ২	পত্নীতলা	পল্লী	নির্মল	ফুকুন্দা, গোবিন্দবালি
৫৩	রাজশাহী ২	বোয়ালিয়া	পৌর	১২ নং ওয়ার্ড	কুমারপাড়া, কাদিরগঞ্জ
৫৯	নাটোর ৩	সিংড়া	পল্লী	ইটালি	পশ্চিম মাগুরা, পূর্ব মাগুরা
৮৭	যশোর ৩	পৌরসভা, সদর উপজেলা	পৌর	১ নং ওয়ার্ড	জেলখানা এলাকা, কাপুরিয়াপট্টি
৯৩	নড়াইল ১	কালিয়া	পল্লী	জয়নগর	জয়নগর, দেবদুন
১০০	খুলনা ২	খুলনা মেট্রোপলিটান থানা	পৌর	৫ নং ওয়ার্ড	মুন্সিপাড়া, পশ্চিম পুলিশলাইন
১১৬	পটুয়াখালি ৪	কলাপাড়া	পল্লী	নীলগঞ্জ	পূর্ব হাজীপুর, পশ্চিম হাজীপুর
১২৫	বরিশাল ৫	বরিশাল মেট্রোপলিটান থানা	পৌর	৫ নং ওয়ার্ড	উত্তর আলেকান্দা, দক্ষিণ আলেকান্দা
১২৭	ঝালকাঠি ১	রাজাপুর	পল্লী	মঠবাড়ি	উত্তর সাউথপুর, দক্ষিণ সাউথপুর
১৫২	ময়মনসিংহ ৪	পৌরসভা, সদর উপজেলা	পৌর	১ নং ওয়ার্ড	হামিদউদ্দিন রোড, পুলিশলাইন
১৬৬	কিশোরগঞ্জ ২	কটিয়াদি	পল্লী	বনগ্রাম	নওয়াপাড়া, কুড়িয়াপাড়া
১৭৩	মানিকগঞ্জ ২	শিবালয়	পল্লী	মহাদেবপুর	বারোঙ্গাইল, মসুড়া
১৮৬	ঢাকা ৭	কোতয়ালী থানা	পৌর	৭১ নং ওয়ার্ড	নওয়াবপুর রোড, আনন্দমোহন বসাক লেন
১৮৮	ঢাকা ৯	ধানমন্ডি	পৌর	৪৯ নং ওয়ার্ড	ধানমন্ডি আ/এ, হাতেমবাগ
১৯১	ঢাকা ১২	সাভার	পল্লী	ধামসুনা	মধুপুর, শ্রীপুর
১৯৩	গাজীপুর ১	শ্রীপুর	পল্লী	রাজাবাড়ি	বিরইমাতি, নিশ্চিন্তপুর
২০৩	নারায়ণগঞ্জ ২	আড়াইহাজার	পল্লী	মাহমুদপুর	কল্যাণদি উত্তরপাড়া, রঘুনাথপুর
২১১	ফরিদপুর ৩	পৌরসভা, সদর উপজেলা	পৌর	২ নং ওয়ার্ড	উত্তর কালিবাড়ি, দক্ষিণ কালিবাড়ি
২১৭	মাদারীপুর ১	শিবচর	পল্লী	দ্বিতীয়খন্ড	নিয়ামতকান্দি, হাওলাদারকান্দি
২২৮	সিলেট ১	সিলেট মেট্রোপলিটান থানা	পৌর	২ নং ওয়ার্ড	লালদিঘির পাড়, সওদাগরপাড়া
২৩৫	মৌলভীবাজার ২	কুলাউড়া	পল্লী	কাদিরপুর	গোবিন্দপুর, লক্ষীপুর
২৩৯	হবিগঞ্জ ২	আজমীরিগঞ্জ	পল্লী	বাদলপুর	কাটাখালী, বাদলপুর
২৫৫	কুমিল্লা ৮	পৌরসভা, সদর উপজেলা	পৌর	২ নং ওয়ার্ড	চকবাজার, গঙ্গাচর
২৬৪	চাঁদপুর ৫	শাহরাস্তি	পল্লী	তামতা	বলশিদ উত্তর, বলশিদ দক্ষিণ
২৭১	নোয়াখালি ৩	চাটখালি	পল্লী	পাঁচগাঁও	বরইপাড়া, হোসেনপুর
২৮৭	চট্টগ্রাম ৯	চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটান থানা	পৌর	১১ নং ওয়ার্ড	খুলশী, নাসিরাবাদ
২৯৪	কক্সবাজার ১	পৌরসভা, চকরিয়া সদর	পৌর	বদরখালী (৩)	ওয়াপদা কলোনী, কুতুবদিয়াপাড়া
২৯৯	রাঙ্গামাটি	কাপ্তাই	পল্লী	চন্দ্রঘোনা	নয়াপাড়া, এঞ্জিনিয়ারিং কলোনি

পরিশিষ্ট ২: জরিপে অংশগ্রহণকারীদের আর্থ-সামাজিক তথ্য

জরিপে অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতার বয়স

বয়স (বছর)	*উত্তরদাতার সংখ্যা*	*শতকরা হার*
১৮-২৭	৮৯৯	২৮.১
২৮-৩৭	৮০৮	২৫.৩
৩৮-৪৭	৬৫৯	২০.৬
৪৮-৫৭	৪২০	১৩.১
৫৮-৬৭	২৪৫	৭.৭
৬৮-৭৭	১২২	৩.৮
৭৮-৮৭	৩৮	১.২
৮৮ ও তদূর্ধ্ব	৯	০.৩
মোট	৩২০০	১০০.০

উত্তরদাতার বৈবাহিক অবস্থা

বৈবাহিক অবস্থা	*সংখ্যা*	*শতকরা হার*
অবিবাহিত	৪৬৭	১৪.৬
বিবাহিত	২৫৭০	৮০.৩
তালাকপ্রাপ্ত	১২	০.৪
বিধবা/বিপত্নীক	১৫১	৪.৭
মোট	***৩২০০***	***১০০.০***

উত্তরদাতার শিক্ষার মেয়াদ (বছর অনুযায়ী)

শিক্ষার মেয়াদ (বছর অনুযায়ী)	*সংখ্যা*	*শতকরা হার*
১-৫	৫৪৯	১৭.২
৬-১০	৯৩১	২৯.১
১১-১৫	৫২৫	১৬.৪
১৫ ও তদূর্ধ্ব	১০৬	৩.৩
নিরক্ষর	৪৫১	১৪.১
সাক্ষর	৬৩৮	১৯.৯
মোট	***৩২০০***	***১০০.০***

উত্তরদাতার পেশা

পেশা	*সংখ্যা*	*শতকরা হার*
গৃহকর্ম	১১৯২	৩৭.৩
কৃষক	৪৫৩	১৪.২
ব্যবসায়ী	৩৬৯	১১.৫
শ্রমিক	২১৮	৬.৮
বেসরকারি চাকরি	১৯৪	৬.১
ছাত্র	১৮৩	৫.৭
সরকারি চাকরি	১২৯	৪.০
আত্মকর্মজীবী	৯৫	৩.০
অবসরপ্রাপ্ত	৯৪	২.৯
দিনমজুর	৭৯	২.৫
বেকার	৭২	২.৩
শিক্ষক	৫৯	১.৮
চিকিৎসক	১৪	০.৪
তাঁতি	১০	০.৩
জেলে	৭	০.২

পেশা	*সংখ্যা*	*শতকরা হার*
আইনজীবী	৬	০.২
ইমামতি	৫	০.২
প্রকৌশলী	২	০.১
সাংবাদিক	১	০.০
অন্যান্য	১৮	০.৬
মোট	৩২০০	১০০.০

উত্তরদাতার আয়

আয়ের বিন্যাস (টাকা)	*উত্তরদাতার সংখ্যা*	*শতকরা হার*	*ক্রমবর্ধিষ্ণু শতকরা হার*
=<২০০০	৩২৮	২০.১	২০.১
২০০১-৪০০০	৫৬০	৩৪.৩	৫৪.৪
৪০০১-৬০০০	৩৪৩	২১.০	৭৫.৫
৬০০১-৮০০০	১১৪	৭.০	৮২.৫
৮০০১-১০০০০	১২৭	৭.৮	৯০.৩
১০০০১ ও তদূর্ধ্ব	১৫৯	৯.৭	১০০.০
মোট	১৬৩১	১০০.০	

পরিশিষ্ট ৩: ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি)

এফজিডি'র সংখ্যা, এফজিডিতে অংশগ্রহণকারীদের পেশা এবং পেশাভিত্তিক অংশগ্রহণকারী

অংশগ্রহণকারী দল	*এফজিডি'র সংখ্যা*	*অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা*
ব্যবসায়ী	৪	৫৫
আদিবাসী	৩	৪৩
শ্রমজীবী	২	২৮
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী	২	২৫
সাংবাদিক	২	২৯
এনজিও প্রতিনিধি	২	৩৬
ছাত্র/ছাত্রী	২	২৪
শিক্ষক	২	২২
কৃষক	২	২৭
প্রান্তিক জনগোষ্ঠী	১	১০
গৃহিণী	১	১৩
মোট	২৩	৩১২

এফজিডিতে অংশগ্রহণকারীদের বয়স

বয়স (বছর)	*অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা*
১৫-২৫	৫৬
২৫-৩৫	৭২
৩৫-৪৫	৮৭
৪৫-৫৫	৫৭
৫৫-৬৫	২৩
৬৫-৭৫	১
মোট	২৯৬*

***** ৩১২ জনের মধ্যে ২৯৬ জন অংশগ্রহণকারীর বয়স পাওয়া গেছে।***

এফজিডিতে অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	*অংশগ্রহণকারী সংখ্যা*
মাস্টার্স	৬৮
স্নাতক	৬৯
এইচ.এস.সি.	৪২
এস.এস.সি.	২৮
৫মশ্রেণী	২৭
সাক্ষর	২৪
নিরক্ষর	১১
মোট	২৬৯*

***** ৩১২ জনের মধ্যে ২৬৯ জন অংশগ্রহণকারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা পাওয়া গেছে।***

পরিশিষ্ট ৪: মুখ্য তথ্যদাতার পরিচিতি

Sl no	Name	Designation	Address	Phone
Academician and Researcher				
1.	Dr. Dalem Chandra Barman	Professor	Dept of Peace and Conflict, University of Dhaka	8618269(Res), 01552-334300
2.	Professor Nazrul Islam	Chairman, UGC	Sher-E-Bangla Nagar, Dhaka-1207	8112629 (Off), 8611509, 8652993 (Res), 01713002886, 8122948 (Fax), E-mail: chairmanugc@yahoo.com
3.	Professor Taiabur Rahman	Chairman	Development Studies, University of Dhaka, Dhaka	966192073, 01817590525 Ext.-6520
4.	Dr. Nazmul Ahsan Kalimullah	Chairman, Jatiya Nirbachon Parjobekkhon Parishad -JANIPOP	Lily Arcade (3rd Floor), 74 Laboratory Road, Dhanmondi, Dhaka-1205./Elephant Road (Near Coffee House) (3rd Floor) Chairman, Dept. of Public Administration, University of Dhaka.	8126172 (Res), 9661920-73/6661, 8625771 (Off), 01711531652, Fax-8143788, E-mail: janipop1@yahoo.com
5.	Professor Mustafizur Rahman	Executive Director, Centre for Policy Dialogue (CPD)	House 40/C, Road 11 (New), Dhanmondi R/A, Dhaka-1207	8124770, 9141734
6.	Syed Ziauddin Ahmed	Director- Resource Planning (PPRC)	House 77A, Road 12A, Dhanmondi R/A, Dhaka-1209	8119207, 9146618, 9662500 (Off), 01711824586, 01552351317
7.	Dr. Sadeka Halim	Professor	Dept. of Sociology, University of Dhaka, Arts Building (Ground Floor)	9661920 Ext-6594 (off), 8129986 (Res), 8615583 (Fax), 01711538560 E-mail: sadeka@bangla.net.
Politician (from all major political parties)				
8.	G M Quader	Jatiya Party (Ershad)	H-9/A, Road-33, Sector-7, Uttara, Dhaka.	8913881, 8916355 01711546946
9.	Col. (Retd.) Faruk Khan	Bangladesh Awami League	15/C, R-2, Dhaka Senanibash Abashik Elaka, Dhaka.	9130845 (Off), 01713-001764
10.	Suranjit Sengupta	Bangladesh Awami League	46/3, Zigatola, Dhaka. Contact Person: PS Faruk Bhai	01819-221691(Personal No), 01711-890202(PS Faruk)
11.	Barrister Abdur Razzaq	Jamaat-E-Islami	City Heart (7th Floor), Suite No-8/8, 67,Nayapaltan, Dhaka-1000.	01819-214855(Personal No), 01712-020233(PS Kawser)
12.	Advocate Akter Hamid Siddiqui	Deputy Speaker	Bangladesh Parliament, Sher-E-Bangla Nagar, Dhaka-1207	8111500 (Off), 9141000, 9343066 (Res), Fax-9130635

Sl no	Name	Designation	Address	Phone
13.	Advocate Abdul Hamid	Former Deputy Speaker	NAM Bhabhan, Building NO-4 (2nd Floor), Flat No-101. OR, Chamber: Annex Building, Room No.-110	8111598, 8158711(Off), 9131100- Ext.-3112 (Off), 8154930 (Res) 8154930, 01711-523030
14.	Asaduzzaman Noor	Former MP, Nilphamari	No-4, Naoratan Coloni, New Baily Road, Dhaka.	02 8316769(res), 01711565025
15.	Dr. Col. (Retd.) Oli Ahmed, Bir Bikram	Former Minister, Liberal Democratic Party (LDP)	House 102, Park Road, New DOHS, Mohakhali, Dhaka-1206.	8828866, 8812690 (Res)
16.	Feroj Rashid	Presidium Member, Jatiya Party (Ershad)	House 73/E, Road 17/A, Banani, Dhaka. Or, 9/F Motijhel, Dhaka Stock Exchange Building, Room No-503.	01711522357, 9884177, 9127499, 8122721
17.	Qader Siddiqui	President, Bangladesh Krishak Sramik Janata League	20/30 Babar Road, Mohammadpur, Dhaka-1207	8114393, 8114761, 01817613737
18.	Jahiruddin Swapan	BNP	House 33, Road 5, Dhanmandi, Dhaka-1205	01713009797, 8610860 (Res), 9661986, Fax-9668834, zahir15@gmail.com
19.	Saber Hossain Chowdhury			01711-523403
20.	Hafiz Uddin Ahmed BB	Former Minister Water Resources and Commerce Ministry	House K-21, Raod 27, Banani, Dhaka- 1213	9894097 hafiz4a@yahoo.com
Political Analyst				
21.	Professor Salahuddin M Aminuzzaman	Professor	Dept. of Development Studies, University of Dhaka	8314495 (Res), 01711-533898
22.	Professor Dilara Chowdhury	Professor	Dept. of Government and Politics, Jahangirnagar University Water Side Plaza, Apart.-A2, Block-A, H-28, R-13/A, Dhanmondi, R/A, Dhaka	01552405507, 8119499
23.	Dr. Shahdeen Malik	Professor BRAC University	H-27,R-13A (1ST floor) Dhanmondi R/A, Dhaka-1209	8141912 (chamber), E-mail: smalik@aitlbd.net
24.	Rubaiyat Ferdous	Assistant Professor	Dept of Mass Communication and Journalism, University of Dhaka, Dhaka 1000	9674711, 01711616972
25.	Dr. Mohabbot Khan	Professor	Department of Public Administration, University of Dhaka	8611411 (Res) 01914818159

Sl no	Name	Designation	Address	Phone
26.	Dr. Al Masud Hasanuzzaman	Professor Government and Politics, JU	House 24, Road 4, Block A, Section 2, Mirpur, Dhaka 1216	0155-2454559
Representative of Civil Society				
27.	Professor Muzaffar Ahmed	Chairman, Board of Trustees, TIB	Dhanmondi	8112022
28.	Dr. Badiul Alam Majumdar	Member Secretary of SUJAN and Global Vice-President & Country Director, The Hunger Project	3/7 Asad Avenue, Mohammadpur, Dhaka-1207	8112622, 8127975(Off), 01711-52662(Personal No)
29.	Hafizuddin Khan	President, NGO Foundation	53, Mohakhali, (4th Floor), Dhaka.	9880230, 01713002111
30.	Taleya Rehman	Executive Director, Democracy Watch	7 Circuit House Road, Ramna, Dhaka-1000	9330405, 8322440 (Res), 9360588-9, 93344225-6 (Off), 01713014898
31.	Shaheen Anam	Executive Director, Manusher Jonno	House 122, Road 1, Block-A, Banani Model Town, Dhaka-1213	8824309, 88111614 Fax-8810162
32.	Borhanuddin Ahmed	Executive Director, FEMA	House -1/11, Iqbal Road (2nd Floor), Block-A, Mohammadpur, Dhaka.	9140302, 01199115986
33.	Barrister Tanzibul Alam	Kamal Hossain adn Associates	Metropolitan Chamber Building (2rd Floor), 122, 124 Motijheel, Dhaka.	01711-593851, 9564954, 9560655, 9552946, Fax-9564953, E-mail: tanjib.alam@gmail.com
34.	Barrister Manzur Hasan	Executive Director	Institute of Governance Studies (IGS), 40/6, North Avenue, Gulshan-2 Dhaka 1212, Bangladesh	881 0306, 881 0320, 881 0326, 01199 810 380, 883 2542 (Fax)
35.	Sultana Kamal	Executive Director	Ain O Shalish Kendro (ASK), 26/3 Purana Paltan Line, Dhaka-1000	8315851, 9360336, 8318561 (Fax)
36.	Sanjib Drong	Secretary General	Bangladesh Adibasi Forum	01711804025
37.	Philip Gain	Executive Director	Society for Environment and Human Development (SEHD), 4/4/1B, 3rd Floor, Block-A, Lalmatia, Dhaka-1207	9121385, 01715009123
38.	Khushi Kabir	Coordinator	Nijera Kori, 7/8, Block-C, Lalmatia, Dhaka-1207	8111372, 8122250 (Fax)
39.	Mohammad Jahangir	Media Personality and Moderator and Executive Director	GrameenPhone Tele Shomoy" in Channel-I CDC, 6/D, Hal-Mars, 66 Outer Circular Road, 6th Floor, Moghbazar, Dhaka 1217	01711538889
40.	Professore Meghna Guhotakurata	Executive Director	Research Initiatives, Bangladesh (RIB), House 104, Road 25, Block A, Banani,	8860830, 8860831 8811962 (Fax)

Sl no	Name	Designation	Address	Phone
			Dhaka-1213	
Development workers/experts				
41.	Md. Shahid Hossain Talukdar	Consultant, Good Governance Project		8813945(Off), 01715103677(Personal No)
42.	Firoz Ahmed	Asian Development Bank	Plot E/31, Sher-E-Bangla Nagar, Dhaka-1207	8156000-6016
Business Leader				
43.	Anwar-ul-alam Chowdhury Pervez	President	BGMEA Complex (3rd Floor), 23/1 Panthapath Link Road, Karwar Bazar, Dhaka-1215	01711524247, 8115597, 8115751, 8113951 (Fax), 8125739, E-mail: info@bgmea.com .
44.	Md. Fazlul Haque	President	BKMEA, Planners Tower (12th Floor), 13/A, Sonargaon Road, Dhaka.	7645515, 7645511, 01711536184 9673337 (Fax)
45.	Shahruzzaman Mortaza	President	Khulna Chamber of Commerce and Industry, Chamber Mansion, 5, K.D.A. Commercial Area, Khan-A-Sabur Road, Khulna	041-721695, 721745, 731213 (Fax)
Present and Former Election Commissioner				
46.	Abdur Rouf	Former Chief Election Commissioner	House 9, Road 16, Gulshan 1, Dhaka-1212	9665965-6, 8625194, 8627003, 9566182, 9566183, 01711438990 (Fax), E-mail: roufmar@intechworld.net
47.	Brig. Gen. (Retd.) Shakhawat Hossain	Election Commissioner	Bangladesh Election Commission, Block-D, Sher-E-Bangla Nagor, Dhaka-1207	01715054214, 9882199, 8115796, 8122064 (Off), 9886651 (Fax) E-mail: sakhawat@ecs.gov.bd
Journalist				
48.	Golam Mortoza	Editor	SHAPTAHIK, 26 Eskaton Garden, Ramna, Dhaka-1000	9345369, 8802-9345483, 9333229 9333307 (Fax)
49.	Shakhawat Liton	Senior Reporter	The Daily Star, 19, Karwan Bazar, Dhaka-1215	01711181619, 8124944, 8124955, 8124966, 8126154 (Fax),E-mail: starliton@hotmail.com
50.	Ashish Saikat	Senior Staff Reporter	Daily Prothom Alo, 100, Kazi Nazrul Islam Avenue, C/A Bhaban, Karwar Bazar, Dhaka	01711542758, 8110078-81, 9130496(Fax), E-mail saikatasis@yahoo.com
51.	Hossain Zakir	Senior Staff Reporter	Daily Jugantar, 12/7 Uttar Kamlapur (Adjacent to Eden Mosque), Dhaka 1217	7102701-5, 7102004, 7101940, 01819-544454(Personal No)
52.	Ajoy Das Gupta	Assistant Editor	Daily Samakal, 136, Tejgaon Industrial Area, Dhaka - 1208	9889821,8802-988705, 9861457, 9861408, 8853926 8855981 (Fax)

পরিশিষ্ট ৫: কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সংক্রান্ত তথ্য

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের ধরন

অংশগ্রহণকারীর ধরন	*সংখ্যা*	*শতকরা হার*
সাংবাদিক	১৬১	১৮.৫৩
এনজিও প্রতিনিধি	১১৩	১৩.০০
শিক্ষক	১০৪	১১.৯৭
সচেতন নাগরিক কমিটির (সনাক) সদস্য	৯৯	১১.৩৯
রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব	৭৮	৮.৯৮
স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি	৬০	৬.৯০
আইনজীবী	৪৯	৫.৬৪
সরকারি চাকরিজীবী	৪৫	৫.১৮
ব্যবসায়ী	৪১	৪.৭২
সমাজকর্মী	৪১	৪.৭২
চিকিৎসক	১৯	২.১৯
সাবেক মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য	১৭	১.৯৬
বেসরকারি চাকরিজীবী	১২	১.৩৮
মুক্তিযোদ্ধা	১২	১.৩৮
ছাত্র	১০	১.১৫
অন্যান্য	৮	০.৯২
মোট	*৮৬৯*	*১০০.০০*

পরিশিষ্ট ৬: জরিপ কর্মী ও সহযোগীদের নাম

ক্রম	নাম	পদবী
১.	শরফুদ্দিন মুহাম্মদ আবু ইউসুফ	মাঠ গবেষণা সহকারী
২.	মো. আবেদ আলী	মাঠ গবেষণা সহকারী
৩.	সঞ্জয় কুমার ঘোষ	মাঠ গবেষণা সহকারী
৪.	মো. মাহবুবুর রহমান	মাঠ গবেষণা সহকারী
৫.	মোহাম্মদ রেজাউল হক	মাঠ গবেষণা সহকারী
৬.	ইলিয়াস হোসেন মোল্লা	মাঠ পরিদর্শক
৭.	এস এম মনিরুল আহসান	মাঠ পরিদর্শক
৮.	নাজমুল হক নূরনবী	মাঠ পরিদর্শক
৯.	মো. তৈয়বুর রহমান	মাঠ পরিদর্শক
১০.	মো. মইনুল ইসলাম	মাঠ পরিদর্শক
১১.	মো. শফিউল আলম	মাঠ পরিদর্শক
১২.	এম এম এ ফাত্তাহ চৌধুরী	মাঠ পরিদর্শক
১৩.	এ বি এম শরিফুজ্জামান	মাঠ পরিদর্শক
১৪.	আযাদুল ইসলাম	মাঠ পরিদর্শক
১৫.	ফারহানা ইয়েসমিন	মাঠ পরিদর্শক
১৬.	মো. জাহাঙ্গীর আলম	মাঠ পরিদর্শক
১৭.	অপলা হায়দার	মাঠ পরিদর্শক
১৮.	মো. সাইফুল আলম	মাঠ পরিদর্শক
১৯.	শরিফ মিয়া	মাঠ পরিদর্শক
২০.	জাফরিন নাহার	মাঠ পরিদর্শক
২১.	মো. মাসুদ আলম	মাঠ পরিদর্শক
২২.	মো. আলমগীর হোসাইন	মাঠ পরিদর্শক
২৩.	তারিক বিন আযাদ	মাঠ পরিদর্শক
২৪.	মো. রাজিবুল ইসলাম	মাঠ পরিদর্শক
২৫.	মো. শফিউল ইসলাম	মাঠ পরিদর্শক
২৬.	মো. মিজানুর রহমান	মাঠ পরিদর্শক
২৭.	মো. কামরুল হাসান	মাঠ পরিদর্শক
২৮.	মো. সেলিম শাহেদ	মাঠ পরিদর্শক
২৯.	রামকৃষ্ণ বিশ্বাস	মাঠ পরিদর্শক
৩০.	মো. মোজাম্মেল হোসাইন	মাঠ পরিদর্শক
৩১.	মো. মাজহারুল ইসলাম	মাঠ পরিদর্শক
৩২.	ছত্রধর বালা	মাঠ পরিদর্শক
৩৩.	মো. সাইফুল ইসলাম	মাঠ পরিদর্শক
৩৪.	মো. মাসুদ খান	মাঠ পরিদর্শক
৩৫.	মো. শরিফুল ইসলাম	মাঠ পরিদর্শক
৩৬.	নিজাম উদ্দিন	মাঠ পরিদর্শক

পরিশিষ্ট ৭: চারটি বৃহৎ দলের গঠনতন্ত্রের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

বৈশিষ্ট্য	*আওয়ামী লীগ*	*বিএনপি*	*জাতীয় পার্টি*	*জামায়াতে ইসলামী*
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংহত করা এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতা সমুন্নত করা। খ) প্রজাতন্ত্রের মালিক জনগণ। জনগণের সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করা। গ) রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি এবং কল্যাণ নিশ্চিতকরণ। ঘ) মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় একটি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়িয়া তোলা।	ক) বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক ইস্পাতকঠিন গণঐক্যের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা, রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা ও গণতন্ত্র সুরক্ষিত ও সংসংহত করা। খ) ঐক্যবদ্ধ এবং পুনরুজ্জীবিত জাতিকে অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ, নয়া-উপনিবেশবাদ, আধিপত্যবাদ ও বহিরাক্রমণ থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করা। গ) উৎপাদনের রাজনীতি, মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং জনগণের গণতন্ত্রের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায় বিচার ভিত্তিক মানবমুখী অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জন। ঘ) জাতীয়তাবাদী ঐক্যের ভিত্তিতে গ্রামে-গঞ্জে জনগণকে সচেতন ও সুসংগঠিত করা এবং সার্বিক উন্নয়নমুখী পরিকল্পনা ও প্রকল্প রচনা ও বাস্তবায়নের ক্ষমতা ও দক্ষতা জনগণের হাতে পৌঁছে দেওয়া।	১) স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ২) ইসলামী আদর্শ ও সকল ধর্মের স্বাধীনতা ৩) বাংলাদেশী জাতীয়তাবোধ ৪) গণতন্ত্র ৫) সামাজিক প্রগতি ও অর্থনৈতিক মুক্তি	বাংলাদেশ তথা সারা বিশ্বে সার্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানব জাতির কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রদর্শিত দ্বীন (ইসলামী জীবন বিধান) কায়েমের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টির ও পরকালীন সাফল্য অর্জন করাই জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।
কাঠামোগত বিন্যাস ও গঠন প্রণালী	ক) কাউন্সিল খ) জাতীয় কমিটি গ) কার্যনির্বাহী সংসদ খ) উপদেষ্টা পরিষদ চ) সংসদীয় পার্টি ছ) জেলা আওয়ামী লীগসমূহ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগ এবং উহাদের অন্তর্ভুক্ত শাখা আওয়ামী লীগসমূহ	১) গ্রাম কাউন্সিল ও গ্রাম নির্বাহী কমিটি ২) শহর/পৌরসভা ওয়ার্ড কাউন্সিল ও শহর/পৌরসভা ওয়ার্ড নির্বাহী কমিটি ৩) ইউনিয়ন কাউন্সিল ও ইউনিয়ন নির্বাহী কমিটি ৪) থানা কাউন্সিল ও থানা নির্বাহী কমিটি ৫) শহর/পৌরসভা কাউন্সিল ও শহর পৌরসভা নির্বাহী কমিটি] ৬) জেলা কাউন্সিল ও জেলা নির্বাহী কমিটি] ৭) নগর/ওয়ার্ড কাউন্সিল ও নগর ওয়ার্ড নির্বাহী কমিটি ৮) নগর থানা কাউন্সিল ও নগর থানা নির্বাহী কমিটি ৯) নগর কাউন্সিল ও নগর নির্বাহী কমিটি ১০) জাতীয় কাউন্সিল ১১) জাতীয় নির্বাহী কমিটি ১২) জাতীয় স্থায়ী কমিটি ১৩) পার্লামেন্টারী বোর্ড ১৪) পার্লামেন্টারী পার্টি ১৫) বিদেশে দলের শাখা	১) ইউনিট নির্বাহী কমিটি (গ্রাম ও শহর পর্যায়) ২) ইউনিয়ন নির্বাহী কমিটি ৩) থানা নির্বাহী কমিটি (মহানগরী পর্যায়) ৪) উপজেলা নির্বাহী কমিটি ৫) পৌর নির্বাহী কমিটি ৬) মহানগরী নির্বাহী কমিটি- যথাক্রমে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট মহানগরীতে ৭) জেলা নির্বাহী কমিটি ৮) কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটি ৯) প্রেসিডিয়াম ১০) জাতীয় কাউন্সিল এছাড়াও তিনটি বিশেষ কমিটি; যথা- ১) পার্লামেন্টারী বোর্ড (পার্টি চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত) ২) পার্লামেন্টারী পার্টি ৩) উপদেষ্টা পরিষদ (পার্ঠি চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত)	<u>ক) কেন্দ্রীয় সংগঠন</u> ১) কেন্দ্রীয় রুকন (সদস্য) সম্মেলন ২) আমীরে জামায়াত ৩) কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ এবং ৪) কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ খ) জিলা সংগঠন গ) উপজেলা/থানা সংগঠন ঘ) ইউনিয়ন/পৌরসভা সংগঠন
সদস্য হওয়ার নিয়ম	১) গঠনতন্ত্রের ২ ধারায় বর্ণিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের	১) ১৮ বছর বা ততোধিক বয়সের যে কোন বাংলাদেশী নাগরিক এ দলের প্রাথমিক সদস্য হতে পারবে। ইচ্ছুক ব্যক্তিদেরকে সংগঠনের	১) ১৮ বৎসর বা ততোধিক বয়সের যে কোনো প্রকৃত ও সৎ বাংলাদেশী নাগরিক জাতীয় পার্টির	• যে কোন সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন ও পূর্ণ বয়স্ক নর-নারী কিছু শর্ত

বৈশিষ্ট্য	আওয়ামী লীগ	বিএনপি	জাতীয় পার্টি	জামায়াতে ইসলামী
	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিশ্বাস করিয়া নির্ধারিত ফরমে প্রদত্ত ঘোষণাপত্রে দস্তসূর্বক ত্রি-বার্ষিক ৫.০০ (পাঁচ) টাকা চাঁদা প্রদান করি ১৮ বৎসর বা তদূর্ধ্ব বয়স্ক বাংলাদেশের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিক আওয়ামী লীগের সদস্য হইতে পারিবেন। ২) সংগঠনে দুই প্রকারের সদস্য পদ থাকিবে: যথা, প্রাথমিক (অস্থায়ী সদস্য) ও পূর্ণাঙ্গ সদস্য। ৩) বাংলা বৎসরের পহেলা বৈশাখ হইতে পরবর্তী তৃতীয় বৎসরের চৈত্র মাসের শেষ দিন পর্যন্ত সদস্য পদ বলবৎ থাকিবে। এই উপধারায় উল্লোখিত মেয়াদান্তে ৫(১) ধারায় নির্ধারিত হারে চাঁদা প্রদান করিয়া নির্ধারিত ফরমে দস্তখত করিয়া সদস্যপদ পুনরুজ্জীবিত করা যাইবে।	ঘোষণাপত্রের, গঠনতন্ত্র ও কর্মসূচির প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করতে হবে। ২) এ দলের প্রাথমিক সদস্য চাঁদা ২/- (দুই) টাকা মাত্র। সদস্য পদ লাভের পরবর্তী বছর থেকে দলের বাৎসরিক চাঁদা ১/- (এক) টাকা মাত্র। সদস্যদের চাঁদা রসিদ মারফত গৃহীত হবে এবং রসিদ দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে সরবরাহ করা হবে। ৩) প্রত্যেকাটি থানা অফিসে তাদের স্ব স্ব এলাকায় প্রত্যেক প্রাথমিক সদস্য পদের তালিকা সংরক্ষণ করবেন। জাতীয় সদর দফতরে অর্থাৎ দলের ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় অফিসে দলের সর্বমোট সদস্য সংখ্যা, সদস্যদের নাম ও ঠিকানাসহ বিধিসম্মতভাবে সংরক্ষিত হবে।	প্রাথমিক সদস্য হইতে পারিবেন। প্রার্থী হইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদেরকে সংগঠনের ঘোষণাপত্র, গঠনতন্ত্র ও কর্মসূচির প্রতি অবশ্যই আনুগত্য ঘোষণা করিতে হইবে। ২) সংগঠনের প্রাথমিক সদস্যপদ চাঁদা পাঁচ টাকা এবং বাৎসরিক সদস্যপদ নবায়ন চাঁদা দশ টাকা হইবে। ৩) প্রত্যেকটি শাখা অফিস আঞ্চলিক সদস্যদের তালিকা সংরক্ষণ করিবেন। পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পার্টির সর্বমোট সদস্য সংখ্যা, সদস্যদের নাম ও ঠিকানাসমূহ বিধিসম্মতভঅবে সংরক্ষিত হইবে।	সাপেক্ষে এই জামায়াতের রুকন (সদস্য) হইতে পারিবেন। • ৭ নং ধারা অনুসারে রুকনিয়াত (সদস্যপদ) লাভের যোগ্যতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তি রুকন হইবার অভিপ্রায় জানাইলে আমীরে জামায়াত কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা কর্তৃক নির্ধারিত পন্থা অনুসারে উক্ত ব্যক্তির রুকনিয়াত মঞ্জুর করিবেন। রুকনিয়াত মঞ্জুরীপ্রাপ্ত ব্যক্তি আমীরে জামায়াত বা তাঁহার কোন প্রতিনিধির সামনে রুকনিয়াতের শপথ গ্রহণ করিবেন এবং শপথ গ্রহণের দিন হইতেই তিনি রুকন গণ হইবেন।
কাউন্সিল সভা	সভাপতির নির্দেশ বা অনুমোদনক্রমে সাধারণ সম্পাদক যে-কোনো সময়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের সভা আহ্বান করিতে পারিবেন। ত্রিবার্ষিক নির্বাচনী অধিবেশন ব্যতীত বৎসরে একবার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিল সভা আহ্বান করিতে হইবে।		১) জাতীয় পার্টির কাউন্সিল পার্টির সর্বোচ্চ পরিষদ। ২) প্রতি দুই বছর পর দলের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে। কাউন্সিলের তারিখ, স্থান ও সময় দলের চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত হইবে। ৩)	
কাউন্সিলের কার্যাবলী ও ক্ষমতা	ক) আওয়ামী লাগের গঠনতন্ত্র, ঘোষণাপত্র ও কর্মসূচি প্রণয়ন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধন করিবার প্রস্তাব গ্রহণ; খ) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্য সাধন করার প্রয়োজনে যে কোনো নীতি বা পন্থা ও প্রস্তাব গ্রহণ;	১) জাতীয় স্থায়ী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ও প্রবর্তিত দলের নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও কার্যকরী করা; ২) দলের চেয়ারম্যানের নির্বাচন অনুষ্ঠান করা; ৩) দলের গঠনতন্ত্র সংশোধন করা; ৪) দলের চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রেরিত যে কোন বিষয় বিবেচনা করা; ৫) সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট বিবেচনা করা ও গ্রহণ করা; ৬) জাতীয় কাউন্সিলের ১/৩ (এক তৃতীয়াংশ) সদস্যের প্রস্তাবিত	১) জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান, প্রেসিডিয়াম, কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটি নির্বাচন করা; ২) কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যাবলী পর্যালোচনা, মহাসচিবের রিপোর্ট গ্রহণ ও ভষ্যিত কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা বিচার বিশ্লেষণ ও নির্ধারণ করিবে। ৩) জাতীয় কাউন্সিল সংগঠনের বাৎসরিক আয়-ব্যয়, হিসাব পরীক্ষা ও অনুমোদন করিবে।	১) জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর সকল বিষয়ে রুকন সম্মেলনই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হইবে। ঃ ২) আমীরে জামায়াত কিংবা মজলিসে শূরা যখন প্রয়োজন করিবেন রুকন সম্মেলন আহ্বান করিতে পারিবেন। ৩) জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর

বৈশিষ্ট্য	আওয়ামী লীগ	বিএনপি	জাতীয় পার্টি	জামায়াতে ইসলামী
	গ) গঠনতন্ত্রের ২০ ধারায় উল্লিখিত কর্মকর্তা (সভাপতি, সভাপতি মন্ডলীর সদস্যবৃন্দ, সাধারণ সম্পাদক, সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য ও কোষাধ্যক্ষ) নির্বাচন; ঘ) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একটি সংসদীয় বোর্ড গঠন, ঙ) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল বিনাশর্তে বা শর্তাধীনে গঠনতন্ত্র ও ঘোষণা পত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ যে কোনো ক্ষমতা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের উপর ন্যস্ত করিতে পারিবে।	অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করা। ৭) জাতীয় কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দের সরাসরি ভোটে সাধারণ সংখ্যা গরিষ্ঠতার মাধ্যমে দুই বছরের জন্য দলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন। মেয়াদ শেষে চেয়ারম্যান পদে একই ব্যক্তি পুনরায় নির্বাচিত হতে পরবেন।	৪) সংগঠনের গঠনতন্ত্র, ঘোষণাপত্র ও কর্মসূচি অনুমোদন করিবে। জাতীয় পার্টির কাউন্সিল সভা একটি বিষয় নির্বাচনী কমিটি (সাবজেক্ট কমিটি) গঠন করিবে যাহা একটি কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটি বা প্যানেল প্রস্তুত করিয়া চেয়ারম্যানের নিকট পেশ করিবেন। ৫) কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার কমপক্ষে একমাস পূর্বে চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে মহাসচিব নোটিশ মারফত জাতীয় কাউন্সিলের কর্মসূচি ঘোষণা করিবেন।	একজন আমীর থাকিবেন। ৪) রুকনগণের সরাসরি গোপন ভোটে আমীরে জামায়াত তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবেন। ৫) আমীরে জামায়াতের নির্বাচনের জন্য কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্যগণ তিনজনের একটি প্যানেল নির্বাচন করিবেন। তবে আমীর নির্বাচনে প্যানেল বহির্ভূত যে কোন রুকনকে ভোট দেওয়ার অধিকার ভোটারগণের থাকিবে।
চেয়ারম্যান/সভাপতি/ আমীরের একচ্ছত্র ক্ষমতা	জাতীয় কমিটির ২১ জন সদস্য মনোনীত করবেন। ৪১ সদস্যবিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ মনোনীত করবেন। সভাপতি প্রয়োজনে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারেন।	▪ দলের প্রধান কর্মকর্তা হিসাবে চেয়ারম্যান দলের সর্বময় কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ, তদারক ও সমন্বয় সাধন করবেন এবং তদুদ্দেশ্যে জাতীয় কাউন্সিল, জাতীয় কমিটি, জাতীয় নির্বাহী কমিটি, বিষয় কমিটিসমুহ এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত অন্যান্য কমিটিসমূহের উপর কর্তৃত্ব করবেন এবং তাদের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ, তদারক এবং সমন্বয় সাধন করবেন। ▪ উপরোক্ত কমিটিসমূহের সদস্যদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও প্রয়োজনবোধে নিতে পারবেন। ▪ জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি হিসেবে উক্ত কমিটির কর্মকর্তাদের দায়-দায়িত্ব, ক্ষমতা এবং কর্তব্য চেয়ারম্যান নিরূপন করবেন। ▪ চেয়ারম্যান প্রয়োজন মনে করলে জাতীয় নির্বাহী কমিটি, জাতীয় স্থায়ী কমিটি, বিষয় কমিটিসমূহ এবং অন্যান্য কমিটিসমূহ বাতিল করে দিতে পারেন। ▪ চেয়ারম্যান জাতীয় কাউন্সিল, জাতীয় নির্বাহী কমিটি এবং জাতীয় স্থায়ী কমিটির সভাসমূহে সভাপতিত্ব করবেন, তবে এ ক্ষমতা প্রয়োজনবোধে তিনি অন্য সদস্যের উপর অর্পণ করতে পারবেন।	জাতীয় পার্টির গঠনতন্ত্রের যে কোন ব্যাখ্যা সম্পর্কে কোন বিতর্ক উত্থাপিত হইলে পার্টির চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে গণ্য হইবে। চেয়ারম্যান প্রয়োজন বোধে প্রতিটি স্তরের কমিটি গঠন, পুনর্গঠন, বাতিল, বিলোপ করিতে পারিবেন। চেয়ারম্যান জাতীয় পার্টির যে কোন পদে যে কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ, যে কোন পদ হইতে যে কোন ব্যক্তিকে অপসারণ ও যে কোন ব্যক্তিকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করিতে পারিবেন। তিনি এই ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে পার্টির পার্লামেন্টারি বোর্ডের দায়িত্ব গ্রহণ ও পালন করিতে পারিবেন।	আমীরে জামায়াত কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সাহত পরামর্শ করিয়া জামায়াতের নীতি নির্ধারন ও সকল গুরুত্বপুর্ন বিষয়ে ফয়সালা করিবেন।
চেয়ারম্যান/সভাপতি/ আমীরের অপসারণ পদ্ধতি		জাতীয় কাউন্সিলের মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের দাবীকৃত জাতীয় কাউন্সিলের মোট সদস্য সংখ্যার তিন চতুর্থাংশের ভোট যদি চেয়ারম্যানের অপসারণের অনুকূলে হয় তাহলে চেয়ারম্যানকে অপসারিত করা যাবে। তবে জাতীয় কাউন্সিলের উক্ত দাবীতে চেয়ারম্যানের অপসারণই সভায় একমাত্র বিষয়বস্তু হিসাবে	জাতীয় কাউন্সিলের মোট সদস্য সংখ্যার তিন চতুর্থাংশের ভোট যদি অপসারণের দাবির পক্ষে হয়,তাহা হইলে চেয়ারম্যান অপসারিত হইবেন।	কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার দুই তৃতীয়াংশ সদস্য প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলে এবং আমীরে জামায়াত তাহা মানিয়া লইলে আমীর পদ তৎক্ষণাৎ শূন্য হইবে। কিন্তু তিনি না মানিলে অনধিক তিন মাসের মধ্যে

বৈশিষ্ট্য	আওয়ামী লীগ	বিএনপি	জাতীয় পার্টি	জামায়াতে ইসলামী
		দেখাতে হবে এবং অপসারণের কারণ স্পষ্টভাবে লিখিত থাকতে হবে।		রুকন সম্মেলন ডাকিবেন এবং সেখানে তিনি বহাল থাকিলে মজলিসে শূরা বাতিল বলে গণ্য হইবে।
সংসদীয় বোর্ড	• বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সহ জাতীয় পর্যায়ের সকল নির্বাচনে সংগঠনের পক্ষ হইতে প্রার্থী মনোনীত করার জন্য একটি সংসদীয় বোর্ড গঠিত হইবে। • সংসদীয় বোর্ডের সদস্য সংখ্যা হইবে ১১ জন। • বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি পদাধিকার বলে উক্ত বোর্ডের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে সংসদীয় বোর্ডের সম্পাদক হইবেন। • নির্বাচনে যাঁহারা আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রার্থী হইবেন, তাঁহারা উক্ত বোর্ডের নিকট মনোনয়ন প্রার্থনা করিয়া যে দরখাস্ত দাখিল করিবেন, তাঁহার অনুরূপ এক কপি দরখাস্ত জেলা আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের নিকট জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদকের মাধ্যমে, লিখিত রশিদ লইয়া বা পোস্টাল রেজিস্ট্রেশন যোগে পাঠাইবেন। • জেলা ও উপজেলা বা থানা আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদ উক্ত মনোনয়ন প্রার্থীদের গুণাগুণ ও জনপ্রিয়তা প্রভৃতি বিষয় বিস্তারিত বর্ণনা করিয়া তাহাদের সুপারিশ বা মতামত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংসদীয় বোর্ড বরাবর প্রেরণ	জাতীয় সংসদে নির্বাচনের জন্য কিংবা অন্য যে কোন নির্বাচনের জন্য দলের প্রার্থী মনোনয়নের জন্য দলের একটি পার্লামেন্টারি বোর্ড থাকবে। দলের জাতীয় স্থায়ী কমিটিই হবে দলের পার্লামেন্টারি বোর্ড। তবে যে জেলার প্রার্থী মনোনয়নের জন্য পার্লামেন্টারি বোর্ডের সভা আহুত হবে সেই জেলার সভাপতি, প্রথম তিনজন সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক উক্ত সভায় পার্লামেন্টারি বোর্ডের সদস্য বলে গণ্য করা হবে। তবে কোন সদস্য যদি নির্বাচন প্রার্থী হন তাঁর নির্বাচনী এলাকার প্রার্থী বিবেচনা কালে বোর্ডের সভায় তিনি অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। দলের চেয়ারম্যান হবেন বোর্ডের সভাপতি। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কিংবা যে কোন নির্বাচনে দলের প্রার্থী মনোনয়নের দায়িত্ব পার্লামেন্টারি বোর্ড পালন করবেন এবং এ ব্যাপারে বোর্ডের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।	• জাতীয় সংসদের নির্বাচনের জন্য পার্টির পক্ষ হইতে প্রার্থী মনোনীত করার জন্য একটি পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠিত হইবে। • ১১ জন সদস্য সমন্বয়ে পার্টির পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠিত হইবে। পার্টির চেয়ারম্যান এবং মহাসচিব পদাধিকার বলে এই বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং সদস্য-সচিব থাকিবেন। • বোর্ডের বাকী ৯ জন সদস্য চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত হইবেন। • জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচনের জন্য পার্টির প্রার্থী মনোনয়নের দায়িত্ব পার্লামেন্টারি বোর্ড পালন করিবেন এবং এ ব্যাপারে বোর্ডের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। • কোন প্রার্থীর মনোনয়ন চূড়ান্ত করিতে পার্লামেন্টারি বোর্ড ঐকমত্যে পৌছাইতে ব্যর্থ হইলে বোর্ডের চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।	• কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা কর্তৃক নির্ধারিত বিধি মুতাবিক কেন্দ্রীয় ও জিলা পর্যায়ে নির্বাচন পরিচালনার জন্য উক্ত মজলিসে শূরা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রধান নির্বাচন পরিচালক ও চারজন সহকারী নির্বাচন পরিচালক সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন নতুনভাবে গঠিত হইবে। • কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার প্রত্যেক নির্বাচনের পর কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন নতুনভাবে গঠিত হইবে। • উপজেলা/থানা ও ইহার অধস্তন পর্যায়ে নির্বাচন পরিচালনার জন্য জিলা মজলিসে শূরা কিংবা জিলা রুকন সম্মেলন কর্তৃক মনোনীত একজন নির্বাচন পরিচালক ও দুইজন সহকারী নির্বাচন পরিচালক সমন্বয়ে জিলা নির্বাচন কমিশন গঠিত হইবে। • জিলা মজলিসে শূরার প্রত্যেক নির্বাচনের পর জিলা নির্বাচন কমিশন নতুনভাবে গঠিত হইবে।

বৈশিষ্ট্য	*আওয়ামী লীগ*	*বিএনপি*	*জাতীয় পার্টি*	*জামায়াতে ইসলামী*
	করিবে, যাহা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব বহন করিবে। কিন্তু বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংসদীয় বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।			
তহবিল	• প্রত্যেক কাউন্সিলারের ২০.০০ (বিশ) টাকা হারে চাঁদা, • কার্যনির্বাহী সংসদের সকল কর্মকর্তা ও সদস্যের নির্দিষ্ট হারে মাসিক চাঁদা, • জাতীয় সংসদে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ দলভুক্ত প্রত্যেক সদস্যের মাসিক ২০০.০০ (দুইশত) টাকা হারে চাঁদা, • প্রত্যেক জেলার মঞ্জুরী ফি বাবদ ১০০.০০ (একশত) টাকা, • বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রচারপত্র, পত্র-পত্রিকা, পুস্তক-পুস্তিকও অন্যান্য প্রকাশনার বিক্রয়ালব্ধ অর্থ, • এককালীন দান/অনুদান, • সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ, • সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ, • সাহায্য ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ, • প্রাথমিক সদস্য-শ্রেণীভুক্ত হওয়ার ও নবায়নের জন্য দেয় ত্রি-বার্ষিক চাঁদার অংশ। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয়, জেলা, মহানগর, ওয়ার্ড, উপজেলা/থানা বা পৌর ইউনিট যে	দলের কোষাধ্যক্ষ সংগঠনের তহবিল সংগ্রহ ও হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকে সংগঠনের হিসাব খোলা হবে এবং সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ ও সাধারণ সম্পাদক এই তিনজনের যে কোন দুইজনের যুক্ত স্বাক্ষরে তহবিল পরিচালনা করা যাবে, তবে যুক্ত স্বাক্ষরে কোষাধ্যক্ষের স্বাক্ষর থাকতেই হবে। দলের হিসাব প্রতি বছর অডিট করাতে হবে এবং অর্থ বছর সমাপ্ত হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে অডিট রিপোর্ট প্রকাশ করতে হবে। সদস্যের চাঁদা ও দান সংগ্রহের মাধ্যমে দলের তহবিল সৃষ্টি করা হবে।	• প্রাথমিক সদস্যপদ, তহবিলের চাঁদা। • সাধারণ সদস্যদের বাৎসরিক সদস্যপদ নবায়ন চাঁদা। • প্রতিটি সংগঠনের সকল স্তরের মঞ্জুরি চাঁদা বাবদ ধার্যকৃত অর্থ। • সংগঠন সমর্থকদের এককালীন ইচ্ছাকৃত দান। • বিশেষ তহবিলের জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে দান হিসাবে সংগৃহীত অর্থ। • সংগঠন কর্তৃক প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা, বই ইত্যাদি দলিল যে কোন একটি রাখিতে হইবে। • সংগঠনের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি থেকে আয়। • আদায়কৃত অর্থ নির্দেশ মোতাবেক সংগঠনের নামে ব্যাংকে থাকিবে এবং সংগঠনের হিসাবের খাতায় লিপিবদ্ধ থাকিবে। • চেয়ারম্যান, মহাসচিব এবং কোষাধ্যক্ষ এই তিন জনের যে কোন দুই জন-এর মুক্ত স্বাক্ষরে ব্যাংক হইতে টাকা তোলা যাইবে। • প্রতি বছর পার্টির আয়-ব্যয়ের হিসাব করা হইবে।	***বাইতুলমাল*** • জামায়াতের প্রত্যেক সাংগঠনিক স্তরে বাইতুলমাল থাকিবে। অবশ্য কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা কোন সংগঠনের পৃথক বাইতুলমাল কায়েম করা অপ্রয়োজনীয় বিবেচনা করিলে সেইরূপ নির্দেশ দিতে পারিবে। • বাইতুলমালের শৃঙ্খলা বিধানের যাবতীয় ক্ষমতা আমীরে জামায়াতের থাকিবে। ***বাইতুলমালের আয়ের উৎস*** • জামায়াতের রুকন, কর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের নিকট হইতে প্রাপ্ত- ক) মাসিক ইয়ানত, খ) উশর ও যাকাত, গ) এককালীন দান। • অধস্তন সংগঠন হইতে প্রাপ্ত মাসিক নিসাব। • জামায়াতের নিজস্ব প্রকাশনীর মুনাফা। • জামায়াতের মালিকানাধীন সম্পত্তির আয়। • প্রত্যেক বাইতুলমাল সংশ্লিষ্ট জামায়াতের আমীরের অধীনে থাকিবে। জামায়াতের কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট আমীর স্বীয় বাইতুলমাল হইতে অর্থ ব্যয় করিবার অধিকারী হইবেন। কিন্তু প্রত্যেক আমীর উর্ধ্বতন আমীর এবং সংশ্লিষ্ট মজলিসে শূরা কিংবা রুকনগণের নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য

বৈশিষ্ট্য	আওয়ামী লীগ	বিএনপি	জাতীয় পার্টি	জামায়াতে ইসলামী
	সকল চাঁদা বা দান গ্রহণ করিবে, তাহার আয়-ব্যয়ের যথাযথ হিসাব রাখতে হইবে। আদায়কৃত অর্থ বাংলাদেশের যে কোনো তফসিলিভুক্ত ব্যাংকে জমা রাখা হইবে। ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিলের সময় সকল শাখার সাধারণ সম্পাদকগণ তাহাদের নিজ নিজ শাখার আয়-ব্যয়ের হিসাব আগে অডিট করাইয়া সম্মেলনে পেশ করিবেন।			থাকিবেন। ● আমীরে জামায়াত বাইতুলমালের আয়-ব্যয় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার নিকট দায়ী থাকিবেন। ● কেন্দ্রীয় ও জিরা জামায়াতের বাইতুলমালের হিসাব প্রতি বৎসর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা কর্তৃক নিযুক্ত অডিটর দ্বারা পরীক্ষা করাইতে হইবে এবং অডিট রিপোর্ট কেন্দ্রীয় শূরায় পেশ করিতে হইবে। ● উপজেলা/থানা ও ইহার অধস্তন বাইতুলমালসমূহ অডিটের জন্য জিলা আমীরগণ সংশ্লিষ্ট মজলিসে শূরা কিংবা জিলা রুকন সম্মেলনের সহিত পরামর্শ করিয়া নিয়োগ করিবেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অডিট করাইয়া রিপোর্ট জিলা মজলিসে শূরা কিংবা রুকন সম্মেলনে পেশ করিবেন।

পরিশিষ্ট ৮: সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণ বিধি: গ্রেট ব্রিটেন

The Code of Conduct for Members of Parliament

Prepared pursuant to the Resolution of the House of 19th July 1995

I. Purpose of the Code

1. The purpose of this Code of Conduct is to assist Members in the discharge of their obligations to the House, their constituents and the public at large by:

a) Providing guidance on the standards of conduct expected of Members in discharging their parliamentary and public duties, and in so doing

b) Providing the openness and accountability necessary to reinforce public confidence in the way in which Members perform those duties.

II. Scope of the Code

2. The Code applies to Members in all aspects of their public life. It does not seek to regulate what Members do in their purely private and personal lives.

3. The obligations set out in this Code are complementary to those which apply to all Members by virtue of the procedural and other rules of the House and the rulings of the Chair, and to those which apply to Members falling within the scope of the Ministerial Code.

III. Public Duties of Members

4. By virtue of the oath, or affirmation, of allegiance taken by all Members when they are elected to the House, Members have a duty to be faithful and bear true allegiance to Her Majesty the Queen, her heirs and successors, according to law.

5. Members have a duty to uphold the law, including the general law against discrimination, and to act on all occasions in accordance with the public trust placed in them.

6. Members have a general duty to act in the interests of the nation as a whole; and a special duty to their constituents.

IV. General Principles of Conduct

7. In carrying out their parliamentary and public duties, Members will be expected to observe the following general principles of conduct identified by the Committee on Standards in Public Life in its First Report as applying to holders of public office.[1] These principles will be taken into consideration when any complaint is received of breaches of the provisions in other sections of the Code.

"Selflessness Holders of public office should take decisions solely in terms of the public interest. They should not do so in order to gain financial or other material benefits for themselves, their family, or their friends.
Integrity Holders of public office should not place themselves under any financial or other obligation to outside individuals or organisations that might influence them in the performance of their official duties.
Objectivity In carrying out public business, including making public appointments, awarding contracts, or recommending individuals for rewards and benefits, holders of public office should make choices on merit.
Accountability Holders of public office are accountable for their decisions and actions to the public and must submit themselves to whatever scrutiny is appropriate to their office.
Openness Holders of public office should be as open as possible about all the decisions and actions that they take. They should give reasons for their decisions and restrict information only when the wider public interest clearly demands.
Honesty Holders of public office have a duty to declare any private interests relating to their public duties and to take steps to resolve any conflicts arising in a way that protects the public interest.
Leadership Holders of public office should promote and support these principles by leadership and example."

V. Rules of Conduct

8. Members are expected in particular to observe the following rules and associated Resolutions of the House.

9. Members shall base their conduct on a consideration of the public interest, avoid conflict between personal interest and the public interest and resolve any conflict between the two, at once, and in favour of the public interest.

10. No Member shall act as a paid advocate in any proceeding of the House.[2]

11. The acceptance by a Member of a bribe to influence his or her conduct as a Member, including any fee, compensation or reward in connection with the promotion of, or opposition to, any Bill, Motion, or other matter submitted, or intended to be submitted to the House, or to any Committee of the House, is contrary to the law of Parliament.[3]

12. In any activities with, or on behalf of, an organisation with which a Member has a financial relationship, including activities which may not be a matter of public record such as informal meetings and functions, he or she must always bear in mind the need to be open and frank with Ministers, Members and officials.

13. Members must bear in mind that information which they receive in confidence in the course of their parliamentary duties should be used only in connection with those duties, and that such information must never be used for the purpose of financial gain.

14. Members shall at all times ensure that their use of expenses, allowances, facilities and services provided from the public purse is strictly in accordance with the rules laid down on

these matters, and that they observe any limits placed by the House on the use of such expenses, allowances, facilities and services.

15. Members shall at all times conduct themselves in a manner which will tend to maintain and strengthen the public's trust and confidence in the integrity of Parliament and never undertake any action which would bring the House of Commons, or its Members generally, into disrepute.

VI. Registration and Declaration of Interests

16. Members shall fulfil conscientiously the requirements of the House in respect of the registration of interests in the Register of Members' Interests and shall always draw attention to any relevant interest in any proceeding of the House or its Committees, or in any communications with Ministers, Government Departments or Executive Agencies.[4]

VII. Duties in respect of the Parliamentary Commissioner for Standards and the Committee on Standards and Privileges

17. The application of this Code shall be a matter for the House of Commons, and for the Committee on Standards and Privileges and the Parliamentary Commissioner for Standards acting in accordance with Standing Orders Nos 149 and 150 respectively.

18. Members shall cooperate, at all stages, with any investigation into their conduct by or under the authority of the House.

19. No Member shall lobby a member of the Committee on Standards and Privileges in a manner calculated or intended to influence their consideration of a complaint of a breach of this Code.

---

1 Cm 2850-I, p 14. Back

2 Resolution of 6 November 1995. Back

3 Resolutions of 2 May 1695, 22 June 1858, and 15 July 1947 as amended on 6 November 1995 and 14 May 2002. Back

4 Resolutions of the House of 22 May 1974, 12 June 1975 as amended on 19 July 1995, 12 June 1975, 17 December 1985, 6 November 1995 as amended on 14 May 2002, and 13 July 1992. Back

Source: http://www.publications.parliament.uk/pa/cm/code02.htm

পরিশিষ্ট ৯: সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণ বিধি: শ্রীলঙ্কা[১]

শ্রীলঙ্কার সংসদীয় কমিটি সংসদ সদস্যদের আচরণ বিধি প্রণয়নের জন্য কিছু সুপারিশ প্রস্তাব করে। সুপারিশগুলো হলো:

ক. সাধারণ সুপারিশ:

১. সংসদ সদস্যদের সব সময় এমন আচরণ প্রদর্শন করতে হবে যেন জনগণের দৃষ্টিতে জন-প্রতিনিধি হিসেবে তাদের ভাবমূর্তি বজায় থাকে।
২. প্রত্যেক সংসদ সদস্যদে তাদের দাপ্তরিক কাজ-কর্ম সততা, নিরপেক্ষতা এবং জনস্বার্থে সম্পাদন করতে হবে।
৩. কোনো সংসদ সদস্য তার দাপ্তরিক ক্ষমতা ব্যবহার করে এমন কোনো প্রকল্পে সহায়তা দিতে পারবেন না বা কোনো চুক্তি সম্পাদন করতে পারবেন না যাতে তার ব্যক্তিগত আর্থিক স্বার্থ জড়িত।
৪. সরকারের সাথে চুক্তি, মালিকানা, আর্থিক কিংবা এরূপ অন্য কোনো স্বার্থ-সর্ম্পকিত বিষয়ে জড়িত কিংবা জড়িত হতে আগ্রহী কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে কোনো সংসদ সদস্য কোনো প্রকার সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন না।
৫. কোনো সংসদ সদস্য তার কিংবা তার পরিবারের কোনো সদস্যের সাথে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত কোনো প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি বা সংগঠনের পক্ষে সরকারের কাছ থেকে কোনো ব্যবসায়িক সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য তদবির করতে পারবেন না।
৬. কোনো সংসদ সদস্য তার কিংবা তার পরিবারের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ আর্থিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে কোনো সরকারি কর্মকর্তা কিংবা মন্ত্রীকে অযাচিতভাবে প্রভাবিত করতে পারবেন না।
৭. কোনো সংসদ সদস্য এমন কোনো সুপারিশ-পত্র লিখতে পারবেন না কিংবা কোনো সরকারি কর্মকর্তাকে এমন কোনো চাকরি বা ব্যবসায়িক চুক্তির ব্যাপারে প্রভাবিত করার চেষ্টা করতে পারবেন না যার সাথে তার আত্মীয় সংশ্লিষ্ট রয়েছে, বা এমন কোনো ব্যক্তি যার সাথে তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট। তবে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই একজন সংসদ সদস্যকে তার কাছে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত কোনো আবেদনকারী বা প্রার্থীকে সনদ কিংবা প্রশংসাপত্র প্রদানে বাধার সৃষ্টি করবে না।
৮. সংসদ সদস্যের কাছে সংরক্ষিত কিংবা সংসদীয় কমিটির সদস্য হিসাবে জ্ঞাত কোনো গোপন তথ্য কারো কাছে কিংবা তার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সর্ম্পকিত কোনো পেশা কিংবা ব্যবসায়ের স্বার্থে ফাঁস করা যাবে না, যেখানে তিনি জড়িত।
৯. একজন সংসদ সদস্য তার জন্য বসবাসের উদ্দেশ্যে বরাদ্দকৃত আবাসন ও ভবন অন্য কাউকে ভাড়া দিতে পারবেন না।
১০. একজন সংসদ সদস্য একজন আইনজীবী বা আইন উপদেষ্টা হিসেবে কোনো মন্ত্রী বা কোনো সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক পরিচালিত আংশিক বিচার-বিভাগীয় কোনো কাজে তার সম্মুখীন হতে পারবেন না।
১১. কোনো সংসদ সদস্য তার রাজনৈতিক স্বার্থে বা রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে কোনো সরকারি মালিকানাধীন ব্যবসা, বা সরকারি কোম্পানি, বা এরূপ কোনো এজেন্সি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন, বা প্রতিশ্রুত কোনো সরকারি কাজের জন্য সুপারিশ, বা কোনো বিজ্ঞাপনের দায়ভার বহন, বা অন্য কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না।

খ. স্বার্থসংশ্লিষ্ট ঘোষণা:

একজন সংসদ সদস্যকে অবশ্যই সম্পদ ও দায় সম্পর্কিত ঘোষণার নিম্নলিখিত ধারাগুলো মেনে চলতে হবে:

১. কালক্ষেপণ না করে তার নিজের, তার স্বামী বা স্ত্রী এবং তার ওপর নির্ভরশীল সন্তানদের যাবতীয় সম্পদ এবং দায়ের হিসাব দাখিল করতে হবে।
২. এমন অন্য কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আর্থিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ঘোষণাও দিতে হবে, যেখানে তিনি সম্পদ বা আর্থিক বা বস্তুগত সুবিধাপ্রাপ্ত হতে পারেন, যা তিনি, তার স্বামী বা স্ত্রী বা তার ওপর নির্ভরশীল ছেলেমেয়ের কোনো চুক্তি, সমঝোতা বা লেনদেনের অধীনে অর্জিত হয়ে থাকতে পারে।

গ. বিদেশী রাষ্ট্রে অবস্থানকালীন আচরণ:

১. বিদেশে একজন সংসদ সদস্যর আচরণ এমন হবে যেন সংসদ সদস্য এবং সরকারের মর্যাদা হ্রাস না পায়, যার দ্বারা শ্রীলংকার জাতীয় স্বার্থের হানি হয়।
২. সংসদ সদস্যদের অবশ্যই বিদেশের মাটিতে সততা, মর্যাদা, শিষ্টতা এবং গোপনীয়তার প্রত্যাশিত মানের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পালন করার ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে।

---

[১] Md. Ali Ashraf, *Ethical Standards of Parliamentarians*, Bangladesh Institute of Parliamentary Studies, Dhaka, 2001, pp. 25-27.

ঘ. আতিথেয়তার ক্ষেত্রে আচরণ বিধি:

১. একজন সংসদ সদস্য কোনো দাপ্তরিক উদ্দেশ্য ছাড়া কোনো দূতাবাসে কূটনৈতিক নিমন্ত্রণ গ্রহণ, রাতের খাবার বা বিদেশি কোনো মিশন বা কোনো বিদেশি সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত কোনো ধরনের আতিথেয়তা গ্রহণ করতে পারবেন না। ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে যদি এরূপ কোনো নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতেই হয় তাহলে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে তা গ্রহণ করতে হবে, এবং অবশ্যই এ ধরনের নিমন্ত্রণের বিষয়ে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়কে অবহিত করতে হবে। শ্রীলংকায় অবস্থিত বিভিন্ন দূতাবাস কিংবা বিদেশি সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে ঘনিষ্ঠতা পরিহার করতে হবে।

২. কোনো কূটনৈতিক কিংবা অন্যান্য দাপ্তরিক অভ্যর্থনায় কিংবা কর্মে একজন সংসদ সদস্যর আচরণ সর্বোচ্চ মানের শিষ্টতা ও মর্যাদাপূর্ণ হওয়া উচিত। এ ধরনের অভ্যর্থনা কিংবা অনুষ্ঠানে কোনো প্রকার মদ্যপান এই আচরণ বিধির মারাত্মক লঙ্ঘন বলে আখ্যায়িত হবে।

৩. কোন ব্যবসায়ী কিংবা স্বার্থান্বেষী দল কর্তৃক প্রদত্ত দুপুরের খাবার, রাতের খাবার কিংবা অন্য কোনো বিনোদনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে সংসদ সদস্যদেরকে সর্বোচ্চ বিচক্ষণতার সাথে এমন সম্ভাবনা পরিহার করার বিষয়ে বিবেচনা করতে হবে যেন এ ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাকে কোনোভাবে প্রভাবিত করা বা অনুকূলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে এবং এ কারণে জনগণের দৃষ্টিতে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়।

৪. কোনো সংসদ সদস্যকে নৃত্যশালা, সামাজিক ক্লাব কিংবা এমন অন্য কোনো জায়গায় দেখা যাবে না যে খানে নির্বিচারে জুয়া ইত্যাদি পরিচালিত হয়।

ঙ. বিদেশ ভ্রমণ:

১. শ্রীলঙ্কার অভ্যন্তরে কিংবা বাইরে ভ্রমণ করার সময় কোনো সংসদ সদস্য তার দপ্তরের ক্ষমতা ব্যবহার করে শুল্ক ও একই ধরনের অন্যান্য বাধ্যবাধকতা থেকে রেহাই চাইতে পারবেন না।

২. কোন বিদেশি সরকার বা সংস্থার বা এরূপ কোনো সরকার বা এজেন্সি প্রদত্ত আমন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রথমেই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অবহিত করে এর মূল উদ্দেশ্য বিস্তারিতভাবে জানাতে হবে এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করতে হবে। এরকম আমন্ত্রণ গ্রহণের বিষয়ে রাষ্ট্রপতির অনুমতি গ্রহণ করতে হবে, অন্যথায় এ ধরনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করা যাবে না।

চ. আচরণ বিধির লঙ্ঘন:

এই আচরণ বিধির লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি যেমন প্রয়োজন মনে করবেন সে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।